بسم الله الرحمن الرحيم

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক
মোঃ নুরুন্নবী

404197

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০০৭

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা

এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

উপস্থাপক
মোঃ নুরুন্নবী

তত্ত্বাবধায়ক
প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই ২০০৭

ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯২০-৭৩/৬২৯০, ৬২৯১

DEPARTMENT OF ISLAMIC STUDIES
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 9661920-73/6290, 6291

স্মারক নং.....

Date 200

প্রত্যয়ন পত্র

জনাব মোঃ নুরুন্নবী (কর্মকর্তা, এ সি সি এফ ব্যাংক, শাহবাগ-ঢাকা) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত 'মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ সম্পর্কে প্রত্যয়ন করছি :

১. এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে লিখিত।

২. এটি গবেষকের নিজস্ব ও একক গবেষণাকর্ম।

৩. এটি তথ্যবহুল, তাৎপর্যপূর্ণ ও মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে এই শিরোনামে এম ফিল ডিগ্রীর জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি।

এ গবেষণা সন্দর্ভটি এম ফিল ডিগ্রীর জন্য সন্তোষজনক। আমি এর চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি আদ্যান্ত দেখেছি এবং এম ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে উপস্থাপনের জন্য অনুমোদন করছি।

৩.৭.০৭

(প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন)
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষভাবে এ গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. এ এইচ এম মুজতবা হোছাইন-এর প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, সযত্ন তাকিদ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে হায়াতে তাইয়্যেবা দান করুন। আমীন।

বাংলা একাডেমীর সাবেক পরিচালক ড. গোলাম মঈনউদ্দিন এ গবেষণাকর্মের শিরোনাম নির্বাচনসহ তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে যেভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তা চিরস্মরণীয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ওপর তিনি পিএইচ ডি ডিগ্রী অর্জনের পাশাপাশি তাঁর রচনাবলী সম্পাদনা ও বিভিন্ন মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করে এ ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন।

ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশ-এর সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ ডি ফেলো জনাব আবু তাহের মুহাম্মদ মানজুর এ গবেষণাকর্মের অধ্যায় বিন্যাসসহ গবেষণার রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে গবেষণাকর্মটি সুসম্পন্ন করতে বিশেষ অবদান রেখেছেন।

আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক খ্যাতিমান আলিম প্রিন্সিপাল আল্লামা হাফেজ আবদুল জলিল, আমার পিতা মাওলানা মোস্তফা মিয়া, আমার বড় খালু পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক উপবিভাগীয় প্রকৌশলী ইঞ্জিনিয়ার মইন উদ্দীন বিভিন্ন সময় গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে উৎসাহিত করেছেন।

বিশিষ্ট ইসলামী অর্থনীতিবিদ এ সি সি এফ ব্যাংক-এর চেয়ারম্যান জনাব এম তাজুল ইসলাম এবং মরহুম খোরশেদ এ গবেষণাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে ব্যাংক থেকে দীর্ঘ ছুটি মঞ্জুর করে আমাকে বাধিত করেছেন। তাঁদের ঋণ অকপটে স্বীকার করছি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশনের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব জিয়া উদ্দিন, মিশনের Bangladesh Literacy Research Centre (BLRC)-এর তত্ত্বাবধায়ক জনাব নাফিজ আহ্ছানিয়া মিশন লাইব্রেরী ব্যবহার করতে দিয়ে এ অভিসন্দর্ভ রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। আহ্ছানিয়া মিশনের গবেষণা সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ফটোগ্রাফার বিভিন্নভাবে আমার কাজকে সহজ করার চেষ্টা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন গ্রন্থাগার, গণ গ্রন্থাগার ও বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় উপাত্ত সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছি। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বন্ধুবর আশরাফুল আলম সর্বপ্রথম আমাকে এ নিয়ে গবেষণা করতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক বন্ধুবর জনাব মুহাম্মদ সাইদুল হক প্রায়ই গবেষণার খোঁজ নিয়ে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছেন। ইসলামিক রিসার্চ একাডেমী বাংলাদেশের শ্রদ্ধাভাজন গবেষকগণের অনুপ্রেরণা ও তাকিদ এ গবেষণা কর্ম শেষ করতে পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র প্রিয়ভাজন শামসুল হুদা সোহেল অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে কম্পোজ করে আমার কষ্ট লাঘব করেছে। এ ছাড়াও নানাবিধ অন্তরায় ও প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যেতে যাঁরা আমাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন, তাঁদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। আমি সকলের মর্যাদামণ্ডিত সফল জীবন কামনা করছি।

সূচীপত্র

প্রত্যয়ন পত্র ..... ঘ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার ..... ঙ
সংকেত সূচী ..... চ
ভূমিকা ..... ছ

অধ্যায় : এক
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমকালীন অবস্থা..... ১-৪২
[রাজনৈতিক অবস্থা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, ধর্মীয় প্রেক্ষাপট, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি]

অধ্যায় : দুই
খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও ব্যক্তিত্ব ৪৩-৭৭
[জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মজীবন, শিক্ষা সংস্কার, আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা, রচনাবলী, ভাষা সৈনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, সম্মান ও উপাধি লাভ, ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, ইন্তিকাল]

অধ্যায় : তিন
মুসলিম শিক্ষা প্রসারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা ৭৮-১৩১
[চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষার উন্নয়ন, ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর লেখার রীতি প্রচলন, মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, রচনাবলীর মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ, মুক্তবের স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ, মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নয়ন, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ, টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অন্যান্য অবদান, এক নজরে খান বাহাদুরের শিক্ষা সংস্কারসমূহ]

অধ্যায় : চার
মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা ১৩২-১৯৪
[ভাষা ও সাহিত্য, আধ্যাত্মিকতা, মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা, মুসলিম সমাজ সংস্কার]

উপসংহার ১৯৫-১৯৭
গ্রন্থপঞ্জি ১৯৮-২১২

সংকেত সূচী

(স.)	:	সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম
(রা.)	:	রাযী আল্লাহু আনহু
(র.)	:	রাহমাতুল্লাহি 'আলাইহি
খ্রী.	:	খ্রীস্টাব্দ
হি.	:	হিজরী
ব.	:	বঙ্গাব্দ
ই ফা বা	:	ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বা এ	:	বাংলা একাডেমী
তা বি	:	তারিখ বিহীন
লি.	:	লিমিটেড
সম্পা.	:	সম্পাদিত
অনূ.	:	অনূদিত
পৃ.	:	পৃষ্ঠা
সং	:	সংস্করণ
খ	:	খণ্ড
Ed.	:	Edition
P.	:	Page
pp.	:	Pages
Vol	:	Volume

ভূমিকা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫) একজন মহান ব্যক্তিত্ব। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। শিক্ষক, ধর্মবেত্তা, সমাজ সেবক, মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারক এবং লেখক হিসেবে সমকালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। শেষ জীবনে তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে ইসলামের চর্চা ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা পালন করেন।

এই মনীষীর ৯২ বছরের দীর্ঘ জীবন বিভিন্ন কারণে আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তদানীন্তন ভারত উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের পশ্চাৎপদতা, রাজনৈতিক অনগ্রসরতা, অশিক্ষা, শিক্ষা স্বল্পতা, ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা, অর্থনৈতিক দুরবস্থা, সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব, ভাষা-সাহিত্যের প্রতি অনৈতিক এবং অযৌক্তিক অবহেলা প্রভৃতি বিষয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রাগ্রসর স্বচ্ছ চিন্তা বাঙালীর জাতীয় ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন কীর্তির বস্তুনিষ্ঠ অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হওয়া একান্ত আবশ্যক। উল্লেখিত উপযোগিতার কথা বিবেচনা করেই *মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা* শীর্ষক গবেষণার অবতারণা।

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা শীর্ষক এ অভিসন্দর্ভকে ৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথমেই রয়েছে *ভূমিকা,* এতে গবেষণার মূল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিটি অধ্যায়ের বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়-এ ভারত উপমহাদেশীয় তৎকালীন (১৮৭৩-১৯৬৫ খ্রী.) ব্রিটিশ শাসনাধীন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষা-দীক্ষা, আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় ও সংস্কৃতি বিষয়ে নানামুখী পশ্চাৎপদতার বাস্তব চিত্র তথ্যপঞ্জিসহ তুলে ধরা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়-এ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বহুমাত্রিক (Multi Dimensional) ও সার্বজনীন জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত ও সামগ্রিক পরিচয় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। এখানে তাঁর জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা ও কর্ম জীবন, শিক্ষা বিস্তার, শিক্ষা সংস্কার, মানব-সমাজ-দেশ ও জাতীয় পশ্চাৎপদতা দূরীকরণ, মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ, সমাজ সংস্কার ও সাহিত্য সেবায় তাঁর

উৎসর্গীকৃত জীবনালেখ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। জন্ম ও বংশ পরিচয়, শিক্ষা জীবন, পারিবারিক জীবন, কর্মজীবন, শিক্ষা সংস্কার, আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা, রচনাবলী, ভাষা সৈনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, সম্মান ও উপাধি লাভ, ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং ইন্তিকাল ইত্যাদি উপ-শিরোনামে এ অধ্যায় বিন্যস্ত হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা সংস্কারক ছিলেন। তিনি বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাই অভিসন্দর্ভের *তৃতীয় অধ্যায়*-এ তাঁর বহুমুখী শিক্ষা পরিকল্পনার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত হয়েছে এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ অবদান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এ অধ্যায়ের আলোচনার ধারাক্রম হচ্ছে– চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষার উন্নয়ন, ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর লেখার রীতি প্রচলন, মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, রচনাবলীর মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ, প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ, মুক্তবের স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ, মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নয়ন, মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ, টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তি, শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অন্যান্য অবদান, এক নজরে খান বাহাদুরের শিক্ষা সংস্কারসমূহ।

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা শীর্ষক চতুর্থ অধ্যায়ে প্রধানত ৪টি শিরোনামে আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। শিরোনামগুলো হলো– ভাষা ও সাহিত্য; আধ্যাত্মিকতা; মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা; মুসলিম সমাজ সংস্কার। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সকল চেতনা, ধ্যান-ধারণা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। তিনি ১০৮টিরও বেশি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এসব রচনার মাধ্যমে মুসলিম জাগরণে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। ভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক আলোচনায় এ বিষয়টি স্পষ্ট করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি একটি ধর্মভাবাপন্ন ও ধর্মীয় কৃষ্টি সভ্যতার অনুরাগী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শিশুকাল থেকেই ধর্মের অনুসারী ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও আধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগণিত মানুষকে দিয়েছে পথের দিশা, সুন্দর জীবনের সন্ধান। এ কারণে আধ্যাত্মিকতা শিরোনামে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনাচার কিভাবে মুসলিম সমাজ সংস্কারে অবদান রেখেছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা শিরোনামে তার ধ্যান-ধারণার উদারতা ও অসাম্প্রদায়িকতার বিবরণ বিধৃত হয়েছে। খানাবাহাদুর চেয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপদ জীবন। দেশে-দেশে, জাতিতে-জাতিতে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেন হানাহানি না থাকে, সবাই যেন সহযোগিতা, সমঝোতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশে মহৎ মানবোচিত জীবনের চর্চা ও অনুশীলন করতে পারে– তাঁর এই অভিব্যক্তিই এ আলোচনায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

মুসলিম সমাজ সংস্কার শীর্ষক আলোচনাকে ক. আদর্শ জীবন গঠন, খ. শিক্ষা সংস্কার, গ. জাতীয় জাগরণ, ঘ. অধ্যাত্ম সাধনা, ঙ. সমাজ সেবা, চ. আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা, ছ. সাহিত্য ইত্যাদি উপ-শিরোনামে বিন্যস্ত করা হয়েছে। সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে। আহ্ছানিয়া মিশনের যে অগ্রযাত্রা একটি পল্লীর নিভৃতকোণে শুরু হয়েছিল তা এই পল্লীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। ক্রমে ক্রমে এ মিশনের বিস্তার ঘটে গ্রাম থেকে শহরে, দেশে এবং বিদেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় এবং দেশের বাইরে আহ্ছানিয়া মিশনের ৮৪টি শাখা মিশন ধর্মীয় ও বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধুনিক সমাজ জীবনের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখেই সমাজ সংস্কারের আলোচিত ধারা গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। আমরা তাকে অনুসরণ করে অগ্রসর হলে নিঃসন্দেহে বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থায় সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে সফলকাম হতে পারব। চতুর্থ অধ্যায়ে মূলত এ দিকগুলো আলোচনা করে সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকাকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

অভিন্দর্ভের শেষাংশে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। উপসংহারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মময় জীবন ও সাধনার সামগ্রিক বিষয়গুলো বিধৃত হয়েছে এবং অভিসন্দর্ভ রচনায় ব্যবহৃত গ্রন্থ, রিপোর্ট, প্রতিবেদন ও পত্র-পত্রিকার পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থপঞ্জি উপস্থাপন করা হয়েছে।

অধ্যায় : এক

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমকালীন অবস্থা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি ইতিহাস, একটি সংস্কৃতি, একটি প্রতিষ্ঠান। তাঁর জীবন ছিল বিচিত্র গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সামাজিক জীব হিসেবে সমাজ জীবনের প্রতিটি পরিমণ্ডলে ছিল তাঁর সরব পদচারণা। তাঁর সমসাময়িক সমাজও ছিল বিভিন্ন ঘটনাবলীর অক্টোপাশে বিজড়িত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের জন্য তাঁর সমসাময়িক সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য অবস্থাবলী সম্পর্কে জানা দরকার।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দু'টি শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণ তাঁকে একজন পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করেছিল।[১] তাঁর জন্মের সময় উপমহাদেশের সমাজ ছিল অধঃপতিত, ঘুনেধরা ও নেতৃত্ববিহীন। ঈমান 'আক্বীদা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। শিক্ষা সংস্কৃতি ছিল অত্যন্ত হীন। রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বলতে কিছুই ছিল না।[২] যে কোন দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ সে দেশের সমাজ ব্যবস্থার উপর প্রতিফলিত হয়। রাজনৈতিক ধারা প্রতিটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় তথা মৌলিক বিষয়াবলী নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এখানে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িক কালের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অবস্থা তুলে ধরা হল :

---

১. মোঃ জিল্লুর রহমান, প্রবন্ধ : অমর মনীষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৩।

২. মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ২০০০, পৃ. ৩১।

রাজনৈতিক অবস্থা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িক কালে (১৮৭৩-১৯৬৫) মুসলমানদের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল দারুণ শোচনীয়। ৭১২ খ্রীস্টাব্দে 'মুহাম্মদ ইবনে কাসিম'[৩]-এর উপমহাদেশে সিন্ধু প্রদেশ বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানদের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়। ১২০৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী সেনাপতি 'ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী'[৪] কর্তৃক বাংলা বিজয়ের মাধ্যমে মুসলমানগণ রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[৫] পরবর্তীতে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের পর এদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬]

কোন দেশের সুস্থ রাজনীতির পূর্বশর্ত হল অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা ও জানামালের নিরাপত্তা বিধান করা। কিন্তু এ দু'টির কোনটিই ইংরেজ বেনিয়াদের সময়ে ছিল না। যে কারণে সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল একেবারেই নাজুক। এমতাবস্থায় ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ফলে জমির মালিক হয় জমিদারগণ। আর কৃষক ও

---

৩. মুহাম্মদ ইবন কাসিমের নাম ইমদাদুদ্দীন মুহাম্মদ। তিনি ৬৯৫ খ্রী. জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কাসিম ইবন ইউসুফ সাকাফী। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ছিলেন তাঁর চাচা এবং খালু। পরবর্তীতে তিনি তাঁর খালাতো বোনকে বিয়ে করেন। তাঁর সিন্ধু বিজয়ের মাধ্যমেই ইসলাম উপমহাদেশে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। দ্র. গোলাম আহমদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, বর্ধমান : বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণ, ২০০০, পৃ. ৬৯; মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, *ইসলামের ইতিহাস*, ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮, পৃ. ২৬৮।

৪. ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন বখতিয়ার খিলজি বাংলাদেশের একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তুর্কী জাতির খিলজী সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। তিনি আফগানিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলাদেশ জয় করেন। তিনি বাংলায় ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১২০৬ খ্রী. তিনি ইন্তেকাল করেন। দ্র. মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস, পৃ. ২৬৮-২৭২; নুরুন্নাহার বেগম, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, মাদারীপুর : মদীনা প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮, পৃ. ১১-১৫।

৫. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ১; ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান*, দেলওয়ার হোসেন অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ১; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৯, পৃ. ১৪০; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ২০০০, পৃ. ২৫; Jagadish Narayan Sarkar, *Islam in Bengal*, Calcutta : Patna Parakasan, 1972, P. 21-22; V.A. Smith, *The Oxford History of India*, Oxford : Spear Clarendon Press, 1976, P. 201-202.

৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ১৯৬৯, পৃ. ৪; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ১৭৫৭-১৯৪৭, ঢাকা : ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং, ১৯৭৬, পৃ. ১।

শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। জমিদারগণ অতিরিক্ত কর আদায়ের লক্ষ্যে কৃষকদের উপর অমানুষিক অত্যাচার শুরু করে। 'তিতুমীর'[৭] জমিদারদের এ অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আযাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৮]

খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কে এদেশের মুসলমানদের জীবনের একটি দুর্যোগময় যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষত এ সময় অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে রাজনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনিত ঘটে। এ সময় কয়েকজন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ পুনরায় ইসলামের সোনালী যুগ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্কারবাদী আন্দোলন কর্মসূচী হাতে নিয়ে এগিয়ে আসেন। এবং তাঁদের পরিচালিত সংস্কার কর্মসূচী ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিমূলে আঘাত হানতে শুরু করে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতীয় উপমহাদেশের তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায় যখন বিপর্যস্ত ও বিভ্রান্ত, যখন তাঁরা তাদের আকস্মিক পতনের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত, তখন যে সব ব্যক্তিত্ব ইসলামের পুনর্জাগরণের জন্য হিদায়াতের সোনালী মশাল হাতে এগিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী'[৯], 'শাহ্ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলবী'[১০], 'সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ'[১১], 'হাজ্জী

---

৭. তিতুমীরের পূর্ণনাম সাইয়্যেদ নিসার আলী। তিনি ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দ মোতাবেক বাংলা ১১৮৮ সালের ১৪ মাঘ ২৪ পরগণা জেলার চাঁদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সাইয়্যেদ হাসান আলী। ঐতিহাসিক সূত্র ধরে তিনি ছিলেন হযরত আলী (রা.)-এর বংশধর। তিনি আহ্লুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন। তিতুমীর ১৯ নভেম্বর ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে সকাল ৯টায় নারকেলবাড়ীয়ায় ইংরেজ সৈন্যদের কামানের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন। দ্র. আব্বাস আলী খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮; আব্দুল গফুর সিদ্দিকী, *শহীদ তিতুমীর*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৬৮ বাংলা, পৃ. ১; অধ্যাপক আব্দুল গফুর সম্পাদিত, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৫১; সম্পাদনা পরিষদ, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১২শ খণ্ড, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯৭; অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি, *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*, কলকাতা : শ্রীধর প্রকাশনী, তা বি, পৃ. ৪৭০-৪৭১; Dr. Muin-ud-din khan, *Titumir and his followers*, Dacca : Islamic Foundation Bangladesh, 1980, P. 7.

৮. মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, ঢাকা : ইকাবা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪-১৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৮; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী প্রা. লি., ১৯৭৬, পৃ. ৫৪৫; ড. কীরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, ১ম খণ্ড, কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সি, ১৯৯২, পৃ. ১৪৫; R.C. Majumdar, *The Sepoy Mutiny*, Cacutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1957, P. 18.

৯. শাহ ওয়ালীউল্লাহ খ্রীস্টিয় অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভে হিজরী ১১৪ সন মোতাবেক ১৭০৩ বা ১৭০২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবুল ফায়্যাদ আহ্মাদ কুতুবুদ্দীন। তিনি একজন যুগস্রষ্টা চিন্তানায়ক। ভারতে মুঘল রাজশক্তির অস্তবেলায় বিদেশী পাশ্চাত্য শক্তির অভ্যুদয়কালের পূর্বক্ষণে ভারতে ইসলামের পথনির্দেশে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়। তাঁর পিতা শাহ্

শরীয়তুল্লাহ[১২]'র' নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আব্দুর রহিম ও পিতামহ শাহ্ ওয়াজীউদ্দিন সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে বিখ্যাত 'আলিম ছিলেন। তিনি প্রায় দু'শত গ্রন্থ রচনা করেন। দীর্ঘকাল জাতীয় কল্যাণে রত থাকার পর শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। তিনি ছিলেন স্বীয় শতাব্দীর মুজাদ্দিদ। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২৬৮-২৭০; মুস্তাফিজুর রহমান, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী*, করাচী : ইসলাতুল খাফা, তা বি, পৃ. ১৩-১৪; Tara Chand, *History of the freedom Movement in India*, Vol-1, Calcutta : The Publications divisions, 1961, P. 177-180.

১০. শাহ্ আব্দুল আযিয ২২ রমযান ১১৫৭ হি. মোতাবেক অক্টোবর ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। সমসাময়িককালে তিনি ছিলেন 'আলিম ও শায়খদের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর শিষ্যত্ব বড় বড় 'আলিমদের জন্যও গর্বের বিষয় ছিল। পর পর পঞ্চান্নবার তাঁর জানাযার নামায আদায় করা হয়। দ্র. রহীম বখ্শ, *হায়াত ওয়ালী*, দিল্লী : আফদালুল মা'তাবী, ১৩১৯ হি., পৃ. ৩৩৮-৩৪২; কাজী মুহাম্মদ বশীরউদ্দীন, *তাজকিয়্যাহ আজিজিয়্যাহ্*, মীরাট : মাত্বা মুজতাবাঈ, ১৮২৬ খ্রী., পৃ. ১০৯-১১৭; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৭-৪৭৮।

১১. সাইয়্যেদ আহ্মাদ শহীদ ইবন সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ৬ সফর ১২০১ হি. মোতাবেক ২৮ নভেম্বর ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে রায়বেরেলীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বংশানুক্রম ছত্রিশ পুরুষ উর্ধ্বে আমীরুল মুমিনীন হযরত 'আলী (রা.)-এর সাথে মিলিত হয়। (হাসানী) সাইয়্যেদগণের এ বংশ সুলতান শামছুদ্দীন ইলতুৎমিশের শাসনামলে ভারতে আসেন এবং কর মানিকপুরে বসতি স্থাপন করেন। ভারতে ইসলামী শাসন ও শরী'য়াতের আইন কানুন প্রবর্তন করাই তাঁর জীবনের প্রধান ও সর্বাপেক্ষা প্রিয় লক্ষ্য ছিল। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের মে মাস মোতাবেক ১২৪৮ হিজরীতে সাইয়্যেদ আহ্মাদ সঙ্গীদের নিয়ে শাহাদাতবরণ করেন। দ্র. আবুল কালাম শামছুদ্দীন, *পলাশী থেকে পাকিস্তান*, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ৩৪; ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫; সৈয়দ মাহমুদুল হাসান, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭৩; সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী, *মাশ্বযান আহমাদী*, আগ্রা : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ১২৯৯ হি., পৃ. ২৯-৩৫; দিওয়ান অমর নাথ, *জা'ফার নামাহ্*, লাহোর : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮ খ্রী., পৃ. ২৪১-২৪৫; M.T. Titus, *Indian Islam*, London : University Press, 1930, PP. 181-186; W.C. Smith, *Modern Islam in India*, Lahore, 1943, PP. 187-191.

১২. হাজী শরী'য়াতুল্লাহ ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত শামাইল নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত তালুকদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনৈসলামিক কার্যকলাপ ও ইংরেজদের নির্যাতন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে ভারত উপমহাদেশকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করেন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল একটি স্বাধীন অখণ্ড ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে তোলা। তিনি একজন শান্তিপ্রিয় সংস্কারক ও প্রচারক ছিলেন। তিনি ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪; হুমায়ুন আব্দুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬, পৃ. ৫৫; ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ৪র্থ সং, ১৯৯৭, পৃ. ২-৩; Ram Gopal, *Hindu culture During and After Muslim Rule*, Delhi : M.D. Publications, 1994, PP. 75-77; মাহমুদ শাহ্ কোরেশী, প্রবন্ধ : উনিশ শতকে মুসলিম ধর্মালোন্দন, *মোহাম্মদী*, ৩০শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৯৫৮, পৃ. ৮১৬-৮২১।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দু'টি সংস্কারবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। উত্তর ভারতে সাইয়্যেদ আহমদ কুতুব শহীদ 'তরীকায়ে মুহাম্মাদিয়া' নামক সংস্কার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের এ চরম দুর্দিনে ইংরেজদের গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত করে দেশ ও জাতিকে প্রকৃত ইসলামী অনুশাসনের পথ প্রদর্শনের জন্য সাইয়্যেদ আহমদের জন্ম ছিল একান্ত অপরিহার্য।[১৩] এ সময়ই বাংলাদেশে হাজী শরীয়তুল্লাহ 'ফরায়েজী'[১৪] আন্দোলনের মাধ্যমে মুসলিম জাতিকে ধর্মীয় অনুশাসনে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এ দু'টি আন্দোলনের মধ্যে আদর্শগত সাদৃশ্য থাকলেও এদের মধ্যে কিছুটা মৌলিক পার্থক্য ছিল।[১৫] হাজী শরীয়তুল্লাহর ইন্তিকালের পর তাঁর পুত্র মহসীন ওরফে দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনের নেতা মনোনীত হয়ে আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে ফরায়েজী আন্দোলনের সংগ্রামের কাহিনী বাংলাদেশের ইতিহাসে এক অতি রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে (যাকে পাশ্চাত্যের অধিকাংশ ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন) ব্যর্থতার পর মুসলমানদের পক্ষে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশা নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে মুসলিম নেতাদের কেউ কেউ মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন এবং তাঁরা ইংরেজদের মন থেকে মুসলমানদের সম্পর্কে আপত্তি, অনাস্থা ও সন্দেহ দূর করতে সচেষ্ট হন।[১৬] তাছাড়া এ সময় ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত থেকে মুসলিম

---

১৩. হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭; মোহাম্মদ মোদাব্বের, *ইতিহাস কথা কয়*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১, পৃ. ১১৮।

১৪. 'ফরায়েজী' শব্দটি আরবী ফারায়েজ শব্দ থেকে উদ্ভূত। একবচন-ফারিজাহ, অর্থাৎ, 'ইসলাম কর্তৃক নির্দেশিত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য'। অবশ্য পালনীয় কর্তব্যগুলোর উপর গুরুত্ব প্রকাশকারীগণই ফরায়েজী। তবে তাঁরা ফারায়েজ শব্দটিকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কর্তৃক প্রবর্তিত গুরুত্ব ও অগুরুত্ব নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মীয় কর্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫, পৃ. ৩২-৩৩; আব্দুল মওদুদ, *ওহাবী আন্দোলন*, ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৫, পৃ. ১১২; Amalendu De, *Islam in Modern India*, Calcutta : Maya Prokashani, 1982, P. 11; Dr. Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Faradi Movement in Bengal 1818--1908*, Karachi : Pakistan Historical Society, 1965, P. XXXII.

১৫. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ১৭৫৭-১৯৪৭, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

১৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ. ২।

সমাজের অবস্থার উন্নতির জন্য এগিয়ে আসেন 'মৌলভী আব্দুর রউফ'[১৭], 'নবাব আব্দুল লতিফ'[১৮], 'সৈয়দ আমীর আলী'[১৯] প্রমুখ।

এ সকল মুসলিম মনীষীরা তাঁদের পদযাত্রার শুরুতেই লক্ষ্য করলেন যে, সকল ক্ষেত্রে হিন্দুদের বিজয় পতাকা উদীয়মান। যে বাংলায় একদিন মুসলমানরা ছিল একচ্ছত্র অধিপতি, আজ সে বাংলায় মুসলমানদের ঠাঁই নেই। এমনই এক নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলমান তথা সমগ্র বাঙালী জাতির সামাজিক দায়িত্ববোধ ও চেতনা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে আলোকবর্তিকার মত আবির্ভূত হলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আনুষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনের শুরু ও সমাপ্তি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে। এদেশের শিক্ষা ও প্রগতির ক্ষেত্রে তখন হিন্দু সমাজের ছিল নির্মম প্রাধান্য। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর তৎকালীন ভারতীয় মুসলমানগণ সম্পূর্ণভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।[২০] তারও

---

১৭. তিনি ছিলেন তৎকালীন 'দুরবীণ' সম্পাদক।

১৮. 'বাংলার শিক্ষা পয়গম্বর' নামে খ্যাত নবাব আবদুল লতিফ ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। মুসলিম সমাজে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা বিস্তারে তিনি তাঁর ৩৬ বছর ব্যাপী (১৮৪৯-১৮৮৪) কর্মজীবনের শ্রেষ্ঠতর অংশ ব্যয় করেছিলেন। তাঁর ভাষায় বলতে গেলে– 'To the couse of the Education of tha Natives in general and of Mohamedans in Particular, I have devoted the best years of my life'. তিনি তাঁর সমগ্র জীবনের কর্মকাণ্ডের স্মৃতিচারণ করে বলেন– 'আমি সারাটি জীবন স্বধর্মাবলম্বী ভাইদেরকে তাঁদের দুর্ভাগ্যজনিত দুরাবস্থা, আলস্য ও জড়তা ঝেড়ে ফেলতে উদ্বুদ্ধ করেছি।... আমার শ্রম ব্যর্থ হয়নি- স্বার্থক হয়েছে, তাঁরা সুফল পেয়েছেন। এজন্য আমি আনন্দিত। দ্র. M. Fazlur Rahman, *The Bengali Muslims and English Education*, Dacca : Bangla Academy, 1793, PP. 52-60; Enamul Haque, *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, Dacca : Samudra Prokashani, 1968, PP. 190-225.

১৯. উপমহাদেশের প্রখ্যাত আইনবিদ, মুসলিম জাগরণের অন্যতম অগ্রদূত, ইংরেজী শিক্ষার বলিষ্ঠ প্রবক্তা এবং মুসলিম সংস্কৃতির ব্যাখ্যাতা, ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী হুগলীর চুঁচুড়ার এক শিয়া পরিবারে ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। উপমহাদেশীয়দের মধ্যে তিনি সর্বপ্রথম সর্বোচ্চ ব্রিটিশ বিচারালয় প্রিভি কাউন্সিলেরজুডিশিয়াল কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি মুসলিম সমাজে অবিমিশ্র ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ইতিহাসভিত্তিক রচনাবলীর মধ্য দিয়ে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দ্র. K.K. Aziz, *Ameer Ali : His life and work*, Lahore : Publishers United Ltd, 1968, P. 102; Syed Razi Wasti (e.d); *Memories and other writtings of Syed Ameer Ali*, London : Peoples Publishing House, 1968, PP. 44-60.

২০. এ.কে. আমিনুল ইসলাম, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯৯, পৃ. ৩।

শতবর্ষ আগে এদেশের প্রায় সবকিছুর ভাগ্যবিধাতা ছিল মুসলমানগণ।[২১] ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর তাদের জীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। মুসলমানদের ভাগ্যে ঘনিয়ে আসে দুর্যোগের ঘনঘটা। ইংরেজ শাসক সম্প্রদায় দায়িত্বপূর্ণ পদগুলো হিন্দুদের প্রদান করে মুসলমান সমাজকে প্রায় পঙ্গু করে ফেলেছিল। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী খালিদ বিন সাঈদের লেখায় এ সময়কার একটি চিত্র ফুটে ওঠে।[২২] এ উপমহাদেশের রাজনৈতিক পরিবেশ যখন এমনি পর্যায়ে তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর শিক্ষা জীবন অতিবাহিত করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মজীবন তথা চাকরি জীবনের সূচনা হয় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। তাঁর কর্মজীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ বাংলার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়।[২৩] ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ জুলাই বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা প্রকাশিত হয় এবং ৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ[২৪] কার্যকর করা হয়।[২৫] বঙ্গভঙ্গের প্রভাব বাংলার রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গ এবং আসাম প্রদেশে বসবাসরত পশ্চাৎপদ মুসলমানগণ বঙ্গভঙ্গকে স্বাগত জানায়। কারণ এর ফলে 'ঢাকা' আসাম ও বাংলা প্রদেশের রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মুসলমানরা এ নবগঠিত প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা

---

২১. উইলিয়াম হান্টারের ভাষায়– '... A Hundred years ago, the Musalmans Monopolized all important offices of State. The Hindus accepted with thanks such crumbs as their former conquerors dropped from their table...।' অর্থাৎ, 'শতবর্ষ পূর্বে দেশ শাসনের দায়িত্বপূর্ণ প্রতিটি পদে ছিল মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য। আর ক্ষুদ কুঁড়ার মত যা কিছু তাঁরা ছেড়ে দিত বা ফেলে দিত, তা নিয়েই হিন্দুরা ছিল পরিতৃপ্ত।' দ্র. W.W. Hunter, *The Indian Musalmans*, London : Primier Book House, 1945, P. 161.

২২. খালেদ বিন সাঈদ বলেন– 'In 1817, in Bengal of the 773 Indians holding responsible Government Jobs, the Muslims ever though their numbers were approximately equal to Hindus in the Province, occupied only 92 positions as compared to 681 held by the Hindus'. অর্থাৎ, '১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন বঙ্গ প্রদেশে ৭৭৩টি সরকারী দায়িত্বপূর্ণ কাজে যেখানে মাত্র ৯২ জন মুসলমান নিযুক্ত ছিল, সেখানে ৬৮১ জন হিন্দু কর্মরত ছিল, অথচ লোকসংখ্যার দিক থেকে হিন্দু আর মুসলমান ছিল প্রায় সমসংখ্যক'। দ্র. Khaled bin Sayeed, *Pakistan Formative phase*, Karachi : Modern Book House, 1960, PP. 11-12.

২৩. মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ১৯৯৭, পৃ. ১২।

২৪. প্রশাসনিক সুবিধার জন্য লর্ড কার্জন ১৯০৫ সালে তৎকালীন বিশাল বাংলা প্রদেশকে দু'টি প্রদেশে বিভক্ত করেন। একেই হিন্দুরা বঙ্গভঙ্গ বলে আখ্যায়িত করেছিল। দ্র. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব সম্পাদিত, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯৯, পৃ. ৬৭।

২৫. মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত, প্রাগুক্ত।

লাভ করে। সর্বোপরি দীর্ঘদিন রাজনৈতিক ময়দান থেকে দূরে সরে থাকা মুসলমানগণ রাজনৈতিক চেতনা ফিরে পায়।[২৬]

স্বার্থান্বেষী হিন্দুমহল বঙ্গভঙ্গের ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র হিন্দু জাতির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কংগ্রেসের একজাতীয় মতবাদের মুখোশ উন্মোচিত হয়। হিন্দু-মুসলমান যে দু'টি ভিন্ন জাতি তা পরিষ্কার হয়ে পড়ে। বঙ্গভঙ্গ মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষায় যে সামান্যতম ভূমিকা রাখবে, হিন্দু সমাজ তাও মেনে নিতে পারেনি। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ রদ মুসলমানদের আশাহত করে। তাদের দুঃখ- বেদনা-হতাশা আলাদা জাতিসত্তার চেতনা জাগ্রত করে। তারা বুঝতে পারে হিন্দু-মুসলমান সম্পূর্ণ আলাদা জাতি। পরবর্তীতে এর ভিত্তিতেই দ্বি-জাতি তত্ত্বের (Two Nation Theory) জন্ম হয়।[২৭]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মজীবনের সময়টি ছিল বাঙালী মুসলমানদের জন্য একটি ক্রান্তি কাল। বাঙালী মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সমস্যাটি ছিল আত্মপরিচয়। সত্যি বলতে এ সময়টা ছিল আত্মপরিচয়ের সংকটের সময়। কারণ ব্রিটিশ ভারতে ঐতিহাসিক কারণে অগ্রসর হিন্দু সম্প্রদায়ের বিপরীতে অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকার পথটি ছিল সমস্যা সংকুল।[২৮]

১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণের পর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রভাবে তাঁর পুস্তক ব্যবসা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তিনি ঋণের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে কলকাতার বাসভবন বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তাছাড়া ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে উপনিবেশিক শাসনের শেষ অপকীর্তি জঘন্যতম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তাঁর মানসিক জীবনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা সহজে অনুমেয়। লাঞ্ছিত মানবতা ঐ বয়সে তাঁর মত ব্যক্তিকে কতটুকু বিচলিত করেছিল তা বলা কঠিন। তবে তিনি শহুরে জীবন ত্যাগ করে স্বগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[২৯]

---

২৬. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, কলকাতা : কেপি বাগচী এ্যান্ড কোং, ১৯৮৯, পৃ. ৩৪৬।

২৭. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব সম্পাদিত, *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

২৮. প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্পর্কে অভিব্যক্তি, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০০০, পৃ. ৪।

২৯. মুহাম্মদ মুসা আনসারী, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা : ইকাবা, ১৯৯০, পৃ. ১০৪-১০৫।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবসর জীবনের মাঝামাঝি সময়ে সংঘটিত হয় পাকিস্তান আন্দোলন। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের ২৩ মার্চ লাহোরে মুসলিম লীগের অধিবেশনে 'শের-এ-বাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক'[৩০] বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে 'কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ'[৩১]র দ্বি-জাতি তত্ত্ব ঘোষণা করেন। সেটি ছিল প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের ঘোষণা।[৩২] ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে জাপানীগণ ব্রহ্মদেশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অধিকৃত স্থান থেকে বিতাড়িত হয়। ইংরেজ পক্ষের জয় হলেও যুদ্ধে তাদের এতবেশী ক্ষয়ক্ষতি হয় যে, তাতে ব্রিটিশ সরকার নিস্তেজ হয়ে পড়ে।[৩৩] তাছাড়া ভারতে তাদেরকে নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ জন্য লর্ড এটলীর মন্ত্রীসভা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই উপমহাদেশে স্বাধীনতা আইনের খসড়া বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপন করলে বিলটি পার্লামেন্টে গৃহীত হয় এবং ১৮ জুলাই আইনে পরিণত হয়।[৩৪] উক্ত বিলে ব্রিটিশ ভারতে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছিল। ১৩ আগস্ট মাউন্টব্যাটেন করাচী আসেন এবং ১৪ আগস্ট তিনি গণপরিষদ সভায় অভিভাষণ

---

৩০. শের-এ-বাংলা ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে বরিশালের চাঁখোর এলাকার সাঁতুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অবিভক্ত বাংলার ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম অবিসংবাদিত জননেতা ও আইনজীবী ছিলেন। তিনি ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে 'শের-এ-বাংলা' খেতাবে ভূষিত হন। জাতীয় নেতারূপে, শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীরূপে এবং ব্যক্তিগতভাবে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে তিনি নজীরবিহীন ভূমিকা পালন করেন। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে এ মহান ব্যক্তির জীবনাবসান হয়। দ্র. সিরাজ উদ্দীন আহমদ, *জননায়ক ফজলুর রহমান*, বরিশাল : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৮৮, পৃ. ৮৮-৯২; মোঃ সোলায়মান আলী, প্রবন্ধ : শের-ই-বাংলা সম্পর্কে, *স্মরণিকা*, ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, শেরে বাংলা নগর, ১৯৮৫, পৃ. ২-৯০; সুবোধ চন্দ্র সেন গুপ্ত সম্পাদিত, *সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান*, কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬, পৃ. ৩১৫-৩১৭; A.K. Zainul Abedin, *Mamorable Speeches of Sher-e-Bangla*, Barishal : Al-Helal Publishing House, 1976, PP. 43-50.

৩১. তাঁর উপাধি 'কায়েদ-ই-আযম'। ইসলামী প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর করাচীর উজির ম্যানশনে জন্মগ্রহণ করেন। বৃহৎ ব্রিটিশ শক্তির বাড়াবাড়ি, কংগ্রেসের জাঁকজমক, হিন্দুদের ধন-সম্পদ, জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের রাজনীতি এবং নিজ জনগণের শৃঙ্খলাহীনতা ও পশ্চাদপদতা, মোটকথা কোন কিছুই তাঁর পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১শ খণ্ড, পৃ. ২৪-৪০; Latif Ahmed Sheroani, *The founder of Pakistan*, Islamabad : Global Book House, 1976, PP. 21-65.

৩২. মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম, *পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি*, ঢাকা : পাইওনিয়ার প্রেস, ১৯৬৯, পৃ. ১৬৩।

৩৩. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩, মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯।

দেন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার স্বেচ্ছায় উপমহাদেশীয়দের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।[৩৫]

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নওয়াব সলিমুল্লাহ ও এ.কে. ফজলুল হকের ন্যায় কয়েকজন মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিপ্লবী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু এক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মত বরেণ্য ব্যক্তি ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি রাজনীতি পরিহার করে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমেই জাতির সেবায় তাঁর অবদান রাখার পক্ষপাতি ছিলেন। অবশ্য কখনো কখনো তিনি তাঁর লক্ষ্য সাধনে কোন কোন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাহায্য প্রাপ্ত হন।[৩৬] বিশেষ করে তিনি যখন সহকারী জনশিক্ষা পরিচালকের দায়িতে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন এ.কে. ফজলুল হক বাংলার শিক্ষামন্ত্রী থাকায় তিনি তাঁর কাজে আশানুরূপ সাহায্য পান।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (১৮৭৩-১৯৬৫) আবির্ভাবকালটি নানা কারণে বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় বাঙালী মুসলমানদের মাতৃভাষা নিয়ে এক আত্মঘাতি বিতর্কের সূচনা হয়। এ দেশের শিক্ষার সার্বিক উন্নতিকল্পে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের প্রশ্ন ওঠে এবং সে প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বঙ্গ দেশের শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে একটি জরিপের আয়োজন চলে।[৩৭] এ ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান অনস্বীকার্য। আমরা ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দকে প্রথম ভাষা আন্দোলনের ফল বলে মনে করি। কিন্তু এ আন্দোলন যে পাকিস্তান পূর্বকাল থেকে শুরু হয়েছিল তা আমরা জানি না। ব্রিটিশ আমলে কতিপয় হিন্দু ও মুসলমান রাজনীতিবিদ হিন্দী এবং উর্দু ভাষা প্রাধান্যের জন্য যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন তার ফলে বাংলা ভাষা তার গুরুত্ব ও মর্যাদা হারাতে বসেছিল। এমনই ক্রান্তিলগ্নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সৈনিক হিসেবে আবির্ভূত হন।[৩৮]

---

৩৫. প্রাগুক্ত, Khaled bin Sayeed, *Pakistan formative phase*, PP. 31-32.

৩৬. অধ্যাপক আব্দুল গফুর, প্রবন্ধ : *সাধক শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

৩৭. রশীদ আল ফারুকী, প্রবন্ধ : *জীবনের নানা মাতৃক বিকাশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৭।

৩৮. আনোয়ারুল করিম, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও তাঁর চিন্তাধারা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ১০ম বর্ষ, ৩য়- ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭, পৃ. ৫।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমানদের দ্বারা যে সব উপন্যাস লিখিত হয়েছে, তাতে প্রকৃতপক্ষে এ শ্রেণীর জীবন প্রতিফলিত, যার প্রধান কর্মকাণ্ড মাতৃভাষা চর্চা ও শিক্ষানুরাগকে কেন্দ্র করে বিকশিত হয়েছে।[৩৯] এ চেতনা যে বাস্তব জীবনকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে তার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষানুরাগ, মাতৃভাষাপ্রীতি এবং জনসেবা, কখনো কখনো আত্মসাধনা। এসব কর্মকাণ্ডে অবগাহন করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনের সূচনা ও সমাপ্তি ঘটে।

বাঙালী মুসলমানদের ভাষা সমস্যা দীর্ঘদিনের। মাতৃভাষা প্রশ্নের বিতর্কের অবসানের পর শুরু হয় জাতীয় ভাষা ও রাষ্ট্রভাষা সমস্যা। মুসলিম সমাজের অনেক নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করলেও জাতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত ছিলেন না। পাকিস্তান সৃষ্টির পর রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নতুন সমস্যার উদ্ভব ঘটে। ভাষার রূপ ও প্রকৃতি নিয়েও বিতর্কের সূত্রপাত হয়। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষদিকে বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার প্রবেশ ঘটে। মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে একদল বাংলা ভাষাকে মুসলমানী ভাষা বানাতে সচেষ্ট হন। অন্যদিকে হিন্দু সাহিত্যিকদের মধ্যেও একদল বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত বাংলায় রূপান্তরিত করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।[৪০] সৌভাগ্যবশতঃ হিন্দু ও মুসলিম লেখক-সাহিত্যিকদের মধ্যে অধিকাংশই এ নীতির বিরোধিতা করেন। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন :

> ফার্সী ও আরবী শব্দ ছেটে দিলে বাংলা ভাষা বলতে কোন ভাষা থাকে না। এই দেখুন না কেন, বাংলার জমি-জমার প্রতিটি কথা ফার্সী, সুতরাং সেসব কথা বাংলা থেকে বাদ দিলে আমাদের মুখের কথাও বন্ধ হয়, লেখাও বন্ধ হয়।[৪১]

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিতর্কে অংশ নিয়ে অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, 'ভাষার যেটা মূল স্বভাব তার অত্যন্ত প্রতিকূলতা ভাব প্রকাশের বাহনকে অকর্মণ্য করা হয়।'[৪২] মুসলিম সমাজে অনেকেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা দেখি, যখন আমাদের সমাজের যারা নেতৃপুরুষ তাঁরা ভাষার প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ছিলেন। তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ধারণা ছিল

---

৩৯. প্রবন্ধ : *জীবনের নানা মাতৃক বিকাশ*, প্রাগুক্ত, ১১৭-১১৮।

৪০. ইমরান হোসেন, *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ৬০-৬৫।

৪১. প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ : বাংলা ভাষায় আরবী ও ফারসী শব্দ, *বুলবুল*, জৈষ্ঠ্য, ১৯৪৩, পৃ. ৪১-৪২।

৪২. *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫।

অত্যন্ত সুস্পষ্ট।[৪৩] বাঙালী মুসলমানদের ভাষার প্রশ্নে যাবতীয় বিতর্কের সমাধান পাওয়া যায় তাঁর 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য' গ্রন্থে। বাঙালী মুসলিম মানসের দ্বিধা দূর করার জন্য তিনি লিখেছেন :

> এতকাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কূটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দ্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদে সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক।[৪৪]

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীর শেষের দিকে ভাষা আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হয় খাজা নাজিমুদ্দীনের এক উক্তিতে। পরিশেষে প্রাণপণ সংগ্রামের মাধ্যমে শত বাধা উপেক্ষা করে ৮ ফাল্গুন ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ, ২১ ফেব্রুয়ারী ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ, ২৪ জামাদিউল আউয়াল ১৩৭১ হিজরী বৃহস্পতিবার 'বাংলা ভাষা' বাঙালী জাতির প্রাণের স্বাধীন মাতৃভাষা হিসেবে পরিগণিত হয়।[৪৫] যা ছিল বাঙালী জাতির জন্য এক শ্রেষ্ঠ অর্জন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জীবনের প্রথমার্ধে উপনিবেশিক শাসনাধীনে চাকরিতে থাকায় বাঙালী জনজীবনের মূল প্রবাহ হতে তিনি বিচ্ছিন্ন ছিলেন। একজন সৎ ও নিষ্ঠাবান সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে তিনি নিজেকে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে অনেক দূরে সরিয়ে রাখেন। তথাপি তিনি জনজীবনের জটিলতা সম্পর্কে অনেকখানি সচেতন ছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার সীমাবদ্ধতার মধ্যেও তাঁর উত্তম ও উদার সমাধান দিয়ে মানবতার পতাকা সমুন্নত রাখতে যত্নবান ছিলেন।[৪৬] তাই তাঁর কর্মময় জীবনের অনেক কীর্তিই জাতির নিকট চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মুসলিম জাতির সমসাময়িক ইতিহাসে যে সকল তরঙ্গ উঠেছিল, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সুদীর্ঘ জীবনের বহুলাংশ তারই প্রভাবে গড়ে ওঠে।[৪৭] অনেক প্রেরণাও তিনি সমসাময়িক আন্দোলন থেকে গ্রহণ করেন।

বাংলার রেনেসাঁর যুগে তাঁর জন্ম, শিক্ষা ও কর্মজীবন। যুক্তির যুগ, চিন্তার যুগ, জাগরণের যুগে

---

৪৩. ডঃ আবুল আহসান চৌধুরী, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সেবী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০২, পৃ. ৫-৬।

৪৪. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০।

৪৫. ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ৯৬।

৪৬. প্রবন্ধ : আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ১০৪।

৪৭. প্রবন্ধ : মাওলানা আকরম খাঁ, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮, পৃ. ৫।

তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে। এ আলোড়িত কালের মধ্যে বসে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন উপমহাদেশের মুসলমানদের দুর্দিন ও দুর্ভোগ।[৪৮] কিন্তু তিনি রাজনীতি, আন্দোলন ও সংগ্রামের পথ পরিহার করে ভাববিপ্লবের মাধ্যমে মুসলমানদের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মোপলব্ধির উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। যা তখন দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য ছিল অপরিহার্য।

আর্থ-সামাজিক অবস্থা

মানুষ সামাজিক জীব।[৪৯] সমাজবদ্ধ হয়ে জীবনযাপন করা মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম। ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের আগমনের পর হতে হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর সম্প্রীতির মাধ্যমে সমাজবদ্ধভাবে বাস করত। আর এ সম্প্রীতির সুযোগে মুসলমানদের 'আক্বীদা-বিশ্বাস, সমাজ-সংস্কৃতিতে পৌত্তলিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল।[৫০] বিশেষ করে মুঘল আমল থেকেই এ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজের উপর বিজাতীয় প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

প্রায় দু'শ বছর ব্রিটিশ শাসনের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িক উপমহাদেশের মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা একেবারে ধ্বংসের মুখে চলে গিয়েছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতা, সামাজিক অবনতি, রাজনৈতিক সহমর্মিতার অবলুপ্তি, অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রভৃতি কারণে প্রায় পুরো উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালী মুসলমান সমাজ তথা ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে চরম অবনতি ও অবক্ষয় পরিলক্ষিত হয়। মীর মশাররফ

---

৪৮. গাজী আজিজুর রহমান, প্রবন্ধ : যে আলো আলোর অধিক, আল-আহ্ছান, ১৬তম বর্ষ সংকলন, ফেব্রুয়ারী, ২০০২, পৃ. ১২।

৪৯. 'মানুষ সামাজিক জীব'—এ বাক্যটির অর্থ এটা নয় যে, মানুষের নিজস্ব কোন স্বকীয়তা বা ব্যক্তিত্ব নেই। অবশ্য যে ভাষায় ব্যক্তি নিজেকে ব্যক্ত করে তা সমাজলব্ধ। মানুষের কর্মক্ষেত্রের অনেকখানিই সামাজিক, সমাজ তার উৎস এবং সমাজের দ্বারা তা সমর্থিত ও নিয়ন্ত্রিত। প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে আছে। দ্র. অধ্যাপক খগেন্দ্র সেন, *সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা*, কলকাতা : বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৮৬, পৃ. ২৭৭।

৫০. গোপাল হালদার, *সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা : মুক্তধারা, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৪, পৃ. ৪২; ড. তারা চাঁদ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, অনুবাদ এস মজিবুল্লাহ, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৯১, পৃ. ৩১; হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০, পৃ. ৬৫।

হোসেন[৫১] (১৮৪৮-১৯১২) তাঁর লেখনীর মাধ্যমে জোরালোভাবে সমকালীন সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন।[৫২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যে যুগে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তখন বাঙালী সমাজে কী অবস্থা বিরাজ করছিল তার সঠিক প্রেক্ষিত উপলব্ধি করতে না পারলে তাঁর অবদানের গুরুত্ব সম্যক অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর কর্মজীবনের শুরু ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। তখন সমগ্র উপমহাদেশে চলছে এক মহাক্রান্তিকাল। ব্রিটিশ শাসনাধীনে বহু বছর ধরে লাঞ্ছনার জীবনযাপন করার পর সবেমাত্র মুসলমানরা একটু একটু করে মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে।[৫৩] সে সমাজে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে কী ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হয়েছিল, আজকের সমাজের মানুষের উপলব্ধির সুবিধার্থে তাঁর একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। তিনি তখন ফরিদপুর জেলার রাজবাড়ী মহকুমার অতিরিক্ত ডেপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন। রমজান মাসে কোন্ডকদী স্কুল পরিদর্শনে গিয়ে স্কুলের সেক্রেটারীর আমন্ত্রণে তার বাইরের ঘরে উঠেছেন। সন্ধ্যার সময় সুটকেস থেকে সঙ্গে আনা পাউরুটি বের করে যখন ইফতার করতে বসবেন, তখন হঠাৎ অশ্রাব্য ভাষায় গালি বর্ষণ শুরু হল।[৫৪]

---

৫১. মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৩ নভেম্বর তদানীন্তন নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমার লাহিনীপাড়া গ্রামের এক জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যচর্চা শুরু করেন। তাঁর রচিত ৩৫টি গ্রন্থের খোঁজ পাওয়া যায়। 'বিষাদ সিন্ধু' তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি তাঁর সাহিত্য কর্মের মাধ্যমে বাঙালী মুসলিম সমাজকে তাঁর নিজস্ব গৌরব ও ঐতিহ্যে, তাঁর নিজস্ব শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে, নিজস্ব তাহজীব ও তামাদ্দুনে উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্র. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ২৯-৪০; *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১৯শ খণ্ড, পৃ. ৩১৭-৩৭২; মুনীর চৌধুরী, *মীর মানস,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী : ১৯৬৪, পৃ. ১২৯-১৩৫।

৫২. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* ২য় খণ্ড, ঢাকা : হাসি প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৬৩।

৫৩. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ,* পৃ. ৫১-৫২।

৫৪. গালি দেয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন, 'সুটকেসটি ছিল চামড়ার, এই ছিল আমার অপরাধ। গ্রামের কতকগুলো নব্য যুবক তক্তপোষের উপর গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত সুটকেস দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইল ও সকলে কানাকানি করিতে লাগিল। তখন ছিল রমজান মাস, সন্ধ্যার সময়ে এফতারের জন্য উক্ত সুটকেস হইতে একটি পাউরুটি বাহির করিলাম, তখন আর যুবক দল ধৈর্য্য সম্বরণ করিতে পারিল না। একে গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত সুটকেস, তার উপর পাউরুটি। আবার কুলীণ ব্রাহ্মণ বাড়ী। আর যাই কোথায়? তাহারা কটু ভাষায় অকথ্য গালি বর্ষণ করিতে থাকিল। আত্ম-সম্মানের ভয়ে তৎক্ষণাৎ সেইখান হইতে উঠিয়া তাহাদের সীমার বাহিরে একটি পুস্করিণীর ঘাটে বসিয়া এফতার করঃ মাগরিবের নামাজ আদায় করিলাম ও গালির বোঝা শিরে লইয়া নিঃশব্দে ঐ স্থান ত্যাগ করিলাম। রমজান মাসে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দুইটি আত্মা একটি পিত্তনসহ সোজা রাস্তা ধরিলাম'। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা,* ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট, ৭ম সংস্করণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫।

এভাবেই মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু সমাজপতিদের অনেক বাধা তিনি পদে পদে অতিক্রম করেছিলেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িক সমাজে নারীরা ছিল অবহেলিত। বিশেষ করে হিন্দু সমাজের মহিলারা অতি শোচনীয়ভাবে জীবনযাপন করত। মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার নিদারুণভাবে খর্ব করা হয়েছিল। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে রামমোহন রায়ের সমর্থনে লর্ড বেন্টিঙ্ক একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে সতীদাহ প্রথা রহিত করলেও বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা, কৌলিণ্য প্রথা প্রভৃতি সমাজে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল।[৫৫] বাল্য বিবাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে প্রচলিত ছিল। তবে হিন্দু সমাজে বাল্য বিবাহের প্রচলন ছিল বেশী। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীব্যাপী বাল্য বিবাহ মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছিল। আর এ মহামারী থেকে মুসলমান সমাজও রেহাই পায়নি। মুসলমান সমাজে ১২/১৪ বছর বয়সেই বিবাহ হত। বয়স্ক মেয়েদের বিয়ে-শাদী সমাজে অসম্মানজনক ছিল এবং এরূপ ক্ষেত্রে বালিকার পিতামাতা নিন্দিত হত।[৫৬]

তৎকালীন হিন্দু সমাজে প্রচুর পরিমাণে যৌতুক লাভের অভিপ্রায়ে বহু স্ত্রী গ্রহণ ছিল সাধারণ ব্যাপার। তবে মুসলমান সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল খুবই কম। উল্লেখ্য যে, সমাজে সূফীরা বৈবাহিক জীবন থেকে কিছুটা দূরে সরে গিয়েছিল। তাঁরা বৈবাহিক জীবনের চেয়ে অধ্যাত্মবাদের উপর প্রাধান্য দিতেন।[৫৭] সে সময় মেয়ের অভিভাবকরা যেমন ছেলের নিকট থেকে পণ গ্রহণ করতো তেমনি ছেলেও মেয়ের অভিভাবকদের নিকট থেকে যৌতুক দাবী করতো। ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে গরীব অভিভাবকরা কন্যাদায়গ্রস্ত হয়ে পড়তো এবং অপ্রত্যাশিত অত্যাচারের ভয়ে সদাসর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতো। মুসলিম সমাজের এ হেন অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন :

---

৫৫. হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০; V. A. Smith, The Oxford History of India, PP. 647-684; শংকর সেন গুপ্ত, বাঙালী জীবনে বিবাহ, কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ১৯৭৪, পৃ. ১৫৩-১৬০।

৫৬. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮২, পৃ. ২৪৮-২৪৯; M.P. Srivastava, *Social Life Under the Mughals*, Allahabad : Chuqh Pablication India, 1978, P. 89.

৫৭. প্রাগুক্ত, Philip K. Hitti, *Islam and the west*, New Jersey : Van Nosproved, 1962, PP. 44-49.

এমন অবস্থায় বাড়ীতে অরূপসী কন্যার অভ্যাগমন ছিল ভাগ্য বিধাতার অতিসম্পাত, এমন মেয়ে ঘরে এলে পরিজনরা সবই বলতো, 'পোড়ামুখী বিদায় হলেই বাঁচি'।[৫৮]

অন্যদিকে হিন্দু সমাজে বরকে মূল্যবান যৌতুক প্রদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। আজও হিন্দু সমাজে তা পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামে বিধবা বিবাহ উৎসাহিত করা হলেও হিন্দুদের সংস্পর্শে এসে সে সময়ের মুসলমানগণ বিধবা বিবাহকে ঘৃণার চোখে দেখত।[৫৯] ইসলামে বিধবা বিবাহ কোন গর্হিত কাজ নয়। ভারতবর্ষে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা মেয়েদেরকে মৃত্যু পর্যন্ত নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে হত। তাদের বিবাহের জন্য ভালো প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও তারা বাহ্যিক রীতি অনুযায়ী তাতে সম্মতি দিত না।[৬০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমানরা প্রচলিত প্রথানুযায়ী মেয়েদেরকে সম্পদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করত।[৬১] তাছাড়া কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তার সমস্ত সম্পদ যে কোন ব্যক্তিকে উইল বা দান করে দিতে পারত। এটা শরী'আতবিরোধী এবং হিন্দু ধর্মের নিয়ম কর্তৃক প্রভাবিত ছিল।[৬২]

তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন করা হত। অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু সমাজের অনুকরণে বিবাহ-শাদী, খাতনা, জন্মদিন উদযাপন, প্রভৃতি আচার-অনুষ্ঠানে অতি জাঁকজমক এবং ব্যয়বহুল উৎসব প্রদর্শন করত। গান-বাজনা ও নৃত্যগীত দিয়ে এ সমস্ত

---

৫৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ* (অখণ্ড), ঢাকা : এস. আর প্রিন্টার্স, ১৯৯৫, পৃ. ৫৫২।

৫৯. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslim in Bengal 1757-1856*, Dacca : Bangla Academy, 1977, P. 29.

৬০. প্রাগুক্ত, M.R.S Meer Hasan Ali, *Observations of the Musalmans of India*, Delhi : Idara-i- Adabial, 1973, P. 46.

৬১. আসলেহ হুসাইনী, *শরী'য়াত বিল আওর লীগ*, দিল্লী : জম'ঈয়তে 'উলামায়ে হিন্দ, তা বি, পৃ. ৪-৫; 'আব্দ আল্ রহমান খান, *সীরাতে আশরাফ*, মুলতান : ইদারাহ নশর আল-শরীফ, ১৯৫৬, পৃ. ৫৬৭; Tahir Mahmood, *Muslim Personal law role of the state in the Subcontinant*, New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd. 1977, P. 26.

৬২. শরী'য়াতের বিধান অনুযায়ী কেউ তার সম্পদের এক তৃতীয়াংশের অতিরিক্ত বা দান করতে পারে না। দ্র. 'আলী ইবন আবূ বক্কর বুরহান আল-দীন মারগেনানী, *হিদায়াহ্*, (আখিরায়ন), যশোর : যাকারিয়্যাহ্ কুতুবখানা, তা বি, পৃ. ৬৩৮-৬৩৯; আব্দুল্লাহ্ ইবন আহম্মদ আন-নাসাফী, *কানয আল্-দাকাইক*, করাচী : কুতুবে কুরআন মঞ্জীল, তা বি, পৃ. ৪১৪-৪১৫; Tahir Mahmood, *Muslim personal law role of the State in the Subcontinant*, P. 26.

অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলা হত।[৬৩] শিশুর জন্মকে কেন্দ্র করে 'আক্বীকা অনুষ্ঠান পালন করা হত। এসব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-স্বজনকে দাওয়াত দেয়া হত এবং উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুর ইসলামী নাম নির্ধারণ করা হত। বাঙালী মুসলমানরা উক্ত অনুষ্ঠানে ধর্মীয় কিতাবাদি আলোচনা করত। আজও বাংলাদেশে এ নিয়মের প্রচলন আছে। আর এটাই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে আরবী নামসমূহের প্রচলনের কারণ।[৬৪] এমনকি সন্তানের জন্ম হলে তারা বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ করত।[৬৫] সে সময় মুসলিম সমাজে বিয়ে-শাদী, খাতনা, জন্মদিন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে আতশবাজির প্রচলন ছিল।[৬৬] জুয়াখেলা, দাবা খেলা, ঘুড়ি উড়ানো, প্রাণীর লড়াই, কবুতর বাজী প্রভৃতি কুপ্রথা যুবকদের নেশা হয়ে উঠেছিল। এছাড়া তৎকালীন সময়ে অতিরিক্ত মোহরানা ধার্য করা হত। বরযাত্রীদের মাত্রাধিক আপ্যায়নের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয়ের প্রচলন ছিল। এমনকি সুদী কর্য করে পুত্র-কন্যাদের বিয়ে দেয়া হত।[৬৭] এভাবে অসংখ্য অসামাজিক কার্যকলাপ ও কুসংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িক উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।

বাঙালী মুসলমানদের সে সময়টা ছিল অন্ধকার, কুসংস্কার এবং সংকীর্ণ চিত্ততার বারবেলা। এ সময়টাতে এ যুগশ্রেষ্ঠ মনীষীর আবির্ভাব ঘটে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জীবনকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখতে পেরেছিলেন। আর পাহাড় কেটে কেটে তাঁর জাতির জন্য চলার পথ নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এ দুর্গম যাত্রাপথে তাঁর জীবন ও সংগ্রাম একটি মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। তিনি মানব জীবনের সূত্রগুলোকে এবং মৌলিক দিকগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলেন। একটি জরাজীর্ণ সমাজ ভেঙ্গে চূর্ণ করে দিয়ে আশার আলো ও আকাঙ্খার ইট-সুরকি বসিয়ে নতুন সমাজের ভীত তৈরী করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। বিশেষ করে তিনি বাঙালী মুসলমানদের সামাজিক নিশ্চলতাকে একটু নাড়া দিয়ে তাদেরকে চলমান করে তুলেছিলেন।

---

৬৩. মতিয়ার রহমান, প্রবন্ধ : সমাজ চিত্র, মোসলেম দর্পন, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭২, পৃ. ১৩৫; Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural history of Bengal*, Vol-1, Karachi : Pakistan Historical Society, 1963, P. 288. ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৭; মনিরুজ্জামান এসলামাবাদী, প্রবন্ধ : আঞ্জুমানে ওলামা ও সমাজ সংস্কার, *আল এসলাম*, আশ্বিন ১৩২৬ বাংলা, পৃ. ৩০২।

৬৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২৪৬-২৪৭।

৬৫. রাজিয়া মজিদ, *শতাব্দীর সূর্য শিখা*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৭, পৃ. ৭৪।

৬৬. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৩১; Muhammad Abdur Rahim, *Social and cultural History of Bengal*, P. 287.

৬৭. মোঃ আব্দুস সামাদ, প্রবন্ধ : আমাদের সমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দু, *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩ বাংলা, পৃ. ১৭৭।

বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার আগে মুসলমানরা ছিল শাসকগোষ্ঠীভুক্ত। সমাজে তারা ছিল সমৃদ্ধশালী কিন্তু ইংরেজ শাসনের পর থেকে এদেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘনিয়ে আসে এবং তাতে এদেশের মুসলিম সমাজই বেশী করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি অনেকটা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। লাখেরাজ সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি, মুসলিম শিক্ষাবিদ, ছাত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত হওয়া– এ সবই মুসলমানদের জ্ঞানার্জন ও ব্যবহারিক জীবনে টিকে থাকার ক্ষেত্রে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। ইংরেজী ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি এবং সর্বক্ষেত্রে ইউরোপীয় কৃষ্টি-সভ্যতার প্রসারতায় মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ, এতকাল মুসলমানদের শিক্ষা ও কৃষ্টির বাহন ছিল আরবী ও ফার্সী ভাষা। তাছাড়া এই দু'টি ভাষাই ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় ও জীবিকার্জনের মাধ্যম। এ সকল কারণে মুসলমানদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হয় এবং তারা বিত্তহীন কৃষক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে দারিদ্রগ্রস্ত হয়ে পড়ে।[৬৮] অনেক ঐতিহাসিক ও মনীষী মুসলমানদের দুর্দশার জন্য বৈষম্য ও নির্যাতনমূলক ব্রিটিশ শাসননীতিকেই দায়ী করেছেন।[৬৯]

মুসলিম শাসনামলে রাজস্ব বিভাগের চাকরি ও জমিদারী ছাড়া অন্য সবক্ষেত্রে মুসলমানদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য ছিল। বেসামরিক উচ্চপদে, সামরিক ও বিচার বিভাগের চাকরিতে মুসলমানদের আধিপত্য ছিল। বলা বাহুল্য, মুসলিম আইনের প্রাধান্যের কারণে বিচার বিভাগে বরাবরই মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।[৭০] কিন্তু রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের অবস্থার মারাত্মক অবনতি ঘটে। 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' গ্রন্থে মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি ও অবহেলার প্রমাণ পাওয়া যায়।[৭১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের আর্থ-সামাজিক

---

৬৮. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ১৭৫৭-১৯৪৭*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৬৯. বাংলার মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রদূত নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩) যথার্থই বলেছেন– 'ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে। হিন্দু সমাজ তাদের প্রজা। কিছুদিন পূর্বেও সরকারী কর্মে তাদের প্রাধান্য ছিল। বেতন-ভাতা, জায়গির-জিরাত ইত্যাদি বাবদে তারা যথার্থ উপার্জন করত। ইংরেজ আমলে মুসলমান আমলের নিয়ম কানুন পরিবর্তন ও নতুন নতুন বিধি-বিধান প্রবর্তনের ফলে মুসলমানদের অনেক সুযোগ সুবিধা হ্রাস পায়। তারা নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্র. নবাব আব্দুল লতিফ খান, *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*, অনুবাদ : আবু জাফর শামছুদ্দীন, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ৪৮।

৭০. ওয়াকিল আহমদ, *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬।

৭১. But indeed ... there is now firm conviction that we have failed in our duty to Muhammadan Subjects of the Queen. A great section of the Indian population ... decaying under British rule ... for their degeneracy is but one of the results of our political ignorance and neglect. Note: W. W. Hunter, *The Indian Musalmans*, P. 113.

অবস্থার পর্যালোচনায় আমরা দেখতে পাই যে, সে সময় ইংরেজ সরকার মুসলমানদের সকল সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত করে রাখে। সরকারী চাকরির প্রতিটি দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অপরদিকে হিন্দুরা ছিল ব্রিটিশ স্বার্থের পৃষ্ঠপোষক। এ কারণে সরকারী অফিস আদালত তারা দখল করে বসে। মুসলমানরা পড়ে যায় মহাসংকটে। উইলিয়াম হান্টার প্রদত্ত তালিকা এ সত্যের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।[৭২]

---

৭২. সারণী-০১

	ইউরোপিয়ান	হিন্দু	মুসলমান	মোট
চুক্তিবদ্ধ সিভিল সার্ভিস	২৬০	–	–	২৬০
রেজুলেশন বহির্ভূত জেলাসমূহে	–	–	–	–
বিচার বিভাগীয় অফিসার	৪৭	–	–	৪৭
এক্সট্রা এসিস্ট্যান্ট কমিশনার	২৬	৭	–	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	৫৩	১১৩	৩০	১৯৫
ইনকামট্যাক্স এসেসার	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট	৩৩	২৫	২	৬০
স্মল জজ কোর্টের জজ এবং সাবডিনেট জজ	১৪	২৫	৮	৪৭
মুনসেফ	–	১৭৮	৩৭	২১৫
পুলিশ বিভাগে সকল গ্রেডের গেজেটেড অফিসার	১০৬	৩	–	১০৯
গণপূর্ত বিভাগ	১৫৪	১৯	–	১৭৩
মেডিকেল ডিপার্টমেন্ট	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
গণপূর্ত, একাউন্ট	২২	৫৪	–	৭৬
গণপূর্ত সাবডিনেট এস্টাবলিশ	১২	১২৫	৪	১৪১
জনশিক্ষা	৩৮	১৪	১	৫৩
শুল্ক	৪১২	১০	–	৪২২
মোট	১২৭৭	৬৮১	৯২	২০৫০

দ্র. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮; মেসবাহুল হক, *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৬।

শুধু শিক্ষা খাতে নয়। প্রায় প্রতিটি খাতে ইংরেজ সরকারী সীমাহীন নির্যাতন শুরু করে। আর্থিক দিক দিয়েও তারা যুলুম শুরু করেছিল। শাসকদের পরেই দেশের সামাজিক সোপানে ছিল আমীর-ওমরা ও জমিদারগণ। তারা ছিল 'সমাজের প্রথম শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায়'।[৭৩] কোম্পানী গভর্নমেন্ট কর্তৃক মুসলিমবিরোধী আর্থিক নীতির কারণেই জমিদারগণ অভিজাত শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়। রাজস্ব সংগ্রহে তারা নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলত। কোম্পানী সরকারের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য খাজনা সংগ্রহের ব্যাপারে অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করত। তাদের চরম শোষণে সামান্য সময়ের ব্যবধানে সমাজের মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ভিক্ষুকে পরিণত হয়।[৭৪]

মুসলিম শাসনামলে সকল দিক দিয়েই মুসলমানগণ একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি ছিল। শাসন ক্ষমতা হারাবার পর থেকে তাদের সার্বিক বিপর্যয় শুরু হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। ইমরান হোসেনের গ্রন্থে উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ৬৭ জন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মধ্যে মুসলমান ২৪ জন, হিন্দু ২৬ জন এবং ইংরেজ ছিল ১৭ জন। ১৮৪৭-৪৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ও আসামের মোট ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মুসলমান ছাত্র ছিল ৪,১৮৬ জন, হিন্দু ৯০৭ জন ও খ্রীস্টান ১৫৪ জন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ৭৩৪ জন উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৪৪ জন। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে হিন্দুদের মধ্যে ৬৫% কৃষি, ১১% শিল্প ও ১১% বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মধ্যে ছিল ৮৬% কৃষি, ৪% শিল্প ও ৪% বাণিজ্যের উপর নির্ভরশীল।[৭৫]

---

৭৩. সমাজের অভিজাত শ্রেণী সাধারণত তারাই ছিল যারা সাধারণ প্রজাদের উপর থেকে সম্পদ অর্জন করে বিলাসবহুল জীবনযাপন করত। উচ্চহারে জনগণের নিকট থেকে কর আদায় করে সাধারণ জনগণকে সর্বশান্ত করে দিত। মদ জাতীয় জিনিস ছিল তাদের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। অবৈধ পথে উপার্জনই ছিল তাদের একমাত্র অবলম্বন। দ্র. *A Short History of Muslim rule in India*, P. 457.

৭৪. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*, পৃ. ২২৭; আবুল কালাম শামসুদ্দীন, *পলাশী থেকে পাকিস্তান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫; ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪-৩৮; Shila Sen, *Muslim Politics in Bengal*, New Delhi : Lessess of Arjun Press, 1997, PP. 1-2.

৭৫. ইমরান হোসেন, *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জন্ম ও বেড়ে ওঠা ছিল এমন সময়ে যখন তাঁর আপন সম্প্রদায় পশ্চাদপদতার অচলায়তন অতিক্রম করার জন্য সবেমাত্র উদ্যোগী হতে শুরু করেছে।[৭৬] নিজে উচ্চশিক্ষিত হয়ে সমাজ সচেতনতার কারণে আপন সম্প্রদায়কে আর্থ-সামাজিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজকে কি করে গতিশীল করা যায় সে কাজটা তিনি সমাজের দূত হিসেবে করে গেছেন।[৭৭] কোন ব্যক্তি সমাজবিচ্ছিন্ন কোন সত্তা নয়, সমাজের মধ্য থেকেই সমাজকে দেখা, সমাজের সাধারণকে দেখা এবং সমাজের অধিকাংশ মানুষকে দেখা একজন সমাজ সংস্কারকের কাজ। একজন কবি, একজন সাহিত্যিক যে কাজটা করেন, একজন শিল্পীও সে কাজটা করেন, একজন দার্শনিক, একজন রাজনীতিবিদও সে কাজটি করেন। কিন্তু একজন সৃষ্টিশীল মানুষ সমাজকে কিভাবে দেখেন? একজন সৃষ্টিশীল মানুষ সমাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে যে মৌলিক উপাদানগুলো প্রয়োজন সে উপাদানগুলো সংগ্রহ করে সমাজ নির্মাণ করতে থাকেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার হাতে সেই আলো, সেই শক্তি, সেই গতি এবং ডাইনামিজম ছিল। আর সে কারণেই তাঁকে আমরা তাঁর সমসাময়িক কালের একজন শ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক হিসেবে আবিষ্কার করতে পারি।

ধর্মীয় প্রেক্ষাপট

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি অনগ্রসর মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অখণ্ড ভারতবর্ষে তখন মুসলমানদের ঘোর দুর্দিন, শিক্ষা-দীক্ষা, রাজনীতি, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, বিজ্ঞান, দর্শন সর্বক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল পশ্চাদপদ। অশিক্ষা, কুশিক্ষার কারণে ধর্মীয় ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল মুসলমান সমাজ। সংস্কারের অভাবে এই পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষকে ইসলামের সোনালী ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে জীবনাচরণের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরে স্বপ্নিল আশায় বুক বাঁধতে ব্যর্থ হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়।[৭৮] এমনি মহাদুর্দিনে উনিশ শতকের শেষার্ধে উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ, মুসলিম ঐতিহ্যের পাঞ্জেরী, শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শুভাগমন ঘটে।

তৎকালীন সময়ে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

---

৭৬. প্রফেসর ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রবন্ধ : একজন সমাজ সচেতন মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ৩।

৭৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) সম্পর্কে অভিব্যক্তি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৭৮. প্রবন্ধ : যে আলো আলোর অধিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

একদিকে তারা নিজেদের ধর্ম ও আদর্শ থেকে দূরে সরে যায় অন্যদিকে তারা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কেও উদাসীন হয়ে পড়েছিল। এর সাথে ভূঁইকোড় হিন্দু জমিদার ও আমলাদের দৌরাত্মে মুসলমান জনসাধারণের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। মুসলমান সমাজেও ব্যাপকভাবে কুসংস্কার ও অনৈসলামী আচার-অনুষ্ঠান অনুপ্রবেশ করে। ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মের নামে অধর্মের প্রাধান্য দেখা দেয়। সমাজের সবকিছু হিন্দু আদর্শানুযায়ী পরিচালিত হতে শুরু করে। অনেকে ইসলামের মৌলিক বিধান সম্পর্কেও ছিল অজ্ঞ।[৭৯] তাছাড়া অধিকাংশ মুসলমান ছিল নামেমাত্র মুসলমান। ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে তাদের কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না।[৮০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাও তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তৎকালীন মুসলমানদের শোচনীয় অধঃপতন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৮১]

তাঁর জন্মের সময় উপমহাদেশের মুসলিম সমাজ কুসংস্কার ও গোঁড়ামীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিল। ইসলামের মূলভিত্তি 'তাওহীদ'[৮২] এবং হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রদর্শিত পথের পরিবর্তে সমাজে

---

৭৯. হুমায়ুন আব্দুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪; ড. মুহাম্মদ ইনামুল হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২; শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস*, কলকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯১, পৃ. ২৫৪; Dr. Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Faradi movement in Bengal*, P. 12.

৮০. সূফী জুলফিকার হায়দার সে যুগের মুসলমানদের অবস্থা বর্ণনায় বলেন :

কেননা, অনেকেই; আধা হিন্দু, আধা মুসলমান, দিনে ইহুদী, রাতে খৃষ্টান,

শয়তানের সাথে দোস্তী কারো– কেহ বা খান্নাসের মেহমান।

দ্র. সূফী জুলফিকার হায়দার, প্রবন্ধ : একটি আদর্শ জীবন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১।

৮১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'বর্তমান যুগে মোছলমানগণ প্রাণশূন্য, কেবল আক্ষরিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। ইহারা ছরওয়ারে কায়েনাত মুফাখ্খারে মাজুদাত হজরত রছুলুল্লার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভুলিয়াছে। একতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া গিয়া ইছলামের নামে কলঙ্ক আনিয়াছে, প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়াছে।... সমাজ বাক্যাড়ম্বরে তৃপ্ত নহে, সমাজ চায় কার্য্যকরী দৃষ্টান্ত, সমাজ চায় নতুন জীবন, নতুন প্রেরণা, নতুন জাগরণ'। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৮২. 'তাওহীদ'-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একত্ববাদ বা কাউকে একক বলে স্বীকার করা। ব্যাপক অর্থে আল্লাহর এক চিরন্তন সত্ত্বায় বিশ্বাস করাকে তাওহীদ বলা হয়। ইসলামী পরিভাষায়, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনকে ইবাদাতের যোগ্য একক সত্ত্বা হিসেবে স্বীকার করাকেই তাওহীদ বলা হয়। দ্র. এম.এ. ছালাম, *ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ*, ঢাকা : অবিস্মরণীয় প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ৫৩।

কুফর[৮৩], শিরক[৮৪], বিদ'আত[৮৫], কুসংস্কার ও শরী'য়াতবিরোধী আচার-অনুষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করেছিল।[৮৬] অনৈসলামী কার্যকলাপ ও পাপাচার সমাজ জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছিল।[৮৭] এর কারণ হিসেবে বিজয়ী মুসলমানদের সংস্কৃতির সাথে এদেশের সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক সংস্কৃতির সংযোগ সাধনকে উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে।[৮৮] সংস্কৃতির এ সম্মিলনী ধারা শুধুমাত্র তৎকালীন ভারত উপমহাদেশেই নয় বরং মুসলিম অধিকৃত পারস্যেও এর বিষাক্ত আবহ পরিলক্ষিত হয়।[৮৯] ভারতে মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত অনেক অনৈসলামিক কার্যকলাপের প্রভাব ইরানের ভূখণ্ডেও

---

৮৩. ইমাম গাযালী (র.) বলেন– 'ঈমান হল হযরত নবী করীম (স.)-এর উপর আনীত দ্বীনের সকল বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য ও অনুসরণের অঙ্গীকার এবং তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। আর 'কুফর' হল নবী করীম (স.)-কে অস্বীকার করা অথবা তাঁর আনীত দ্বীনের কোন একটি বিষয়কে অস্বীকার করা। সুতরাং বুঝা গেল, ইসলামের সমুদয় বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের জন্য জরুরী। কিন্তু সমুদয় বিধান নয়; বরং ইসলামের শুধুমাত্র একটি বিধানকে অস্বীকার করাও কুফরী। দ্র. মাওলানা মোঃ আব্দুর রহিম, *জাহান্নামের আগুন হতে আপন ঘর বাঁচান*, ঢাকা : ফাতেমা কোরআন মহল, ২০০১, পৃ. ২৭।

৮৪. 'শিরক' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ অংশীদার স্থাপন করা, সমকক্ষ মনে করা ইত্যাদি। ইসলামী শরী'য়াতের পরিভাষায়, বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীনের সমকক্ষ হিসেবে অন্য কিছু বা কাউকে মনে করার নামই শিরক। আল্লাহর সাথে শিরক সাধারণত তিন প্রকার– ১. শিরকে আকবর, ২. শিরকে আসগার, ৩. শিরকে খাফিউ। এগুলোর আবার বিভিন্ন উপপ্রকার আছে। উল্লেখ্য যে, শিরকে আকবর বান্দাকে দ্বীন থেকে বের করে দেয় এবং তার যাবতীয় নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। এর পরিণাম হল চিরস্থায়ী জাহান্নাম। দ্র. মুহাম্মদ আনিসুজ্জামান নাসির, প্রবন্ধ : শিরক ও তার ভয়াবহ পরিণাম, *দৈনিক সংগ্রাম*, ২৬ বর্ষ ৬০তম সংখ্যা, ২০ মার্চ, ২০০০, পৃ. ৭।

৮৫. বিদ'আত শব্দের আভিধানিক অর্থ নব উদ্ভূত, নতুন কিছু ইত্যাদি। পরিভাষায়, যা রাসূল (স.), সাহাবা কিরাম, তাবে'ঈন ও তাবে তাবে'ঈনের যুগে ছিল না এবং যা শরী'য়াত সমর্থিত নয় এমন বিষয়কে বিদ'আত বলা হয়। বিদ'আত দু'প্রকার– ১. বিদ'আতে হাসানাহ-যেমন কুর'আন ও হাদীসের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা; ২. বিদ'আতে সায়িয়্যাহ অর্থাৎ খারাপ বিদ'আত। দ্র. আব্দুর রহিম, *সুন্নত ও বিদ'আত*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪, পৃ. ৬-৭, ৫২-৫৮।

৮৬. হুমায়ুন আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩; হাবিবুর রহমান, প্রবন্ধ : সমাজের কথা, *ইসলাম দর্শন*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭ বাংলা, পৃ. ৩০।

৮৭. শাহ ইসমাঈল শহীদ, *তাকবিইয়াত আল-ঈমান*, দিল্লী : নিউ লিথু প্রেস, তা বি, পৃ. ৮; মাওলানা আমিনুল ইসলাম, প্রবন্ধ : হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী : রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, অগ্রপথিক, ৩য় বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৪।

৮৮. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯, পৃ. ৫৭; Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 3.

৮৯. ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; Edward G. Brown, *A literary history of persia*, Vol-1, Cambrige : The University press, 1956, PP. 113-114.

স্থিতিলাভ করেছিল। এমনকি ইসলামের জন্মভূমি আরবেও এ ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য অবিকৃত থাকেনি। যার ফলে ওহাবী আন্দোলন একটি ধর্মীয় সংস্কারবাদী আন্দোলন হিসেবে বিস্তার লাভ করেছিল।[৯০]

এভাবে পর্যালোচনা করলে ভারতে ইসলামের উপর হিন্দু ধর্মের প্রভাবের চারটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে– ১. হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিবাহ, ২. মুসলমান পীরের হিন্দু মুরীদ এবং হিন্দু যোগীর মুসলমান শিষ্য গ্রহণ, ৩. মুসলিম মানসে হিন্দু চিন্তা-ধারা ও লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব এবং ৪. ইসলামী শিক্ষার অসম্পূর্ণতা, অর্থাৎ ইসলামী শিক্ষার নির্ভরযোগ্য পটভূমি ব্যতিরেকে ইসলাম গ্রহণ।[৯১] ফলে মুসলিম সমাজে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়েছিল। ইসলামী শিক্ষার অভাবে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে নানা রকমের অনৈসলামিক রীতি-নীতি দেখা দেয় যার ফলশ্রুতিতে তারা পাপাচারে জড়িয়ে পড়ে।[৯২] তাছাড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রায় দু'শ বছর ধরে এদেশ শাসন করে এবং তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এদেশবাসীর উপর চাপিয়ে দেয়। সেই সাথে স্বার্থবাদী হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের সহায়তা করে এবং ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার এক হীন চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এর প্রভাবে ও এ চক্রান্তের শিকার হয়ে মুসলমানগণ কবর পূজা, পীর পূজা, হিন্দুদের পূজা পার্বণে চাঁদা দেয়া ও প্রত্যক্ষ সহায়তা করা এবং এ জাতীয় অনেক ধর্মবিগর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সময় মুসলমানদের পীর পূজা ও কবর পূজা মুসলিম সমাজে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় চড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক টিটাসের মতে, 'এ কুসংস্কার আফগানিস্তান, পারস্য ও ইরান থেকে আমদানি করা হয়'।[৯৩] তৎকালীন অশিক্ষিত মুসলিম সমাজে পীরের কবরে সিজদা প্রথা প্রচলিত ছিল।[৯৪] তাদের বিশ্বাস ছিল, এতে বালা-মুসিবত দূর হয়, শত্রু ধ্বংস হয়, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়, মামলা মুকদ্দমায় জয় লাভ করা যায়, সন্তানহীন সন্তান লাভ

---

৯০. ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭; Dr. Muin Uddin Ahmed Khan, *History of the Faradi Movement in Bengal*, P. 119; *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, পৃ. ২৭।

৯১. ড. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬; Murry T. Titus, *Islam in India and Pakistan,* Madras : The Diocesam Press, 1959, PP. 160-161.

৯২. কাজী আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৯৩. Murry T. Titus, *Islam in India and Pakistan*, P. 159; আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, অনূদিত, পৃ. ৬২-৬৩; Edward Montel, L. *Islam*, Paris : Poyat and Co. 1921, P. 51-52.

৯৪. মৌলবী আব্দুল ওদুদ, প্রবন্ধ : সুন্নত ও বিদ'আত, *হেদায়াত*, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪২ বাংলা, পৃ. ৪; মুহাম্মদ করম আলী, প্রবন্ধ : কবর পূজা, *আল ইসলাহ*, ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৬৮, পৃ. ৬৩; হুমায়ুন আবদুল হাই, মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, পৃ. ৫৭; ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

করে।[৯৫] সে সময়ের অনেক পীরের মাজারকে তারা তীর্থস্থানের মত উপাসনা কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।[৯৬] মাজারে বসে তারা পীরের মূর্তির সামনে ধ্যান করে ইচ্ছাপূরণের জন্য তাঁর নিকট প্রার্থনা করত।[৯৭]

সে সময়ে পীরের মাজার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য সরকার যথেষ্ট ভূমি দান করত। 'হযরত শাহ্ মখদুম (র.)'[৯৮] -এর দরগাহ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কয়েক হাজার বিঘা জমি দান করা হয়েছিল বলে বর্ণিত আছে। যদিও বিষয়টি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়।[৯৯] অনেক পীরের মাজারে প্রতি বছর একবার 'ওরসের নামে মেলা বসত। মেলায় ভক্ত, শিষ্য, যাদুকর, বাজিকর, বীরাঙ্গনা, প্রতারক, জুয়াড়ী, চোর প্রভৃতি লোক আসর জমাত। সেখানে হিন্দুদের তীর্থস্থানের মত নাচ-গান ও জুয়াখেলার অনুষ্ঠানও চলত।[১০০]

এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, বাংলায় ইসলাম প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সূফী-দরবেশ ও পীর-মাশায়েখদের অবদান চিরস্মরণীয়। 'হযরত শাহ্জালাল (র.)[১০১]', 'হযরত খানজাহান আলী (র.)[১০২]', 'হযরত শাহ্ মখদুম (র.), 'শরফুদ্দীন তাওয়ামা (র.)[১০৩]', 'হযরত শাহ আব্দুল 'আযিয

---

৯৫. প্রবন্ধ : কবর পূজা, *আল ইসলাহ্*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩; Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslim in Bengal*, PP. 14-15.

৯৬. ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৯৭. এনামুল হক, *বংগে সূফী প্রভাব*, কলকাতা : মোহসীন এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৩০, পৃ. ১২১; ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৯৮. তাঁর প্রকৃত নাম সাইয়্যেদ আব্দুল কুদ্দুস। তিনি শাহ্ মখদুম রুপোশ নামে সমধিক পরিচিত। তিনি ৬৮৭/১২৭৯ সালে বাংলায় আগমন করেন। রাজশাহীতে তাঁর মাজার অবস্থিত। প্রতি বছর ২৭ রজব তারিখে তাঁর ইন্তিকাল উপলক্ষ্যে 'ওরস অনুষ্ঠিত হয়। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২১ খণ্ড, পৃ. ৬৬৩-৬৪; Shamsuddin Ahmad, *Inscriptions of Bengal*, Vol-IV, Rajshahi : Varandra Research Society, 1960, P. 277.

৯৯. Montogomery Martin, *The History-Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India*, Vol-III, Delhi : Cosmo Publications, Reprint, 1976, P. 645.

১০০. *Asiatic Journal*, Vol-VI, 1931, PP. 355-356.

১০১. হযরত শাহ্ জালাল (র.)-এর জন্ম ও ইন্তিকাল সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সম্ভবত তিনি ১২১১ তুরস্কের কুনিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নিষ্কলুষ চরিত্র ও অনুপম ব্যক্তিত্ব বিশ্ব কল্যাণকামী পার্থিব প্রজ্ঞার উৎস ছিল। তিনি সুদীর্ঘ কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে সোহ্রাওয়ার্দীয়া তরীকার ফায়েজ লাভ করেন। সিলেটে তাঁর মাজার শরীফ আজও অবস্থিত। দ্র. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *হজরত শাহ্জালাল (রঃ)*, ঢাকা : ইকাবা, ১৯৮৭, পৃ. ১৪৮-১৪৯; এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪-৪৬।

১০২. তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রচারক, শাসক, স্থপতি ও সূফী সাধক। তিনি খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকে বঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ তাঁরই অক্ষয় কীর্তি। হযরত

খুলনবী (র.)[১০৪] প্রমুখ মহামানবদের বাংলায় ইসলাম প্রচারের কথা জাতি যুগ যুগ ধরে মনে রাখবে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক মোহর আলী বলেন :

> বাংলার প্রথম দিকের সূফীগণ শরী'য়াতের হুকুম-আহকাম পালনে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। তাঁরা ছিলেন প্রথম শ্রেণীর 'আলিম। ইসলামী শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের জন্য তাঁরা মসজিদ ও খানকাহকে তাঁদের মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে এ সূফীবাদ এক ভিন্ন প্রকৃতির রূপ নেয়। হিন্দু 'যোগীতত্ত্ব ও তান্ত্রিকতত্ত্ব'-এর কুপ্রভাবে প্রভাবিত হয়।[১০৫]

এ সময় উপমহাদেশে অনেক নামধারী পীরের আগমন ঘটে। যাদের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত।[১০৬] এছাড়াও আরেকদল স্বার্থপর অর্থলোলুপ গোষ্ঠীর জন্ম হয়। যারা বহু পীরের মাজার ও খানকাহকে নিজেদের জীবিকার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে শুরু করে। তৎকালীন সময়ে ঢাকা শহরের পূর্বে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে একটি দরগায় কালো রঙ্গের একটি প্রস্তর রাখা ছিল যাকে বলা হত 'কদম রসূল'।[১০৭] অদ্যাবধি এ পাথরটি বিদ্যমান আছে। এ পাথর দেখিয়ে

খানজাহান আলীর মাজারে স্থাপিত শিলালিপি থেকে তাঁর ইন্তিকালের সময়কাল ২৬ জুলহাজ্জা ৮৬০ হিজরী বলে জানা যায়। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৮১-৩৮২।

১০৩. তিনি ছিলেন খ্রীস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর 'আলিম, মুহাদ্দিস, শিক্ষা সংগঠক ও কামিল সূফী। বাংলাদেশে ইসলামী উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য এবং হাদীস শিক্ষার প্রসারের জন্য মূলত তিনিই প্রথম উন্নতমানের শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলেন। শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা ঢাকার সোনারগাঁওয়ে একটি বৃহৎ ইসলামী কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পারস্যের বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। দ্র. আব্দুল করিম, *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সং, ১৯৮৭, পৃ. ২০-১৬০; মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ৩য় সং, ১৯৯২, পৃ. ৪৪২-৪৬২।

১০৪. উপমহাদেশের বিখ্যাত 'আলিম নক্শবন্দিয়া-মুজাদ্দিদীয়া তরীকার সূফী-সাধক হযরত শাহ্ আব্দুল 'আযিয খুলনবী (র.) ১২৯২ হি. সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনী থানার চাপড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শাহ্ আব্দুল লতিফ সরদার। তিনি ভারতের দিল্লী থেকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করার পর হযরত মাওলানা শাহ্ মহীউদ্দিন আব্দুল্লাহ আবুল খায়ের ফারুকী মুজাদ্দিদী (র.)-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে গুনাকরকাটী খাইরিয়া আজিজিয়া সিনিয়ার মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩৭৬ হি. এ মহান সাধক জান্নাতবাসী হন। গুনাকরকাটীতে তাঁর মাজার শরীফ আজও বিদ্যমান। দ্র. মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, সাতক্ষীরা : সূচনা প্রিন্টিং প্রেস, ২০০১, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

১০৫. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslims of Bengal*, Vol-IA & IB, Riyadh : The University Press, 1985, P. 803.

১০৬. এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯।

১০৭. 'কদম রসুল' অর্থ নবী করীম (স.)-এর পায়ের চিহ্ন।

স্থানীয় দালালরা সাধারণ জনগণের নিকট থেকে প্রচুর অর্থ আদায় করে থাকে।[১০৮] অন্যদিকে আজমীরে 'খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (র.)'[১০৯] -এর মাজারের গিলাফ সরিয়ে বেহেশতের দরজা দেখা যায় বলে দালালগণ যিয়ারতকারীদের নিকট থেকে বহু অর্থ উপার্জন করত।[১১০] বর্তমান বাংলাদেশেও এক শ্রেণীর প্রতারক বহু পীরের মাজারকে ব্যবসা কেন্দ্রে পরিণত করেছে। এ সকল প্রতারকদের কারণেই পীর সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বিরূপ মন্তব্য করে থাকে। এমনি এক ক্রান্তিলগ্নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লাখো মানুষের কাছে একজন খাঁটি পীর হিসেবে পরিচয় লাভ করলেও তিনি নিজেকে কখনও পীর বলে দাবী করেননি। তিনি তাঁর ভক্ত-মুরীদদের সব সময় বন্ধুর মর্যাদায় আসীন করতেন।[১১১] জনসাধারণের খেদমত করাই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছিলেন।

এ সময় প্রতিবছর মুহাররম মাসের প্রথম দশদিন 'মুহাররম' উৎসব চলত। প্রথম নয় দিন তারা কেবল নিরামিষ খেয়ে রোজা রাখত, আর একটি উঁচু মঞ্চ থেকে জনসভায় হযরত হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী বর্ণনা করত। দশম দিনে তারা তীর-ধনুক, পাগড়ী, তলোয়ার ও সিল্কের পোশাক দিয়ে আবৃত হযরত হুসাইন (রা.)-এর কৃত্রিম শবাধার 'তাযিয়াহ্'[১১২] বহন করে ঢাক-ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে মিছিল বের করত।[১১৩] সাধারণ মানুষ অশ্রুসিক্ত চোখে শোক প্রকাশ ও মিছিলের অনুসরণ করত। আবার কেউ কেউ 'হায় হোসেন', 'হায় হোসেন' বলে নিজের বুক ও মাথা চাপড়ে শোক প্রকাশ করত। কেউ মর্সিয়া গাইত। আবার কেউ বা অন্যের তরবারীতে আঘাত করতো। কেউ কেউ নিজের তরবারী দিয়ে

---

১০৮. হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত, *মুসলিম সংস্কার ও সাধক*, পৃ. ৪৩-৪৪।

১০৯. ইসলামী সূফীবাদের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা সুবিদিত ব্যক্তিদের অন্যতম ও উপমহাদেশে চিশ্‌তিয়া তরীকার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন খাজা ম'ঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (র.)। তিনি ৫৩৬ হি./১১৪১ খ্রীস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতে চিশ্‌তীয়া তরীকার ভিত্তি স্থাপন করেন এবং আজমীরে এ তরীকার নীতি বাস্তবায়ন করেন। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৭২৭-৭২৮।

১১০. S.M. Zwemer, *The Influence of Animism in Islam*, London : Central Board of Mission, 1920, PP. 214-215.

১১১. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ৪৭।

১১২. তাযিয়াহ : হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর দৌহিত্র হযরত হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে উৎসবের আয়োজন করা হত। উক্ত উৎসবে হযরত হুসাইন (রা.)-এর সমাধির প্রতীকস্বরূপ যে তাঁবু নির্মিত হয় তাকে তাযিয়াহ বলা হয়। দ্র. ড. আজিজুর রহমান মল্লিক, *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*, পৃ. ৮।

১১৩. ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

নিজের শরীরে আঘাত করে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলত। মিছিল শেষে তাযিয়াহ্ শহরের বাইরে কবরস্তানে মাটিতে পুঁতে রাখত।[১১৪] আবার মূল্যবান তাযিয়াহগুলো মসজিদে ফিরিয়ে আনা হত।[১১৫] রাতের বেলায় হযরত হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারীদের প্রতিমূর্তি তৈরী করে তীর-বর্ষা নিক্ষেপ করার পর সেগুলো পুড়িয়ে ফেলা হত।[১১৬] এ মাসে অনেক মুসলমান হযরত হাসান-হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাত উপলক্ষ্যে খিচুড়ী, শরবত, হালুয়া, রুটি ইত্যাদি তৈরী করে লোকজনের আপ্যায়ন করত।[১১৭] এ তাযিয়াহ্ সংস্কৃতি সর্বপ্রথম আমীর তৈমুর (৮০৮ হি./১৪০৫ খ্রী.) প্রচলন করেন বলে অনুমান করা হয়।[১১৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সময়ও বাংলার অনুন্নত মুসলিম সমাজে ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুহাররম উৎসবের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান মুসলিম সমাজে মুহাররম উৎসবের প্রচলন থাকলেও এর মধ্যকার ইসলামবিরোধী কার্যকলাপ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সুদীর্ঘ ৯২ বছরের জীবনের প্রায় ৭০টি বছর (১৮৭৩-১৯৪৭ খ্রী.) ইংরেজ শাসনামলে অতিবাহিত হয়। ব্রিটিশ বেনিয়ারা ছিল ইসলাম বিদ্বেষী। তারা ইসলামী ভাবধারায় উজ্জীবিত মুসলমানদের সব সময় শত্রু বলে মনে করত। কারণ তারা জানত ইসলামের সঠিক আদর্শে মুসলমানরা গড়ে উঠলে তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে।[১১৯] স্বার্থবাদী হিন্দু সম্প্রদায়ও ইংরেজ শাসকদের হাতে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে ধ্বংস করার হীন ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে।

সে সময় মুসলমানদের গরু কুরবানী ছিল হিন্দুদের কাছে মহাপাপ। কেউ কুরবানীর জন্য গরু জবাই করলে তার উপর নির্যাতন চালানো হত। এমনকি তার বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দেয়া হত।[১২০] এ ছাড়া আযানে বাধা প্রদান, নামাযরত অবস্থায় মুসল্লীদের উপর অত্যাচার, মসজিদের

---

১১৪. M. R. S Meer Hanan Ali, *Observations of the Musalmans of India*, P. 32.

১১৫. Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 10.

১১৬. Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol-1, PP. 278-279.

১১৭. প্রবন্ধ : মুহাম্মদ ইউনুস আলী, *মহরম*, মোসলেম দর্পণ, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯২৫, পৃ. ১।

১১৮. John Norman Hokiston, *The Shia of India*, London : Lozac and Co, 1979, P. 166.

১১৯. সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস ও উপনিবেশিক কাঠামো*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪, পৃ. ২৮০; শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪।

১২০. ড. ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬; ইয়াসমিন আহমেদ, *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩-৪।

সম্মুখ দিয়ে বাদ্যযন্ত্রসহ শোভাযাত্রা প্রভৃতি ছিল হিন্দু কংগ্রেসীদের নিকট সাধারণ ব্যাপার।

এমন অনেক ঘটনা পীরপুর রিপোর্ট, শরীফ রিপোর্ট এবং এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের বিবৃতিতে বিধৃত হয়েছে।[১২১] ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর কংগ্রেসের মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করলে মুসলমানরা কায়েদ-ই-আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুমতিক্রমে উক্ত দিবসকে 'নাযাত দিবস' হিসেবে পালন করে। অত্যাচারীর শাসনের অবসান হয়েছে বলে শান্তির নিঃশ্বাস নেয়।[১২২] এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, কংগ্রেস মুসলমানদের উপর কী নির্মম অত্যাচার করেছিল।

তৎকালীন সময় বহু অনৈসলামিক প্রথা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। দেব-দেবী পূজা,[১২৩] সাধু-সন্ন্যাসী পূজা,[১২৪] খাজা-খিযিরে বিশ্বাস,[১২৫] জ্যোতিষীদের প্রতি বিশ্বাস,[১২৬] শ্রেণী বৈষম্য[১২৭] প্রভৃতি কুসংস্কার সে সময় মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করায় তারা প্রকৃত ইসলাম থেকে ছিটকে পড়েছিল। মুসলমানদের এমনি এক দুর্যোগময় সময় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শুভাগমন ঘটলেও প্রকৃত ধর্মবোধ ও আধুনিকতার এক সুন্দর মিথস্ক্রিয়া দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর মোহনীয় ব্যক্তিত্ব। ধর্মের ঐতিহ্য আর আধুনিকতার গতিময়তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে তৎকালীন মুসলিম সমাজের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় করে তুলেছিল।

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

মুসলিম শাসনামলে ভারত উপমহাদেশীয় মুসলমানগণ শিক্ষা-দীক্ষায় চরম উন্নতি লাভ করেছিল। তাঁরা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গ বলে মনে করত। প্রত্যেক মসজিদে, হুজরায়, খানকাহ্, 'আলিম ও

---

১২১. আব্বাস আলী খান, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, পৃ. ৩৮৯-৩৯১; হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, পৃ. ৩২।

১২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

১২৩. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭; ড. ওয়াকিল আহমদ, *উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১২৪. *Asiatic Journal*, Vol-VI, P. 355; Azizur Rahman Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 12.

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩২; Muhammad Abdur Rahim, *Social and Cultural History of Bengal*, Vol-1, PP. 279-280; হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কার ও সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

১২৬. ড. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; আব্দুল করিম, *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন*, ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯, পৃ. ৮-১৮; প্রবন্ধ : সমাজ চিত্র, *মোসলেম দর্পণ*, পৃ. ১৩৪-১৩৫।

অর্থসম্পন্ন মুসলমানদের বাড়ীতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল।[১২৮] বিশেষ করে মুঘল আমলে শিক্ষা-সংস্কৃতির যথেষ্ট উন্নতি হয়। আওরঙ্গজেবের রচিত 'ফতোয়া-ই-আলমগীরী' ও আবুল ফজল রচিত 'আইন-ই-আকবরী' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।[১২৯] জেনারেল শ্রীম্যান ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের শিক্ষার প্রশংসা করে বলেন :

> ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হয়েছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সেরূপ হয়েছে। আমাদের দেশের যুবকগণ ব্যাকরণ, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদির যে সকল বিষয় গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে, সেগুলো তারা আরবী ও ফার্সী ভাষায় শিক্ষা করে। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যুবকগণ যে জ্ঞান নিয়ে বের হয়ে আসে, ভারত উপমহাদেশের যুবকগণ সাত বছরে সে জ্ঞান আহরণ করে মাথায় পাগড়ী পরিধান করে। সে অনর্গল সক্রেটিস, এ্যারিস্টোটল, প্লেটো, হিপোক্রেটিস, গ্যালেন ও ইবনে সিনা সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে।[১৩০]

পলাশী যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলার পরাজয়ের পর থেকে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর ফলে শিক্ষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অধঃপতন শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী এদেশবাসীর শিক্ষাপদ্ধতিতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু Charles Grant-এর পরামর্শক্রমে এদেশবাসীদের ইংরেজী শিক্ষিত করার চিন্তা ভাবনা শুরু হয়।[১৩১] ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে 'উইলিয়াম কেরী'র কলকাতা আগমন এবং শ্রীরামপুরে খ্রীস্টান মিশন স্থাপনের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজী শিক্ষার সূচনা ঘটে।[১৩২] ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দে চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার প্রদানের ঘোষণা[১৩৩] এবং

---

১২৮. মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা, *উপমহাদেশীয় উলামায়ে কিরামের গৌরবময় অতীত*, ঢাকা : ইফাবা, ১৯৮৯, পৃ. ২৬; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮; Dr. Hans Raj, *History of the Modern India*, Delhi : Surjeet Publications, 1993, P. 110.

১২৯. শ্রী অতুল চন্দ্র রায়, *ভারত বর্ষের ইতিহাস*, পৃ. ৪৪৮; বিপীন চন্দ্র, *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা*, কলকাতা : কেপি বাগচী এ্যান্ড কোং, ১৯৮৯, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

১৩০. ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩।

১৩১. A.K.M. Yaqub Ali, *Oriental and Western Education in Bogra District : From the Second half of 19th century of mid 20th century A.D.*, Unpublished U.G.C. Research Project, 1946, P. 7.

১৩২. J.A. Richter, A History of Missions in India, London : Central Board of Mission, 1908, P. 183.

১৩৩. আব্দুল মওদুদ, *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ*, সংস্কৃতির রূপান্তর, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৯৪-৯৫।

ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজী রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করার ফলে বাংলা তথা ভারতের মুসলমানগণ শিক্ষাসহ রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে।

ইংরেজ সরকারকর্তৃক প্রবর্তিত লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ আইন মুসলমানদের ভাগ্য একেবারে উলটপালট করে দেয়। এ আইন মুসলমানদের শিক্ষা ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত স্বরূপ ছিল। মক্তব, মাদরাসা, খানকাহ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারী ও বেসরকারী সাহায্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। এগুলোর জন্য ছিল করমুক্ত জমির ব্যবস্থা। করমুক্ত জমি বাজেয়াপ্ত করায় বিত্তহীন মুসলমানদের পক্ষে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।[১৩৪] 'খন্দকার ফজলে রাব্বী' মুসলিম আমলের ২১ প্রকারের করমুক্ত জমির বর্ণনা দিয়েছেন। এর মধ্যে ১৪ প্রকার ছিল শুধু মুসলমানদের। হিন্দুদের জন্য ছিল ৫ প্রকারের এবং ২ প্রকারের ছিল উভয় সম্প্রদায়ের জন্য।[১৩৫]

এ উপমহাদেশে মুসলমানদের বিজয়ের সাথে আরবী-ফার্সী ভাষার একটি সংযোগ ছিল, তাই মুসলমানরা আরবী-ফার্সী ভাষা শিক্ষা করাকে গৌরবের বলে মনে করত।[১৩৬] মুসলমানরা ইংরেজী ভাষার বিরোধিতা করত তা নয়, তবে ইংরেজগণ যেভাবে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারতাকে গড়ে তোলার জন্য আরবী ফার্সীকে বাদ দিয়ে যে নীতি ইংরেজীকে সর্বসাধারণের ভাষা করে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, বিদগ্ধ মুসলমানগণ সে নীতিকে মেনে নেননি। তাই ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্ব বাধে। তাই দেখা যায়, ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্য জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল খুবই অনগ্রসর।[১৩৭]

মুসলমানগণ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য আদৌ অংশগ্রহণ করেনি।[১৩৮] ফলে তারা নতুন পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার অর্থনৈতিক ব্যাপারটাও হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। আর ঐ একই কারণে ইংরেজদের সাথে মেলামেশার সুযোগও তাদের ঘটেনি। ইংরেজী শিক্ষার গরজও তাদের মনে জাগেনি; এ শিক্ষার দ্বারা যে লাভবান হওয়া যায়, সে চেতনাও তাদের মাঝে জাগতে পারেনি।

---

১৩৪. ড. মুহাম্মদ আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

১৩৫. *Adam's report on vernaevlar education in Bengal and Behar*, Calcutta, 1886, P. 67; খন্দকার ফজলে রাব্বী, *বাংলার মুসলমান*, অনুবাদ : মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ৬৭।

১৩৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৮, পৃ. ২।

১৩৭. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯, পৃ. ৪৪৭।

১৩৮. N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal*, Vol-1, Calcutta, 1956, P. 93.

বরং রাজনৈতিক ক্ষমতা যখন চলে গেছে, অর্থনৈতিক অবস্থা যখন শোচনীয় তখন ধর্ম এবং ধর্মভিত্তিক সমাজকে খ্রীস্টানদের ছোঁয়া থেকে, ইংরেজঘেঁষা হিন্দুদের প্রভাব থেকে রক্ষা করার প্রবল তাড়না তাদের মধ্যে তৈরী হয়েছিল।[১৩৯] তাদের আশংকা হয়েছিল, ফার্সী ভাষা ত্যাগ করলে তারা স্বাধীন মনোবৃত্তি হারিয়ে দাস মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়বে।[১৪০] তাছাড়া পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করাকে বিজিত মুসলমান সম্প্রদায় ইংরেজদের নিকট আত্মসমর্পণের শামিল মনে করে ইংরেজী শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।[১৪১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ এবং বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী মুসলমান সমাজ বিশেষ একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হচ্ছিল এবং সে প্রক্রিয়াটি ছিল কখনও খুব ধীর এবং কখনও খুব দ্রুত। এ সময় বাঙালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একাংশ চেয়েছিল ইসলামী আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করতে, অন্যদিকে বৃহত্তর একটি অংশ ঝুঁকে পড়েছিল আধুনিক শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আদর্শের প্রতি।[১৪২] ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে মুসলমানরা কতকটা বাধ্য হয়েই ধীরে ধীরে ইংরেজী শিক্ষায় মনোনিবেশ করে।[১৪৩] এমনি এক প্রেক্ষাপটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন এদেশের মুসলমান সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আরবী-ফার্সীতে লেখাপড়া করত। এক ধরনের স্বজাত্য অভিমান থেকেই তারা এটা করত।[১৪৪] কিন্তু শিক্ষানুরাগী আহ্ছানউল্লা বুঝেছিলেন, যুগের চাহিদা ও বাস্তবতাকে অস্বীকার করা বোকামী। তাই তিনি আরবী-ফার্সীর পাশাপাশি ইংরেজী পড়েছিলেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তে লাভবান হল বাঙালী মুসলমান সমাজ। শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কোন জাতপাত মানেননি। কারণ তিনি জানতেন, শিক্ষার সঙ্গে একটি জাতির জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নটি জড়িত। সেজন্য তিনি নিদারুণ কষ্ট সহ্য করে হিন্দুর বাড়িতে থেকে, মিশনারী স্কুলে পড়ে শিক্ষালাভ করতেও কুণ্ঠিত হননি। আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না, সেদিন মুসলমান ছাত্রদের কিভাবে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হয়েছে। তাদের জন্য শিক্ষার সুযোগ যেমন ছিল না তেমনি ছিল না

---

১৩৯. কাজী আব্দুল মান্নান, *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*, ঢাকা : নিউ পুবালী মুদ্রায়ণ, ১৯৯০, পৃ. ৮৬।

১৪০. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০, পৃ. ৫৫।

১৪১. Dr. Azizul Haque, *History and Problems of Muslim Education in Bengal*, Calcutta : Thacker Spink Co, 1917, P. 20.

১৪২. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৯, পৃ. ৪০।

১৪৩. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২।

১৪৪. প্রবন্ধ : যে আলো আলোর অধিক, *আল-আহ্ছান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

কোন আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা।[১৪৫] তবুও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর সীমিত সামর্থের ভেতরে থেকেও বাঙালী মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সর্বোচ্চ কল্যাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম চিন্তাবিদগণের অনেকেই উপলব্ধি করেন ইংরেজ শাসন তাঁদের মেনে নিতে হবে এবং পার্থিব উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শাসক ইংরেজ ও বিজিত মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরীতা দূর করে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য বাংলায় নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩ খ্রী.), সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান (১৮১৭-১৮৯৩)[১৪৬] প্রমুখ মনীষীগণ সভা-সমিতি স্থাপন ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[১৪৭] স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের ভাবতে শেখান যে, তাদেরও ইংরেজী শিখতে হবে। কারণ ইংরেজী তাদের পাশ্চাত্য ভাবধারা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে সহায়ক হবে। শুধু তাই নয়, বরং ইসলাম ধর্মকেও পাশ্চাত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজন আছে।[১৪৮]

সৈয়দ আহমদের শিক্ষা আন্দোলন তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' প্রতিভাবান ও আদর্শবাদী মুসলিম তরুণ ও যুবকদের গভীরভাবে আকর্ষণ করে। নিপীড়িত জাতি নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন সে পরিবেশ, সে প্রেরণায় গড়ে ওঠে। সাবেক বাংলার অনেক তরুণের মত তিনিও তাঁর উৎসাহী সমর্থক ও অংশীদার ছিলেন। মুসলিম শিক্ষা আন্দোলন পরবর্তীয় পর্যায়ে মুসলিম জাতির রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্খা পূরণের আন্দোলনে পুরোপুরিভাবে রূপান্তরিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজনৈতিক

---

১৪৫. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্য সেবী ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

১৪৬. সৈয়দ আহমদ খাঁন ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর তাকী। তিনি একজন গবেষণাপ্রিয় লেখক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের উপর যে সব বিপদ নেমে আসে তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে তা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। তিনি আলীগড় আন্দোলনের প্রথম সারির পতাকাবাহী ছিলেন। শিক্ষা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী খেদমত করে তিনি ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২০১-২০৫।

১৪৭. K.K. Aziz, *Ameer Ali : his Life and Work*, P. 102.

১৪৮. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) : স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

আন্দোলনে না আসলেও শিক্ষা আন্দোলনের গভীর প্রভাব তাঁর উপর অক্ষুণ্ন থেকে যায়।[১৪৯]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যখন শিক্ষা বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তখন হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদের উপর খবরদারী করে অবিভক্ত ভারতে মুরুব্বীদের ভূমিকায় অবস্থিত। হিন্দু জমিদার তথা উচ্চ শ্রেণীর দাবীদার হিন্দু প্রভুপতিরা মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা অর্জনকে রুখে দাঁড়িয়েছিল।[১৫০] তখন তাদের সঙ্গে সুকৌশলে কলমযুদ্ধের মাধ্যমে সারা ভারতে তিনি মুসলিম শিক্ষার অসামান্য অগ্রগতি বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন। বঙ্গ বিভাগের স্মরণীয় বছর ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে প্রশাসনিক কলমের একটি আঁচড়ের আঘাতে বিরাট নাড়া খেয়ে মুসলমান সম্প্রদায় তাঁদের পূর্ণ সম্বিত ফিরে পায়। প্রদেশ বিভাগের প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ ফলস্বরূপ মুসলমানদের ভেতরে প্রচুর পরিমাণে শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। মুসলমানগণ এ সময়ে অধিক সংখ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে শুরু করে। নীচের সারণীতে বক্ররেখার মাধ্যমে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত মুসলিম শিক্ষার অগ্রগতি প্রদর্শিত হল :[১৫১]

সারণী-০২

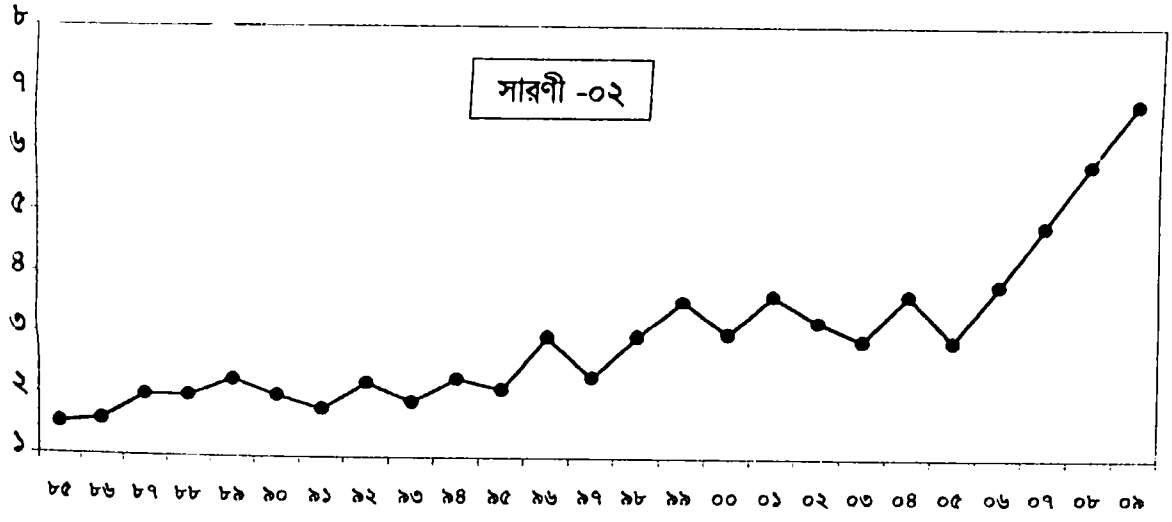

১৪৯. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১৫০. মেজর ডা. খান মুহাম্মদ শামছুদ্দীন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), কিছু কথা কিছু স্মৃতি, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২০বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭, পৃ. ৪।

১৫১. মোহাম্মদ আজিজুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫।

সারণী ০২-এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় মুসলিম ছাত্রের সাফল্যের চিত্ররেখা প্রদর্শিত হয়েছে। এ রেখা থেকে সমগ্র অবস্থার পরিমাপ করা যাবে। রেখাটি যদিও বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গের পর থেকে দ্রুত ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে, মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন সমগ্র জনসংখ্যার সাথে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তীর্ণ মোট ছাত্র সংখ্যার সাথে সমানুপাতিকভাবে সাধিত হয়নি।

ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে এদেশের সনাতন সাহিত্যকীর্তি 'কাব্য-সাহিত্যে'র মধ্যেও পাশ্চাত্য প্রভাব সংযোজিত হয়।[১৫২] ১৮০০ থেকে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৪), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মধুসুধন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) প্রমুখ সাহিত্যিকদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নানা শাখায় গদ্যরীতি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত কাব্যধারা যখন পূর্ণ বিবর্তিত, তখনই বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের এই যে অর্ধ শতাব্দীরও অধিককালের বিলম্বিত প্রবেশ, এটাই আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানের স্বল্পতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী।[১৫৩] মুসলিম ঐতিহ্যবাহী সাহিত্য প্রচারের চেষ্টা অবশ্য সে সময় অপরাপর লেখকগণও করেছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবপুষ্ট অন্যান্য রচনার সাথে প্রতিযোগিতা করে তাঁদের রচনা জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি।

মুসলিম শাসনামলে বাংলায় বিদ্যমান শিক্ষা ব্যবস্থা তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে উপযোগী ছিল। কিন্তু বৈদিক ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পুনঃপ্রতিষ্ঠাকারী হিন্দু রাজারা সংস্কৃতি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।[১৫৪] তাছাড়া বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজের কবি-সাহিত্যিকরা পূর্ব থেকেই হিন্দু রেনেসাঁ আন্দোলনের জালে ধরা পড়েছিল। ফলে হিন্দু লেখকদের পাশাপাশি অনেক মুসলিম লেখক তাদের কবিতা ও সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু ভাবাদর্শ ফুটিয়ে তুলেছিলেন। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তারা হিন্দু লেখকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা আরবী-ফার্সী ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করার কারণে নিজেদেরকেও খুবই গৌরবান্বিত বলে মনে করত।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে মুসলমানদের সাহিত্য জীবনে ছিল এক ক্রান্তিকাল। এ সময় কয়েকজন মনীষীর সাহিত্য সৃষ্টি মুসলমানদের মন-মানসিকতা বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৮-১৯২৪), কবি কায়কোবাদ (১৮৫৮-

---

১৫২. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩।

১৫৩. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৬৮, পৃ. ৩৩১।

১৫৪. T.C. Das Gupta, *Aspects of Bengali Society*, Calcutta : University of Calcutta, 1935, P. 166.

১৯৫২), শেখ আব্দুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০), আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩) প্রমুখের লেখা পড়ে মুসলমানদের মধ্যে নতুন করে জাগরণের সাড়া পড়ে যায়।[১৫৫]

মুসলিম ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে 'সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজীর (১৮৮০-১৯৩১)'[১৫৬] নেতৃত্বে একটি নতুন সাহিত্য প্রচেষ্টা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এদেরকে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের মুসলিম পথিকৃৎ' বলে আখ্যায়িত করা যায়।[১৫৭] এদের মধ্যে মুহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৫-১৯৩৮)[১৫৮], মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী (১৮৯৬-১৯৫৪)[১৫৯], কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)[১৬০], বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)[১৬১], গোলাম মোস্তফা

---

১৫৫. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

১৫৬. তিনি পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মভূমির নামানুসারে তিনি সিরাজী নামে পরিচিত হয়েছেন। তিনি ছোট-বড় ২২টি কাব্য, গীতিকাব্য, উপন্যাস, নীতিকথা, গান, গজল প্রভৃতি পুস্তক লিখেছেন। আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি পারদর্শী ছিলেন। সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২০১-২০২।

১৫৭. মুহাম্মদ এনামুল হক, *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩১।

১৫৮. বাংলা ভাষায় ইসলামী ভাবধারার প্রখ্যাত সাহিত্যিক মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী চৌধুরী ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ জীবন থেকেই তিনি সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের স্থায়িত্ব ছিল (১৯০১-১৯১৭) ১৬ বছর। ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক আদর্শকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলাই ছিল তাঁর সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য। তিনি ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আব্দুল কাদির সম্পাদিত, ইয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৩৭০ বাংলা, পৃ. ১-৭৫; আব্দুল গফুর, প্রবন্ধ : সাধক সাহিত্যিক ইয়াকুব আলী চৌধুরী, *মাসিক পূর্বাচল*, মাঘ ১৩৮৪ বাংলা, পৃ. ৩৭-৪৯।

১৫৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সাতক্ষীরা জেলার সদর থানার বাঁশদহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে মরুভাস্কর, শাহনামা, মহামানব মহসীন, সিন্দাবাদ-হিন্দবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন। দ্র. মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

১৬০. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলা সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা উপন্যাসিক এবং কথাশিল্পী কাজী ইমদাদুল হক ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে জেলার গদাইপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চাকরি জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত করেন। চাকরি ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি 'খানবাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উপর সাহিত্য রচনা করেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৯০; মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, ঢাকা : রতন পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৮১, পৃ. ১২২-১২৯।

১৬১. নারীমুক্তির অগ্রদূত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক, প্রবন্ধকার ও সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি নারী শিক্ষার জন্য স্বামীর নামে ১৯১১

(১৮৯৭-১৯৬৪)[১৬২] প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর পূর্ববর্তী যুগে অনেক মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আরও আন্তরিক হয়ে ওঠেন। তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন অন্যতম। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী যুগে তিনি একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক ছিলেন। ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্র।[১৬৩] ইসলামী সাহিত্যে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আর 'সংস্কৃতি'[১৬৪] জাতির মুখপত্র। সংস্কৃতি জাতির নিদর্শন, আর এ নিদর্শনের বলেই জাতি পরিচয় লাভ করে বিশ্বের দরবারে। যে জাতির সংস্কৃতি যত উন্নত, বিশ্ব দরবারে সে জাতির সম্মান ও আসন তত দৃঢ়। দুনিয়ার সব জাতিরই নিজস্ব সংস্কৃতি আছে। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। তাঁদের সংস্কৃতি শত শত বছরের পুরোনো–ইসলামের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি।[১৬৫] এ সংস্কৃতিতে ছিল ইসলামের আদর্শ, শিক্ষা-দীক্ষা, তাহযীব-তামাদ্দুন।

খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আজীবন বিরামহীনভাবে সমাজসেবা করে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। দ্র. মুহাম্মদ শামছুল আলম, *রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃ. ১০৩-১৩৮; ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৩৮-১৪০।

১৬২. বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক গোলাম মোস্তফা যশোর জেলার মনোহরপুর গ্রামে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পাকিস্তান আমলে পূর্ববাংলা ভাষা কমিটির সচিবরূপে দায়িত্ব পালন করেন। স্বজাতি, স্বধর্মের প্রতি ভালোবাসাই ছিল তাঁর কাব্য ভাবনার প্রধান উৎস। তাঁর প্রধান অবদান 'বিশ্বনবী' (১৯৪২) বহুল সমাদৃত একখানা গ্রন্থ। তিনি ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. বন্দে আলী মিয়া, *কবি গোলাম মোস্তফা*, ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় সং, ১৯৭৫, পৃ. ১-৪৮; ড. মুহাম্মদ এনামুলক হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ১০ম খণ্ড, পৃ. ৬০৯-৬১০।

১৬৩. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ৪র্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫।

১৬৪. 'সংস্কৃতি' শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ Culture। একে আরবী ভাষায় তামাদ্দুন বলা হয়। কালচার হল, মানুষের নিবিড় সত্তার সারভাগ, সমাজের জীবনধারা, আচার-আচরণ। কোন গোষ্ঠী বা জাতির রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, দর্শন ও ভাষাকে সে জাতির সংস্কৃতি বলা হয়। দ্র. আনোয়ারুল ইসলাম, *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭, পৃ. ২৮৮; ড. হাসান জামান, *সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তর*, ঢাকা : মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৭৪, পৃ. ৪১; ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯; শ্রী সুনিত কুমার চট্টোপাধ্যায়, *সংস্কৃতি শিক্ষা ইতিহাস*, কলকাতা : জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, ১৯৭৬, পৃ. ৭।

১৬৫. অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ও নাজির উদ্দীন আহমদ, *আখলাকে ইসলামী*, ঢাকা : পুস্তক ঘর, ৯ম সং, ১৯৯১, পৃ. ৯৭।

মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন ছিল গৌরবময় অতীতে ভরা। কিন্তু এ উপমহাদেশে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় দীর্ঘ সময় ধরে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে সংস্কৃতির পারস্পরিক আদান-প্রদান ঘটে। বিশেষ করে হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। আর এটা পুরো বিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১৬৬] এ সময়ে হিন্দু জমিদার ও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুসলমানদের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধ্বংস করে দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের প্রচেষ্টায় মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা কেন্দ্রগুলো ধ্বংস হতে শুরু করে।[১৬৭] মুসলিম সংস্কৃতির এমনি এক ক্রান্তিকালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর ৯২ বছরের সুদীর্ঘ জীবনকে ইসলামী আদর্শ ও তাহযীব-তামাদ্দুনের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন।

তাফসীর চর্চা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে 'তাফসীর'[১৬৮] সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান অনস্বীকার্য। 'শাহ্ আব্দুল কাদের'[১৬৯] ভারত উপমহাদেশে সর্বপ্রথম উর্দুতে কুর'আনের তরজমা

---

১৬৬. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, *বাংলাদেশের মুসলমানরা মাজলুম ও মাহ্রুম*, ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ৬; রজনী কান্ত গুপ্ত, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, কলকাতা : নবরত্ন প্রকাশনী, ১৩৮৮ বাংলা, পৃ. ১৫০-১৫১।

১৬৭. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬; Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal*, Dacca : Oxford University Press Bangladesh, 1974, P. 7; শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩য় খণ্ড, কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৮১, পৃ. ১১৪।

১৬৮. 'তাফসীর'-এর আভিধানিক অর্থ বর্ণনা করা, উন্মোচন করা এবং বোধগম্যরূপে প্রকাশ করা। এটি বিশদ ব্যাখ্যা অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে অথবা কোন লিখনীর অর্থকে বা উদ্দেশ্যকে পাঠকের বোধগম্য করে দেয়া। পরিভাষায় তাফসীর এমন একটি নিয়ম-পদ্ধতির নাম, যার মাধ্যমে আল্লাহর বাণীর অর্থ তথা আদেশ-নিষেধ এবং হালাল- হারাম প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা যায়। দ্র. আব্দুস সামাদ ছারিম আল আযহারী, *তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ : ড. আবদুল ওয়াহিদ, ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০২, পৃ. ১-২; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *মুকাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*, রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০১; পৃ. ১-৩; আল যারকাশী, *আল বুরহান ফি 'উলূমিল কুরআন*, ২য় খণ্ড, কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী, তা বি, পৃ. ১৬৪; আল যুবায়দী, *তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামুস*, ৩য় খণ্ড, মিসর : দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ১৩০৬ হি., পৃ. ৪৭০।

১৬৯. শাহ্ আব্দুল কাদের ছিলেন হযরত শাহ্ ওয়ালিউল্লাহর তৃতীয় পুত্র। তিনি ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উচ্চশিক্ষার অধিকারী এবং একজন বিখ্যাত ও বিচক্ষণ 'আলিম ছিলেন। তিনি ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫-৪৬।

করেন। 'নওয়াব কুতুবুদ্দীন খান দেহলবী'[১৭০] সে সময় 'জামি'উত তাফসীর' নামে উর্দু ভাষায় একটি তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। বস্তুতঃ তাঁর জীবনকালের সময়টা ছিল তাফসীর অভিজ্ঞানের আধুনিক যুগ। এটি ছিল হিজরী চতুর্দশ শতাব্দী। এ শতাব্দীতে বস্তুবাদ ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব সারা দুনিয়ায় বিস্তার লাভ করে। মানবরচিত মতবাদ তথা পুঁজিবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদের আগ্রাসী তৎপরতা মুসলিম জাহানে অনুপ্রবেশের ফলে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্র এর দ্বারা প্রভাবিত হয়। এতে ধর্মীয় চিন্তাধারার ক্রমোন্নতি হ্রাস পেতে থাকে। মুসলমানরাও ধর্মীয় সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ইসলামের শাশ্বত বিধান ও অনুপম আদর্শ থেকে তারা বহুদূরে অবস্থান নেয় এবং ইসলামের বিপ্লবী চেতনার শ্লোগান স্তিমিত হতে থাকে।

তৎকালীন সময়ে আধুনিকতার নামে ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। একশ্রেণীর মুসলিম নামধারী নেতারা ধর্মীয় উদারতার নামে ধর্মহীনতার তলপিবাহক সেজে বসে। মুসলমানরা খিলাফতহারা হয়ে মানবরচিত মতবাদের পেছনে ছুটতে থাকে। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতিকে তারা প্রগতির অন্তরায় হিসেবে অভিহিত করে। মুসলিম জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে 'আলিমগণ জাহিলিয়াতের এ সর্বগ্রাসী হামলা থেকে ইসলামকে রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের প্রচেষ্টায় ধর্মহীনতার বিরুদ্ধে শুরু হয় দুর্বার আন্দোলন। তাঁরা আন্দোলনের সাথে সাথে ক্ষুরধার লিখনীর মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে থাকেন। শুরু হয় ইসলামী জাগরণ। এ সময় মুসলিম জাহানের বিভিন্ন দেশের ন্যায় ভারত উপমহাদেশেও 'আলিমগণ আল কুর'আন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আল কুর'আনের তাফসীর রচনায় প্রবৃত্ত হন।

সে সময় কুর'আনের তাফসীর রচনায় 'আলিমগণ কর্তৃক অনুসৃত যে সব দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় তা হলো :

১. ধর্মতাত্ত্বিক বর্ণনাভঙ্গি, ২. আছার, ৩. বিজ্ঞান, ৪. সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, ৫. সাহিত্য-দর্শন, ৬. ভ্রান্ত-চিন্তাধারা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে ভারতীয় উপমহাদেশের যে সকল মুফাসসিরগণ তাফসীর সাহিত্যে অবিস্মরণীয় অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁরা হলেন :

---

১৭০. তিনি শাহ্ আব্দুল আযিয দেহলবী ও শাহ ইসহাকের শিষ্য ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাস্সির ও মুহাদ্দিস। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কামালিয়াতে তিনি ছিলেন পরিপূর্ণ। তিনি সম্ভবত ১২৬৫ হিজরীতে ইন্তি কাল করেন। দ্র. আবদুস সামাদ ছারিম আল আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

'মাওলানা আব্দুল হক'[১৭১]– তাঁর তাফসীর গ্রন্থের নাম 'ফাতহুল মান্না'। তিনি উর্দু ভাষায় এটা প্রণয়ন করেন। যা পরবর্তীতে 'তাফসীরে হক্কানী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি ৮ খণ্ডে সমাপ্ত। এ তাফসীরখানা লেখকের গভীর জ্ঞানের সাক্ষ্য বহন করে।

'মাওলানা মাহ্মুদ হাসান'[১৭২]– তিনি অনেকগুলো তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উর্দু ভাষায় কৃত কুরআনের অনুবাদ বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃত হয়েছে। তিনি কয়েকটি পারার অনুবাদও করেছিলেন।

'মাওলানা আশরাফ আলী থানবী'[১৭৩]– তিনি ছিলেন তাঁর সমসাময়িককালের একজন বিখ্যাত 'আলিম। তিনি তাঁর সময়ের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানকল্পে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাফসীর শাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থ হল 'বয়ানুল কুরআন'। এটি ১২টি খণ্ডে বিভক্ত। যা মুসলিম উম্মাহর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ।

এছাড়াও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে এ উপমহাদেশে অসংখ্য 'ওলামায়ে কিরাম'[১৭৪] বহু তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন। যা সমসাময়িককালে মুসলিম জাতিকে ইসলামী আদর্শে জীবন পরিচালনা করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে। এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, কিয়ামত পর্যন্ত এ সকল তাফসীর গ্রন্থ হিদায়াতের আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।

---

১৭১. মাওলানা আব্দুল হক তৎকালীন সময়ের একজন বিখ্যাত মুফাস্সির ছিলেন। তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক কোন তথ্য জানা যায়নি। তিনি ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আবদুস সামাদ ছারিম আল আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

১৭২. তিনি দারুল 'উলুম দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'শায়খুল হিন্দ'। তিনি মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানুতুবীর ছাত্র ছিলেন। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে এ মনীষী ইন্তিকাল করেন। দ্র. আবদুস সামাদ ছারিম আল আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

১৭৩. আশরাফ আলী থানবী থানাবুন জেলার মুজাফফর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'শায়খুল হিন্দু মাহ্মুদ হাসান'-এর ছাত্র ছিলেন। তিনি প্রায় ছয়শ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। দ্রঃ *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪২৭-৪২৯।

১৭৪. সে সময়ের 'ওলামায়ে কিরামের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় হলেন– ১. মাওলানা আহমদ আলী, ২. খাজা আব্দুল হাই, ৩. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ৪. মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী, ৫. মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, ৬. মাওলানা সানাউল্লাহ, ৭. মৌলভী আশিক ইলাহী বুলন্দশহরী। দ্র. আবদুস সামাদ ছারিম আল আযহারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৮।

হাদীস চর্চা

কুর'আন মাজীদের পর সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মর্যাদাপূর্ণ, তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান হচ্ছে 'হাদীস'[১৭৫]। রাসূল (স.)-এর যুগ থেকে অদ্যাবধি হাদীস-এর জ্ঞান বিকাশে অসংখ্য 'ওলামায়ে কিরাম নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। আজও এ ধারা অব্যাহত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমকালীন সময়েও হাদীসের জ্ঞান বিকাশের এ ধারা থেমে থাকেনি। সে সময়ের অসংখ্য জ্ঞানী ব্যক্তি ও বিশেষজ্ঞগণ হাদীসকে কেন্দ্র করে বহু বিষয়ের উদ্ভাবন করেছেন। তৎকালীন সময়ে যে সকল মহান ব্যক্তিত্ব হাদীস শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে নিজেদের আত্মনিয়োগ করে জ্ঞানাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে শায়খুলহিন্দ মাওলানা মাহ্মুদ হাসান, শায়খ খলীল আহমদ সাহারানপুরী,[১৭৬] মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, মাওলানা সৈয়দ আন্ওয়ার শাহ কাশ্মীরি,[১৭৭] মাওলানা শিব্বীর আহমদ ওসমানী,[১৭৮] মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী[১৭৯] প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

---

১৭৫. 'হাদীস' শব্দের আভিধানিক অর্থ কথা, বাণী ইত্যাদি। হাদীস শাস্ত্রবিদগণের মতে, নবী করীম (স.)-এর বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতি, অনুরূপ সাহাবীগণের বাণী, কর্ম ও মৌণ সম্মতি এবং তাবে'ঈগণের বাণী, কর্ম ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়। দ্র. আল-কাওসার, *আরবী-বাংলা অভিধান*, ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯ খ্রী., পৃ. ১৯০; ড. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *হাদীস শাস্ত্রের ইতিবৃত্ত*, রাজশাহী : আল-মাকতাবুশ্-শাফিয়াহ, ২০০১, প্রকাশকের কথা দ্রষ্টব্য।

১৭৬. তিনি ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাযাহেরে 'উলূমের শায়খুল হাদীস ছিলেন। হাদীস শাস্ত্রের উপর তাঁর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হল 'বাজলুল মাজহুদ'। তিনি ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২, পৃ. ৩৭।

১৭৭. আন্ওয়ার শাহ কাশমীরী ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে কাশমীরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে ফয়জুল বারী, আল আরফুজ শাজী, আন্ওয়ারুল মাহ্মুদ, শরহে সহীহ্ মুসলিম বিশেষভাবে সমাদৃত। তিনি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

১৭৮. তিনি ছিলেন দেওবন্দের অধিবাসী। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে বিখ্যাত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, লেখক ও রাজনীতিবিদ ছিলেন। 'ফাতহুল মুলহিম' নামক মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তিনিই রচনা করেন। তিনি ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী, *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*, পৃ. ৪৭; আবদুস সামাদ হারিম আল আযহারী, *তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন, *মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*, পৃ. ৩৬-৩৮।

১৭৯. হুসাইন আহমদ মাদানী ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফয়জাবাদের আদি অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'শায়খুল হিন্দ সানী' বা 'দ্বিতীয় শায়খুল হিন্দ' এবং 'আমীরুল হিন্দ' নামে সমধিক বিখ্যাত ছিলেন। তিনি দারুল 'উলূম দেওবন্দে হাদীস শিক্ষা দিতেন। 'তাকরীরে বুখারী ও তাকরীরে তিরমীজি' তাঁর রচিত

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ৪ হাজার ভাষা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে যে ক'টি ভাষা উচ্চ সাহিত্যের রূপ নিয়েছে আরবী তার মধ্যে অন্যতম। এটি প্রাচীন জীবন্ত ভাষা। দু'হাজার বছরের প্রাচীন এ ভাষা জাহেলী যুগে সাহিত্যরূপ লাভ করে। মধ্যযুগে স্বার্থক ভাষা এবং আধুনিক যুগে (বর্তমানে) আধুনিক সাহিত্য হিসেবে দেদীপ্যমান। ইসলামের মূল উৎস কুর'আন ও হাদীস এ ভাষাতেই সংরক্ষিত। তাই এ ভাষা শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। ভূমিষ্ঠ হয়ে আযান শ্রবণ ও মৃত্যু পূর্বে কালিমা-ই-শাহাদাত উচ্চারণ এর গুরুত্ব বহন করে। তাই যুগে যুগে আরবী ভাষা চর্চা ও এর প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে অসংখ্য ভাষাবিদ ও সাহিত্যিকগণ নিজেদেরকে প্রবৃত্ত রেখেছেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে এ উপমহাদেশে আরবী সাহিত্য চর্চা খুব বেশী পরিলক্ষিত না হলেও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিশেষ করে মিশরে এ ভাষা ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। যার প্রভাব তৎকালীন এ উপমহাদেশেও পরিলক্ষিত হয়।[১৮০] এ সময় জ্যোতির্বিদ্যায়ও মুসলমানদের অবদান কম নয়, যেমন শ্রীম্যানের ভাষায় :

> টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা ও এ্যারিস্টোটলের ন্যায় শাস্ত্র সম্বন্ধে মুসলমানদের মোটামুটি জ্ঞান ছিল। ইবনে সিনার মাধ্যমে হিপোক্রেটিস ও গ্যালনের ভাবধারার সাথে ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের পরিচয় আছে। তাঁরা দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা প্রভৃতি বিষয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন।[১৮১]

এমনকি ভূগোল চর্চায়ও মুসলমানরা তৎকালীন ভারতবর্ষে ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেছিল। ইতিহাসে তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের মুসলমানদের অবদান সর্বজন স্বীকৃত।[১৮২]

আত্মসংকটের এ মুহূর্তে যখন সৎ, যোগ্য এবং খোদাভীরু ব্যক্তির সন্ধান করব, তখন নিশ্চয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে সন্ধান করব। কারণ তিনি আমাদেরকে শক্তি, গতি এবং সংগ্রামের মুক্ত মঞ্চ তৈরী করে দিয়েছিলেন।

হাদীস শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। দ্র. আবদুস সামাদ হারিম আল আযহারী, *তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ. ২৮।

১৮০. জি. এম. মেহেরুল্লাহ, *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য*, ঢাকা : আল নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩, পৃ. ২-৩।

১৮১. হুমায়ুন আবদুল হাই, *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪।

১৮২. গোলাম আহমদ মোর্তজা, *চেপে রাখা ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৭-১৭০।

অধ্যায় : দুই

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও ব্যক্তিত্ব

যে সকল মহামনীষীর জ্ঞানের পরশে ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, তাহযীব-তামাদ্দুন বিকশিত হয়েছে, জীর্ণ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, ঘুনেধারা, পুরাতন সমাজ কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন এসেছে, এদেশের মুসলিম সমাজ, দেশ ও জাতির উন্নতি ত্বরান্বিত হয়েছে, একটি স্বচ্ছ ধারার ইসলামী সমাজ বিনির্মিত হয়েছে, অতীত গৌরবময় ইতিহাস ভুলে বসা জাতি খুঁজে পেয়েছে আলোর দিশা, সেই সাথে ফিরে পেয়েছে হারানো আত্মবিশ্বাস, তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সোনালী সাফল্যে ভাস্বর এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অবিভক্ত বাংলার তদানীন্তন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) অন্তর্গত নলতা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের এক শনিবার প্রত্যুষে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন :

> সাধারণতঃ কোন মোছলমান কোষ্ঠী-পত্র রাখে না, সেই জন্য বয়স সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত নহি।[২]

এ সময় তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই জীবিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম মুনশী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন এবং মায়ের নাম মোছাঃ আমিনা বেগম। তাঁর পিতা একজন ধার্মিক, ঐশ্বর্যশালী এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।[৩] তিনি একটি সম্ভ্রান্ত ও ঐতিহ্যবাহী মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই পারিবারিকভাবেই তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন একটি আদর্শিক,

---

১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ৭ম সং, ২০০০, পৃ. ১; এ. এফ. এম. এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৪।

২. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, কলকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী, ১ম সং, ১৯৪৬, ভূমিকা অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩. এ. এফ. এম এনামুলক হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

ধার্মিক ও উদারনৈতিক পারিবারিক ঐতিহ্য। সে পারিবারিক ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তাঁর মানস ও মনন গঠনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।[৪] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর পিতামহ ও পিতার পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেন :

> একটি সম্পন্ন পরিবারে আমার জন্ম। আমার পিতামহ মুনশী মোহাম্মদ দানেশ গ্রামের মধ্যে সকলের মান্য ছিলেন। তিনি জমিদারী সংক্রান্ত কার্যে ও সামাজিক বিষয়ে সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহার উপর জনৈক দরবেশ (যিনি কাসেম শাহ্ নামে পরিচিত ছিলেন) ছাহেবের নেক দৃষ্টি পতিত হয়। বাল্যকালে যখন কঠিন রোগে শয্যাগত হন তখন এক শুভ মুহূর্তে শাহ্ ছাহেবের পদার্পণ হয়। ... তদবধি তিনি সুস্থ শরীরে অশীতিবর্ষ পর্যন্ত অতিবাহিত করেন। পরিবারের মধ্যে কোন আপদ-বিপদ দেখা দিলে অমনি কাসেম শাহ্ হাজির। ... তাঁহারই ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, পিতামহের মৃত্যুকালে জনৈক কামেল ব্যক্তি উপস্থিত হইবেন। সত্যই তাঁহার মৃত্যুর পর ইরান হইতে মাওলানা ছুফী মোহাম্মদ আলী শাহ্ অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদেরই ঘাটে একটি গ্রীন বোড নইয়া উপস্থিত হন।... তাঁহারই পবিত্র হস্তে আমার পিতা মুন্শী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন বায়াত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন ও জীবনের অবশিষ্টকাল সত্য নিষ্ঠার সহিত ষাট বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। মৃত্যুর বহু পূর্বে একদা তিনি স্বপ্নে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন।[৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বংশ তালিকা সারণীর মাধ্যমে এখানে তুলে ধরা হল :[৬]

সারণী–০৩

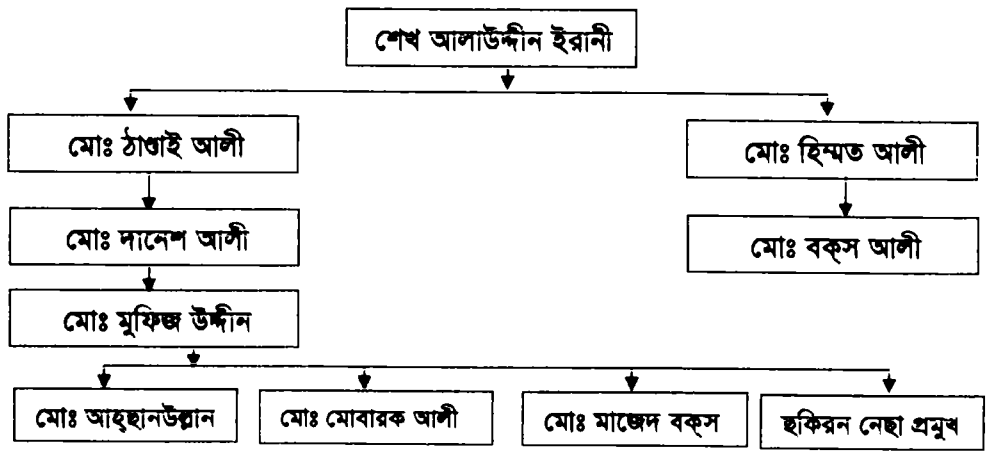

৪. গাজী আজিজুর রহমান, প্রবন্ধ : স্মরণীয় বরণীয় অনুস্মরণীয় আশেক, *আল-আহ্ছান*, ১৭তম বর্ষ, ওরস শরীফ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০২, পৃ. ৯।

৫. *আমার জীবন ধারা*, ৭ম সং, পৃ. ১-২।

৬. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী (১৮৮৭-১৯৭৫)*, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৬, পৃ. ১৫।

এমনি ধরনের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি আদর্শ ধর্মীয় পরিমণ্ডলে তাঁর শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।

শিক্ষা জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার জেষ্ঠ্য সন্তান। ফলে বাল্যকাল থেকে তাঁরা তাঁর সুশিক্ষার প্রতি যথেষ্ঠ গুরুত্বারোপ করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর পিতামহের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর শিক্ষা জীবন শুরু হয় ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে যখন তাঁর বয়স ৫ বছরও পূর্ণ হয়নি।[৭] স্থানীয় পণ্ডিত মতিলাল ভঞ্জ চৌধুরীর হাতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব অর্পিত হয়। কিশোর আহ্ছানউল্লা তাঁর এ শিক্ষককে পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। শিক্ষকও তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ছিলেন। আহ্ছানউল্লা তাঁর জীবনী গ্রন্থ 'আমার জীবন ধারা'য় তাঁর সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করেছেন এভাবে :

> আমি ছিলাম তাঁহার অতি আদরের দুলাল। আমার উপর কোন রোগের আক্রমণ হইলে তিনি অধীর হইতেন ও বালকের ন্যায় রোদন করিতেন। আমিও তাঁহার জীবৎকাল পর্যন্ত যথাসাধ্য সাহায্য করিতে ব্রতী ছিলাম। কলিকাতায় অধ্যয়নকালে অবসর পাইলেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম ও বাল্য-সুলভ ভক্তিসহকারে পরিধেয়াদি উপঢৌকন দিতাম। সেই বাল্যস্মৃতি আমার ক্ষুদ্র বক্ষে এখনও সজীব রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় বর্তমান যুগে শিক্ষক ছাত্রের সম্বন্ধ অননুসরণীয় হইয়া পড়িয়াছে।[৮]

বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। প্রতিটি শ্রেণীতে তিনি তাঁর মেধার প্রকৃষ্ট স্বাক্ষর রাখেন। তিনি যখন ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে 'গ-মিতিয়' (দ্বিতীয় শ্রেণীর সমমান) পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন, তখন ভালো রেজাল্ট করার জন্য 'রূপার মেডেল' পুরস্কার লাভ করেন।[৯] পাঠশালার শিক্ষা শেষ করার পর তিনি নলতা মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় হতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ ভাগ অধ্যয়ন করেন। এই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ হওয়ার পর তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর ফলে তিনি বাকশক্তি ও চলৎ শক্তি হারিয়ে ফেলেন। আরোগ্য লাভের পর দুর্বল শরীরে তিনি তাঁর পিতার নির্দেশক্রমে নবপ্রতিষ্ঠিত 'টাকী গভর্নমেন্ট হাইস্কুল'-এ ভর্তি হন। তৎকালে মুসলিম ছাত্রাবাসের অভাব হেতু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রকে বাসা ভাড়া করে থাকতে হত, কিন্তু বাসা ভাড়া পাওয়াও

---

৭. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) : স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

৯. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯১, পৃ. ৬।

মুসলমান ছাত্রদের জন্য খুব সহজ ছিল না। টাকীর অনঙ্গ মোহন বসু তাঁকে টাকীতে সর্বপ্রকার সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখানে তিনি একটি রজকালয়ে থাকার স্থান পান। আমির চাঁদ নামক এক বৃদ্ধ তাঁর আহারাদির ব্যবস্থা করে দিতেন। কিন্তু এখানে তিনি বেশীদিন অবস্থান করতে পারেননি।[১০]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অসুবিধার কথা বিবেচনা করে অনঙ্গ মোহন বসু তাঁকে নিজ বাসভবনে স্থান দিলেন। অনঙ্গ মোহন বসুর 'গো-শালার অর্ধাংশ' তাঁর পাকশালের জন্য বরাদ্দ করা হল। এখানেও বৃদ্ধ আমির চাঁদ তাঁর খাবারের ব্যবস্থা করতেন। অন্য কোথাও স্থান না পেয়ে তিনি অনঙ্গ মোহন বসুর এই আশ্রয়কে আল্লাহ্ তা'আলার রহমত হিসেবে গ্রহণ করেন।[১১] এ স্থান সম্পর্কে তিনি স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> অন্যত্র কুত্রাপি আশ্রয় না পাইয়া সাদরে অনঙ্গ বাবুর আশ্রিত হইয়া রহিলাম। হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ গো-সেবাকে মাতৃসেবার স্থান দিয়া থাকেন, তাই আমাকে গো-শালায় স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করিলেন না। আমিও স্বীয় অদৃষ্টের প্রতি প্রসন্ন থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকিলাম।[১২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা টাকী গভর্নমেন্ট হাইস্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান সপ্তম শ্রেণী) ভর্তি হন। এ স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর (বর্তমান অষ্টম শ্রেণী) বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম শ্রেণী) উত্তীর্ণ হন। এরপর একদিন কয়েকজন 'সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দু-বালক' তাঁকে কলকাতায় পড়াশোনা করার সুযোগ-সুবিধার কথা বলে এবং কলকাতায় যাওয়ার প্রলোভন দেখায়। মফঃস্বলের শিক্ষার চেয়ে শহরের শিক্ষামান উন্নত ভেবে তিনি কলকাতায় গিয়ে পড়াশোনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তে পিতা-মাতা উভয়েই রাজী হন। টাকী স্কুল থেকে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি কলকাতায় আসেন এবং উপরোক্ত বালকদের সাথে সাক্ষাত করেন। কিন্তু কলকাতায় এসে তিনি নতুন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হন। কলকাতায় বসবাসের জন্য জায়গা পাওয়ার ব্যাপারে উক্ত ছেলেরা তাঁকে কোন সহযোগিতা

---

১০. এখানকার স্মৃতি বর্ণনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'আহারান্তে আমাকে অন্যত্র গিয়া আঁচাইতে হইত, এই হেতু যে আমি মোছলমান। পরিতাপের বিষয় এই যে, ঐ বাড়ীর কর্তৃপক্ষ রামগতি রজক স্বয়ং হরিসংকীর্ত্তণকারী এবং ঈশ্বর-প্রেমিক বলিয়া হিন্দু-ভক্তদিগের মধ্যে সুপরিচিত ছিল। যাহা হউক, আমি উক্ত আবেষ্টনের অনুপযোগী বিবেচিত হওয়ায় আমার সাহচর্য্য গৃহকর্তৃপক্ষের মনঃপুত হয় নাই তাই আমাকে অন্যত্র আশ্রয়ের সন্ধান করিতে হইল'। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১১. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৬।

১২. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৪।

করতে পারেনি। ব্যক্তিগতভাবে অনেক খোঁজাখুঁজি ও কষ্ট স্বীকার করে তিনি একটি থাকার জায়গা ঠিক করেন।[১৩] এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।[১৪]

এরপর তিনি ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার ভবানীপুরে 'লন্ডন মিশন সোসাইটি' (L.M.S) ইন্সটিটিউশনে বছরের শেষ ভাগে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম শ্রেণী) ভর্তি হন। এ সময়ে একটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে। পিতা-মাতার নির্দেশ ছিল শহরে অকারণে ঘোরাফেরা না করা। তাই তিনি একাকী স্কুলে যেতেন এবং ছোট্ট ঘরে ফিরে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। পূর্বোল্লিখিত যে সকল বালক তাঁকে শহরে এসে পড়াশোনা করার প্রলোভন দেখিয়েছিল তারা হঠাৎ করে একদিন তাঁর বাসায় এসে উপস্থিত হল। তারা তাঁকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি পিতা-মাতার আদেশের কথা স্মরণ করে তাদের সাথে যেতে রাজী হলেন না। তারা কোন অজুহাতেই কর্ণপাত না করে তাঁকে একপ্রকার জোর করেই ঘরের বাইরে নিয়ে আসে এবং স্টার থিয়েটারের কাছে উপনীত হয়। বালক আহ্ছানউল্লা শহরে থেকে পড়াশোনা করেন, কিন্তু সিনেমা থিয়েটার সম্পর্কে তার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। তাঁর এ অনভিজ্ঞতার সূত্র ধরে এ ছেলেরা সকলের টিকেটের পয়সা তাঁর

---

১৩. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৪. '... সাত পাঁচ ভাবিয়া একাকী চেতলাঘাট হইতে নামিলাম এবং বাসার অনুসন্ধানে তৎকালীন চাউল পট্টিতে উপস্থিত হইলাম। একটি দোকানদারের মাথায় টুপি দেখিয়া সেই দিকে ছুটিলাম ও ভাড়াটিয়া বাড়ীর অনুসন্ধান করিলাম। তিনি আমাকে হানিফ বাবু নামক তাঁহার জনৈক মুছলমান বন্ধুর নিকট পাঠাইলেন। সেখানে অতি আগ্রহের সহিত উপস্থিত হইলাম কিন্তু তিনি প্রথমে মাথা নাড়াইয়াই জানাইয়া দিলেন-না, কোন বাসোপযোগী বাড়ী খালি নাই। কিয়ৎ পরেই তিনি পুনরায় আমাকে ডাকিয়া বলিলেন- হ্যাঁ, একটি ছোট কামরা খালি আছে, কিন্তু তাহা কি তোমার উপযোগী হইবেঃ আমি বলিলাম- 'যে কোন স্থানে মাথাটি রাখিতে পারিলেই ধন্য হইব'। তখন তিনি অনিচ্ছসত্ত্বেও উঠিয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন ও একটি ছোট কামরা যাহা মুটিয়াদের থাকিবার জন্য অভিপ্রেত, তাহাই দেখাইলেন। মাসিক ভাড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন-এক টাকা চারি আনা, সংলগ্ন কামরাগুলিতে মুটিয়া-মজুরের অবস্থান, সরকারী পায়খানা ও সরকারী প্রস্রাবখানা কামরাটীর নিকটবর্তী। অনন্যোপায় হইয়া অতি দুঃখের সহিত ঐ কামরাটি লইতে রাজী হইলাম। দরমার বেড়া, দরমার দরজা, গোলপাতার চাল। কামরাটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬ হাত x ৬ হাত হইবে। ইহা ভবাণীপুরের অন্তর্গত চাউলপট্টিতে অবস্থিত। ক্ষুদ্র একটি তক্তপোষ খরিদ করিলাম। ইহার উপরে রহিল জ্বালানী কাঠ, পার্শ্বে চুলা ও নীচে পাকের সরঞ্জাম। বাবুর্চি আমীর চাঁদ, আমি প্রবাসী ছাত্র। পিতার আদেশ-শহরের লোকের সহিত মিশিবে না, তাই দিবা-রাত্র Solitary Cell বা নির্জ্জন কারাবাস তুল্য ঘরের মধ্যে সময় অতিবাহিত করিতাম। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

কাছ থেকে আদায় করে এবং তাঁকে নিয়ে থিয়েটার হলে প্রবেশ করে।[১৫]

ইতোমধ্যে তিনি উক্ত 'লন্ডন মিশনারী স্কুল'-এ প্রথম শ্রেণী (বর্তমান দশম শ্রেণী) উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (বর্তমান এস.এস.সি.) পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[১৬] এরপর তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এ কলেজ থেকে এফ.এ (বর্তমান এইচ.এস.সি.) পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন।[১৭]

এফ.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে বি.এ ক্লাসে ভর্তি হন এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। সে বছর বি.এ পরীক্ষায় পাশের হার ছিল মাত্র ১৪%। তন্মধ্যে মুসলমানদের হার ছিল নামেমাত্র।[১৮] ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বপ্রথম বি.এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র দশ জন। এঁদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন মাত্র দু'জন। মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন নামে পরিচিত) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ভারতের মধ্যে প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। বরেণ্য ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতিক এ.কে. ফজলুল হক এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একই বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ পাশ করেন।[১৯] বস্তুতঃ তিনি যখন শিক্ষাজীবনে প্রবেশ করেন তখন বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার আলো প্রবেশ করেইনি বলা চলে। উচ্চশিক্ষিতের কথা তো বলাই বাহুল্য। সমগ্র

---

১৫. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯। থিয়েটার দেখার এ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন– 'থিয়েটার দেখিয়া বাসায় ফিরিলাম, কিন্তু মনে কেমন এক আবেগদ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল, আবার দেখিবার ইচ্ছা মনের কোণে জাগিল। তখনই পিত্রাদেশের কথা মনে পড়িল। নামাজে বসিলাম, প্রতিজ্ঞা করিলাম– 'হে খোদা, যে বস্তু এইরূপ চিত্তাকর্ষক, সে বস্তুর আকর্ষণে আর যেন জীবন মধ্যে আকৃষ্ট না হই। সেই প্রতিজ্ঞান বশবর্তী হইয়া সারাজীবনে থিয়েটার যাত্রা, ফিল্ম কিছুই দেখিবার সাধ করি নাই। আমার প্রতি কেহ কেহ অনভিজ্ঞতার দোষারোপ করেন। কিন্তু আমি অনভিজ্ঞ থাকিয়াই অসীম শক্তিশালী মহাপ্রভুর শোকরিয়া প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে আদায় করিতেছি এবং প্রার্থনা করিতেছি যে, তাঁহারই মনোমোহিনী স্মৃতি বুকে লইয়া যেন পৃথিবীর সর্বপ্রকার আকর্ষণ হইতে দূরে থাকিতে পারি, ঐ এককত্বের অতল সমুদ্রে নিজেকে নিমজ্জিত রাখিতে পারি। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

১৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

১৭. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ১৫।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫।

১৯. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

যশোর-খুলনা এলাকায় উচ্চশিক্ষিত লোকের কথা বলতে গেলে মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন আহ্ছানউল্লা সহ মাত্র চার জন। অন্য তিনজন হলেন যথাক্রমে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী (১৮৫৬-১৯২২), কাজী ইমদাদুল হক এবং কবি গোলাম হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৪)। তন্মধ্যে খান সাহেব আব্দুল ওয়ালী ছিলেন সবার অগ্রণী। কবি গোলাম হোসেন ছিলেন তার সমবয়সী। তবে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের সমকালীন মুসলিম শিক্ষাবিদগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার অগ্রণী এবং পদমর্যাদায়ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।[২০] ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাসহ যে ১৩ জন মুসলমান ছাত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পাশ করেন তাঁরা হলেন[২১] :

আবুল কাশেম	প্রেসিডেন্সি কলেজে
এ.কে. ফজলুল হক	প্রেসিডেন্সি কলেজে
মতলুব আহমদ খান	প্রেসিডেন্সি কলেজে
শেখ* আহ্ছানউল্লা	প্রেসিডেন্সি কলেজে
নূরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সি কলেজে
শেখ ওসমান আলী	প্রেসিডেন্সি কলেজে
সৈয়দ হোসেন আলী	প্রেসিডেন্সি কলেজে
আব্দুল মালেক	সেন্ট জেভিয়ার্স
মাসুদুল হক	সেন্ট জেভিয়ার্স
মোঃ ইচাকিন	সেন্ট জেভিয়ার্স
আলাউদ্দীন আহমেদ	ঢাকা কলেজ
সৈয়দ আলী মোহসেন	শিক্ষক
জহুরুল হক	শিক্ষক

---

২০. মুহাম্মদ আবু তালিব, প্রবন্ধ : সাহিত্যিক শিক্ষাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা : ইকাবা, ১৯৯০, পৃ. ৭২-৭৩।

২১. প্রবন্ধ : সৈয়দ মুর্তাজা আলী, শিক্ষা ক্ষেত্রে দিশারী, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৭শ বর্ষ, দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯ বাংলা, পৃ. ১০৩-১২২।

*খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছাত্রাবস্থায় তাঁর নামের আগে 'শেখ' ব্যবহার করতেন কি না সে সম্পর্কে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। তবে পরবর্তীতে তাঁর বিভিন্ন লেখায় লেখকের নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ জাতীয় পদবী যুক্ত হতে কখনো দেখা যায়নি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দর্শন বিষয়ে এম.এ ডিগ্রী লাভ করেন।[২২] এ সময় তিনি রিপন কলেজে বি.এল অধ্যয়নরত ছিলেন, কিন্তু পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি।[২৩]

এভাবে নিদারুণ কষ্ট, শারীরিক অসুস্থতা ও নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছাত্রজীবনের কঠিনতম দিনগুলো অতিবাহিত করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে এম.এ ডিগ্রী লাভের মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাজীবনের সফল সমাপ্তি ঘটে। এ শিক্ষা তাঁকে দান করেছিল সীমাহীন জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরমাশ্চর্য বোধি এবং ধর্ম তাঁকে দান করেছিল শিষ্টাচার, মার্জিত আচরণ, প্রেম-সৌন্দর্য, মানবতাবাদ ও সর্বোত্তম চরিত্রশোভা। যার ফলে তিনি অবিভক্ত বাংলার প্রথমসারির শিক্ষাবিদদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[২৪]

পারিবারিক জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে পনের বছর বয়সে একই গ্রামের মুনশী উমার উদ্দীন সাহেবের পঞ্চবর্ষীয়া কন্যা বেগম মনুজানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।[২৫] ছাত্রাবস্থায় মরণোন্মুখ বৃদ্ধা পিতামহীর অন্তিম ইচ্ছা পূরণের জন্য তিনি নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন।[২৬] পরবর্তীতে তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে স্থায়ীভাবে যোগদান করেন। এ সময় থেকে তিনি সস্ত্রীক বসবাস করতে শুরু করেন। এ সময়ে তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২৫ বছর। সুতরাং বলা যায়, চাকরি জীবন শুরু করার তিন বছর পর থেকেই তিনি সত্যিকার অর্থে দাম্পত্য জীবনের সূচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে এহেন সংযম

---

২২. মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

২৩. এ সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ রয়েছে– 'বি.এ. পরীক্ষা আসিল। ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। পরে উক্ত কলেজেই এম.এ. পড়িতে থাকিলাম-বিষয় লইলাম Philosophy, একটি বৎসর উত্তীর্ণ হইতেই পরীক্ষায় উপস্থিত হইলাম। ... যাহা হউক খোদাতালার অসীম কৃপায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। প্রেসিডেন্সী কলেজে এম.এ. পড়িবার সময়ে একই সঙ্গে রিপন কলেজে বি.এল. পড়িতাম। কিন্তু বি.এল. পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অবকাশ পাই নাই। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ১১।

২৪. *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০০-২০০১*, সাতক্ষীরা : নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, নিবেদন অংশ দ্রষ্টব্য।

২৫. ড. মোমেন চৌধুরী, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও কর্ম, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২১ বর্ষ, ৪র্থ (যুগ্ম সংখ্যা), মার্চ ২০০০, পৃ. ৪।

২৬. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

সত্যি খুবই দুর্লভ।[২৭]

তিনি ছিলেন আট সন্তানের জনক। ইতিমধ্যে তাঁকে বরিশালে ট্রান্সফার করা হয়। এখানে অবস্থানকালে তাঁর জেষ্ঠ্য পুত্র মোহাম্মদ শামছুজ্জোহার জন্ম হয়। শামছুজ্জোহা লন্ডন থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করেন এবং স্বদেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি কলকাতা হাইকোর্টের সলিসিটরের পেশা গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ঢাকার এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল পদে নিযুক্ত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম মহিলা ছাত্রী এম.এ ফজিলাতুন্নেছার সঙ্গে তাঁর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। তাঁরা একই সময়ে লন্ডনে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন। বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে সরকারী বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পাঠানোর ব্যাপারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিশেষ অবদান ছিল।[২৮]

ফজিলাতুন্নেছা যখন লন্ডনের পথে রওয়ানা হন, তখন কলকাতা শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল সহকারে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে তাঁকে বিদায় জানায়।[২৯] কর্মজীবনে তিনি কলকাতার বেথুন কলেজের অংক শাস্ত্রের অধ্যাপিকা ছিলেন এবং পরবর্তীতে একই কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপ্যাল পদে উন্নীত হন। এ যাবতকালের ইতিহাসে কোন মুসলিম মহিলার উক্ত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা এই প্রথম ঘটল। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পূর্বে তিনি ঢাকার ইডেন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তিনি ইডেন কলেজকে ডিগ্রী পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য নিজেকে সর্বোতভাবে নিয়োজিত রাখেন। দু'বছর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সফলতা লাভ করেন। এছাড়াও নারী শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নের জন্য মিসেস ফজিলাতুন্নেছা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।[৩০] তাঁর সম্পর্কে এক স্মৃতিচারণে যোবায়দা মির্যা বলেন :

---

২৭. দাম্পত্য জীবন শুরুর অভিজ্ঞতা তিনি আত্মজীবনী গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এভাবে– "ইতঃপূর্বে যখন ফরিদপুরে স্থায়ী পদে নিযুক্ত হই, তখন তথায় স্বস্ত্রীক থাকিবার আয়োজন করিয়াছিলাম। এযাবৎ সহধর্ম্মিণীর সহিত ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল না। এই পরিচয়ের সহায়তার জন্য বৃদ্ধা পিতামহী সঙ্গে আসিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আমার বিবাহ-জীবন ফরিদপুর হইতে আরম্ভ হয়। তখন শিশু-বালিকা যৌবনের প্রাক্কালে আসীনা। লজ্জা ও ভয় নারী-চরিত্রের ভূষণ। ইহাই দাম্পত্য প্রণয়ের অন্তরায় হইয়াছিল। এখন ধীরে ধীরে সাংসারিক জীবনে প্রবেশ করিবার অবসর হইল। আমার বাল্যকালের প্রার্থনা খোদাতায়ালা বোধ হয় শুনিয়াছিলেন। তাই এযাবৎ কাল দয়াপরবশ হইয়া তিনি আমাকে সাংসারিক জীবন হইতে দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্র. *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

২৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৭।

২৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৩০. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

বিশের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সংখ্যক মেয়েকে নিয়ে নাজিমুদ্দিন রোডের আশেপাশের এলাকা জুড়ে বস্তিগুলোতে ঘুরে ঘুরে লেখাপড়া শেখানো, ওষুধ-কাপড়, খাবার বিতরণ করা, মহামারীর সময় কলেরার ইনজেকশন, বসন্তের টিকা দেওয়া সবই তিনি করে বেড়িয়েছেন। সেসব এলাকার লোকজন আও ভোলেনি সে কথা। তাঁর গুণগ্রাহীর অন্ত নেই। বহু ব্যক্তিগত আবেদন-নিবেদন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। তাঁর অদম্য উচ্চাকাঙ্খা থেকে তাঁকে কেউ টলাতে পারেনি।[৩১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সন্তানদের তালিকা এখানে দেয়া হল :

১. পীরজাদা মোহাম্মদ শামছুজ্জোহা
২. পীরজাদা মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা
৩. পীরজাদা মোহাম্মদ নূরুল হুদা
৪. পীরজাদা মোহাম্মদ নাজমুল উলা
৫. পীরজাদা মোহাম্মদ জয়নুল উলা
৬. পীরজাদা মোহাম্মদ কামরুল হুদা
৭. পীরজাদা মোহাম্মদ মাজহারুস সাফা
৮. পীরজাদা মোহাম্মদ গওছার রেজা।[৩২]

তাঁর আট সন্তানদের মধ্যে একমাত্র পীরজাদা মাজহারুস সাফাই আজো বেঁচে আছেন।

কর্ম জীবন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিত্তশালী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও তাঁর পিতা মৃত্যুকালে তাঁর জন্য বিত্ত রেখে যেতে পারেননি। তিনি তা জনসেবায় ব্যয় করে গিয়েছিলেন। পিতার এহেন জনকল্যাণমূলক কাজ পরবর্তী জীবনে তাঁর উপর গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি শিক্ষা সমাপ্ত করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে ভবিষ্যত কর্মপন্থা সম্পর্কে পিতার পরামর্শ চান। পিতা তাঁকে শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের সঙ্গে সাক্ষাত করার নির্দেশ দেন। সে সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন এ. ডব্লিউ. ক্রাফ্ট।[৩৩] তিনি তাঁর সাথে দেখা করেন এবং শিক্ষা বিভাগে যে কোন একটি চাকরির

---

৩১. যোবায়দা মির্যা, প্রবন্ধ : কাকতালীয় যোগাযোগ, *দৈনিক ইত্তেফাক*, মঙ্গলবার, ২৫ চৈত্র, ১৩৯২ বাংলা।

৩২. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ২৩; *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, পৃ. ১৫।

৩৩. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২১৩।

জন্য দরখাস্ত করেন। দরখাস্তের প্রেক্ষিতে মিঃ ক্রাফ্ট তাঁকে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের সুপারনিউমারী টিচার পদে নিয়োগ দান করেন।[৩৪] কিন্তু এ সময়ে তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হওয়ায় রাজশাহী উপস্থিত হয়ে যথাসময়ে উক্ত পদে যোগদান করতে ব্যর্থ হন। হেডমাস্টার তাঁর পরিবর্তে উক্ত পদে অন্য কাউকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার জন্য প্রিন্সিপ্যাল লিভিংস্টোনকে অনুরোধ জানালে তিনি আরো এক সপ্তাহ অপেক্ষা করার জন্য তাঁকে নির্দেশ দেন। সপ্তাহ শেষে নির্দিষ্ট দিনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দুর্বল শরীরে স্কুলে যোগদান করেন। এ সময় তাঁর মাসিক বেতন ছিল মাত্র ৫০ টাকা।[৩৫] এর কিছুকাল পর তিনি ফরিদপুরে অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগ পান। এ পদের জন্য তাঁর বেতন নির্ধারিত হয় মাত্র ১২৫ টাকা।[৩৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মজীবন শুরু হয় শিক্ষকতার মত একটি আদর্শ পেশার মাধ্যমে।[৩৭] অল্প সময়ের ভেতর তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর সুকৃতির জন্য সুনাম অর্জন করেন এবং ছাত্ররা তাঁর বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময় তিনি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমান নবম, অষ্টম ও সপ্তম শ্রেণীর) ক্লাস নিতেন। কিন্তু শিক্ষক হিসেবে তিনি এমনই সুনাম অর্জন করেন যে, অনেক সময় প্রথম শ্রেণীর (দশম) শ্রেণীর ছাত্ররাও তাঁর পাঠ শোনার জন্য চলে আসত। হিন্দু ও মুসলমান ছাত্ররা তাঁর বাসায় সারাক্ষণ যাতায়াত করত। ছাত্ররা তাঁকে এতই ভালোবাসত যে, তিনি যখন রাজশাহী থেকে বিদায় নেন তখন ছাত্ররা ভক্তির নিদর্শন হিসেবে ফুটবল খেলার আয়োজন করে। এ ছাড়া সন্ধ্যায় প্রিন্সিপ্যাল লিভিংস্টোনের নেতৃত্বে স্থানীয় 'পাবলিক লাইব্রেরী'তে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। চাকরি জীবনের শুরুতে তিনি এভাবেই ছাত্র-শিক্ষক নির্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন।[৩৮]

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টরের নতুন পদে যোগদানের জন্য ফরিদপুর আসেন। এ পদে কাজ করার প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ছয় মাস তিনি স্কুল সাব-ইন্সপেক্টরের পদে কাজ করেন। এখানে তাঁকে বহু স্কুল পরিদর্শন করতে হত। সে সময় এদেশের

---

৩৪. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২।

৩৫. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

৩৬. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, প্রাগুক্ত।

৩৭. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, পৃ. ২৩; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ৯।

৩৮. প্রাগুক্ত।

রাস্তাঘাট আজকের মত এত উন্নত ছিল না। প্রয়োজনীয় যানবাহনের যথেষ্ট অভাব ছিল। কিন্তু পথের কষ্টের কথা চিন্তা করে তিনি কখনো কর্তব্যে অবহেলা করেননি। অনেক সময় রমজান মাসে রোজা রেখে পায়ে হেঁটেই দৈনিক ২০ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণ করতেন।[৩৯] অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি কোন স্কুল কর্তৃপক্ষের আতিথেয়তা গ্রহণ করতেন না। সঙ্গে পিয়ন[৪০] থাকত। তার মাথায় বিছানাপত্র ও চাল-ডাল ইত্যাদি থাকত, সন্ধ্যা হলে কোন জায়গায় রাত কাটাতেন। এ সময়ের অনেক স্মৃতি তিনি তাঁর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের ১ এপ্রিল উক্ত পদ পরিত্যাগ করে স্থায়ীভাবে ফরিদপুর জেলার অতিরিক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এক বছর অতিক্রান্ত না হতেই তিনি ডিরেক্টর মার্টিন কর্তৃক অপেক্ষাকৃত বড় জেলা বাখরগঞ্জের ডেপুটি ইন্সপেক্টর নিয়োগ পান।[৪১] একাধিক্রমে প্রায় সাত বছর তিনি উক্ত পদে কার্য নির্বাহ করেন। এখানে অবস্থানকালে তিনি বিট্সন বেল, অশ্বিনী কুমার দত্ত, রায়বাহাদুর দ্বারকা নাথ দত্ত, শেরে বাংলার পিতা হাজী ওয়ারেছ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তির স্নেহ ও সহানুভূতি লাভ করেন।[৪২] তখনকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মিঃ বিট্সন বেল। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম গভর্নমেন্টের চীফ সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি তাঁর শিলং ভবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে আমন্ত্রণ জানান। এ সময়ে পূর্ববঙ্গে যত কমিটি বা কনফারেন্স হত, সবগুলোতেই তাঁকে আহবান করা হত। প্রদেশে শিক্ষার ভাষা কি হবে এ বিষয়ে আইন পরিষদে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন চীফ সেক্রেটারী আহ্ছানউল্লার লিখিত প্রস্তাব পরিষদে পেশ করেন।[৪৩]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বরিশালে থাকতেই শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর মার্টিন Subordinat Educational Service থেকে Provincial Educational Service এর জন্য ১২ জনের নাম মনোনীত করে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নাম এতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। বেঙ্গল গর্ভনমেন্ট খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকেই মনোনীত করে তাঁকে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাস্টার পদে নিযুক্ত করেন। এর ফলে

---

৩৯. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৫।

৪০. এ পিয়নের নাম ছিল 'আলী'। হুগলির অকৃত্রিম বন্ধু কাজী মাজেদ বখ্শ এ পিয়নকে তাঁর সেবাযত্নের জন্য পাঠিয়েছিলেন। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ১৪।

৪১. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, পৃ. ৩২।

৪২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

৪৩. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও কর্ম, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, পৃ. ৪।

তিনিই সর্বপ্রথম Inspecting Line থেকে Teaching Line এর Provincial Line-এ অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি উক্ত পদে যোগদান করেন।[৪৪] রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে ইতিপূর্বে কোন মুসলমান হেডমাস্টার নিযুক্ত হননি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রথম মুসলমান হেডমাস্টার। এখানে তাঁকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু কর্তব্যপরায়ণতা এবং ন্যায়-নীতির প্রতি অবিচল আস্থা দেখে হিন্দু-মুসলমান সবাই তাঁকে বিশেষ ভক্তি করত, ভয়ও পেত। অন্যায়কে তিনি সব সময় কঠোর হস্তে দমন করতেন। একবার স্থানীয় সম্মানীয় উকিল পরিবারের এক ছাত্র টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরি করে ফাঁস করলে তিনি শিক্ষকদের কমিটিতে আলোচনা করে তাকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন।[৪৫] এ শাস্তিদানের এরূপ প্রভাব পড়েছিল যে, পরবর্তীতে আর কোন ছাত্র এরূপ অপরাধ করতে সাহসী হয়নি।

পূর্ববঙ্গ ও আসামের শিক্ষা বিভাগের তৎকালীন ডিরেক্টর এইচ. শার্প সে সময় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শন করে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কাজে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁর কর্মদক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম বিভাগের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। চট্টগ্রামের কার্যভার গ্রহণের কিছুদিন পর চট্টগ্রাম

---

৪৪. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন, ৩য় প্রকাশ, ২০০১, পৃ. অনুল্লেখিত।

Khan Bahadur Ahsanullah (R) Spent the next seven years of his service life working in the post of Deputy Inspector. At this time, Director Martin recommended the names of 12 officials to the Government of Bengal for being absorbed from the Subordinate Education Service in to the Provincial Education Service. The Name of Khan Bahadur Ahsanullah (R) was also among them and he was considered eligible by the Director. As a result, he became the first person to be absorbed from the inspecting line to the teaching line in the provincial service and was, consequently, appointed the head Master of Rajshahi Collegiate School in 1904. Gholam Moyenuddin, *Khan Bahadur Ahsanullah (R) : A small Introduction*, Dhaka : Ahsanial Mission, 2000.

৪৫. সকল ছাত্র-শিক্ষকের উপস্থিতিতে তিনি সেই ছাত্রকে বললেন– 'দেখ ভাদুড়ী, তুমি গুরুতর অপরাধ করিয়াছ। ভালরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তুমি টেস্ট পরীক্ষার মুদ্রিত প্রশ্ন অফিস হইতে বাহির করিয়া বন্ধু-বান্ধবকে বিলি করিয়াছ-যাহার ফলে অধিকতর অর্থব্যয়ে পুনরায় প্রশ্ন ছাপাইতে হইয়াছে এবং সবাইকে অযথা তরদ্দুদের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। সমবেত শিক্ষকদের অভিমত যে, তোমাকে এজন্য ২৫টি বেত্রাঘাত সর্বসমক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা তোমাকে স্কুল হইতে বিতাড়িত হইতে হইবে এবং তোমাকে কু-ত্রাপি পড়িবার অনুমতি দেওয়া হইবে না। আমি হঠাৎ ক্রোধপরবশ হইয়া এই শাস্তি দিতেছি না, পূর্ণ এক সপ্তাহ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া আমার সহকর্মীদের সহিত একমত হইয়া স্কুলের ভবিষ্যৎ শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই শাস্তি দিতে বাধ্য হইয়াছি। এখন যদি তোমার শাস্তি গ্রহণের ইচ্ছা থাকে, তবে হাত বাড়াও'। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

বিভাগের শিক্ষা উন্নয়ন সম্পর্কে সরকার একটি কমিটি গঠন করে এবং তিনি তার সচিব মনোনীত হন। প্রায় এক বছর যাবত কাজ করে কমিটি রিপোর্ট প্রস্তুত করেন এবং সে রিপোর্টটি সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। বিভাগীয় কমিশনার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর বেতন বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব পেশ করেন। তাঁর যোগ্যতা ও দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ সরকার মধ্যবর্তী গ্রেড অতিক্রম করে পরবর্তী উচ্চতর গ্রেড প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাঁর বেতন ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪০০ টাকায় উন্নীত করা হয়।[৪৬]

১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার পর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কয়েক বছরের জন্য প্রেসিডেন্সি বিভাগের অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর পদে বদলি হয়ে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা স্থানান্তরিত হন। কিন্তু কিছুদিন পর পুনরায় তিনি চট্টগ্রাম ডিভিশনাল ইন্সপেক্টরের পদে যোগদান করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তিনি ১৭ বছর যাবত চট্টগ্রাম বিভাগেই বিভিন্ন পদে চাকরি করেন। চট্টগ্রামে চাকরিরত অবস্থায়ই তিনি ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিস (আই.ই.এস.)এর অন্তর্ভুক্ত হন। সে সময় সরকারী চাকরিতে আই.ই.এস. বিশেষ সম্মানীয় পদমর্যাদার পরিচয় বহন করত। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আই.ই.এস.-এর অন্তর্ভুক্ত হন।[৪৭]

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা 'বঙ্গদেশের মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর' পদে নিযুক্ত হন। সহকারী ডিরেক্টর পদে তিনি ৫ বছর কর্মরত থাকেন।[৪৮] এ সময় তাঁর মাসিক বেতন (মূল বেতন ও অন্যান্য ভাতাসহ) ছিল ১৮৫০ টাকা। অবিভক্ত বাংলায় ইতিপূর্বে কোন ভারতবাসী সহকারী ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হননি।[৪৯] আর খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবসর গ্রহণের পরও দ্বিতীয় কোন ভারতবাসী উক্ত পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় পুনরায় ইংরেজ সরকার 'মিঃ বটমলি'কে নিয়োগ প্রদান করেন। সে সময় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরকে সাহায্য করার জন্য দু'জন সহকারী ডিরেক্টর থাকতেন। কিন্তু উভয়ের পদমর্যাদা ও বেতনক্রম সমান ছিল। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে সহকারী ডিরেক্টরের পদ কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কলকাতায় চলে আসেন। তিনি কিছুদিন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা

---

৪৬. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

৪৭. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৩।

৪৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, পৃ. অনুল্লেখিত।

৪৯. সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৫, খানবাহাদুর শব্দ দ্রষ্টব্য।

বিভাগের ডিরেক্টর পদেও কর্মরত থাকেন।[৫০] ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ৫৫ বছর বয়সে তিনি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।[৫১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৯৬ থেকে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করেন। এ দীর্ঘ জীবনের পুরোটাই অতিবাহিত হয়েছে শিক্ষা বিভাগে। তঁর এ দীর্ঘ সময়ের দিনগুলো ছিল বর্ণাঢ্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও কর্মবহুল। এখানে ছিল মেধা, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও সাফল্যের সমাহার। একজন সাধারণ শিক্ষক থেকে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে আসন গ্রহণ করার এ পথ পরিক্রমা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর ও অনন্য। অফিসের প্রতিটি দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে পালন করতেন। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পাদন করাকে তিনি ধর্ম পালনের অংশ মনে করতেন। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন একটি গতিশীল ও কর্মময় জীবনের অধিকারী। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে সরকারী চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করলেও তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি কর্মব্যস্ত ছিলেন। সময়ের অপব্যবহারকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তিনি যখন যেখানে যে দায়িত্বে থাকতেন সে অঞ্চলের শিক্ষা প্রসারের জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতেন। পাশাপাশি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের প্রতিও তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তাঁর চাকরি জীবন ও চাকরি পরবর্তী জীবনের কর্মধারার মধ্যেও ছিল ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র।

শিক্ষা সংস্কার

যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির মাঝে আল্লাহ্ তা'আলা এমন কিছু মহৎপ্রাণ মানুষকে প্রেরণ করেন, যাদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও মোহনীয় চৌম্বিক আকর্ষণে আলোড়িত হয় সমগ্র জাতিসত্তা। তাঁরা তাঁদের সাধনালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে এমনই চেতনার ঢেউ জাগিয়ে দেন যে, তার প্রভাবে সে জাতির মাঝে একটি নীরব বিপ্লব ঘটে যায়। বিশেষতঃ বিশ শতকে এ উপমহাদেশের এক বিস্তৃত অঙ্গন জুড়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আবির্ভাব ছিল অবহেলিত, নির্যাতিত-নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অশিক্ষিত মুসলমানদের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ।

বিশ শতকের প্রথম বিশ বছরে মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা প্রসারের যে সূচনা হয়েছিল, বিশের দশকে তার মধ্যে গতিবেগ সৃষ্টির প্রয়োজন দেখা দেয়। এ সময় দু'দিক থেকে সুযোগ এসেছিল। প্রথমতঃ এ.কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদে শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব

---

৫০. শ্রী অঞ্জলি বসু সম্পাদিত, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ লি., ১৯৭৬, পৃ. ৫১।

৫১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

গ্রহণ করেন। দ্বিতীয়ত, মুসলিম সুহৃদ বলে কথিত 'টেলার সাহেব' শিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক পদ থেকে অবসর গ্রহণের পর এ গুরুত্বপূর্ণ পদটি শূন্য হওয়ায় তা ভারতীয় শিক্ষা পরিষদের সদস্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দ্বারা পূরণ করা হয়। এর ফলে বঙ্গীয় মুসলিম সমাজ অধিকতর লাভবান হয়।[৫২] কেননা তিনি সারাজীবন শিক্ষা বিভাগেই চাকরি করেছেন তাই পেশাগত অবস্থান থেকে তাঁর সুযোগ হয়েছিল অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে পর্যবেক্ষণ করার। সে জন্য তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা। শিক্ষাই হচ্ছে জাতীয় উন্নয়নের একমাত্র হাতিয়ার।[৫৩] শিক্ষা একদিকে যেমন মানুষের জাগতিক জীবন ও জীবিকা সহজসাধ্য করে অপরদিকে তেমনি ধর্মীয় ও আত্মিক জীবনের সঠিক চাহিদা পূরণে সহায়তা করে।[৫৪] তাই তিনি যেখানেই অবস্থান করেছেন সেখান থেকেই অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়কে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী করার জন্য প্রভূত পরিমাণে সহায়তা করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সক্রিয় প্রচেষ্টায় তৎকালীন শিক্ষা বিভাগের বিশেষশতঃ মুসলিম শিক্ষার বহু সংস্কার সাধিত হয়।[৫৫] মুসলিম শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁর স্বীকৃত অবদান অনেকের পক্ষে এখন জানার সুযোগ ঘটেছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশনগুলোর বিবিধ জনহিতকর কর্মকাণ্ড এবং তাঁর প্রণীত পুস্তকাবলীর মাধ্যমে। বিশেষ করে তাঁর শিক্ষানীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় তাঁর রচিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান' ও 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থদ্বয় থেকে।[৫৬] বাংলা প্রদেশের শিক্ষা বিভাগে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বীয় যোগ্যতাবলে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিগণিত হয়েছিলেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর দক্ষ দায়িত্বশীলতায় সন্তুষ্ট ছিলেন। সে সময় পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশে শিক্ষা সংক্রান্ত যতগুলো কমিটি বা কনফারেন্স হত, প্রত্যেকটিতে তিনি আহূত হতেন।[৫৭] ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব নিয়ে কলকাতায়

---

৫২. মোহাম্মদ মুসা আনসারী, প্রবন্ধ : আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ১০২।

৫৩. প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্পর্কে অভিব্যক্তি, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২২ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০, পৃ. ৪।

৫৪. প্রতিবেদন : বার্ষিক সাধারণ সভা-২০০০, ঢাকা : *আহ্ছানিয়া মিশন*, পৃ. ৭।

৫৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১।

৫৬. আলহাজ্জ মাওঃ নূরুল আমীন আনছারী, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার (রঃ) অক্ষয় কীর্তি : মুসলিম শিক্ষার উন্নয়ন, *আল-আহ্ছান*, ১৪তম বর্ষ, ১৪তম সংখ্যা, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ৭।

৫৭. Dr.Azizul Haque, *History and Problem of Muslim Education in Bengal*, P. 13.

চলে যান। এ দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে বিশেষ অবদান রাখেন। গোটা বাংলা মুসলিম শিক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়। তিনি অত্যন্ত সফলভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। উচ্চ পর্যায়ের নীতি নির্ধারণী সভাসমূহে প্রভাব খাটিয়ে তিনি মুসলিম শিক্ষার অনুকূলে বহু প্রস্তাব ও প্রকল্প পাশ করাতে সক্ষম হন। সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে অত্যধিক কাজের চাপের মাঝেও তাঁকে নীতি নির্ধারণী ও বিভাগীয় মীটিংসহ প্রতি সপ্তাহে গড়ে ৩০টি বিষয় নিষ্পত্তি করতে হত। এছাড়াও নিয়মিত সাক্ষাতকার প্রদান করতেন।[৫৮] এত ব্যস্ততার মধ্যেও এ মনীষীর হাতে পাঁচ বছরের মধ্যে এদেশের শিক্ষা বিভাগের ২৮ দফা সংস্কার সাধিত হয়। তাঁরই হস্তে অর্পিত হয়েছিল আমাদের শিক্ষার ভিত্তি গঠনের দায়িত্ব, যার উপর আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছিল।[৫৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন এখানে উল্লেখ করা হলো :

১. সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার নিয়ম প্রচলিত ছিল। অনেকের ধারণা, এর ফলে পরীক্ষক কর্তৃক পক্ষপাতিত্বের সুযোগ থাকে। সেজন্য নামের পরিবর্তে পরীক্ষার খাতায় রোল নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তনের স্বপক্ষে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং সর্বপ্রথম অনার্স ও এম.এ. পরীক্ষায় এ নিয়ম প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এরপর এরই অনুকরণে তিনি তৎকালীন আই.এ. এবং বি.এ. পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখা রহিত করে রোল নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তন করেন।

২. সে সময় হাই মাদরাসা ও মাধ্যমিক মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হতে পারতো না। তিনি মাদরাসা শিক্ষার উক্ত দু'স্তরের শিক্ষার মান উন্নীত করেন। ফলে মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্ররাও কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করে।

৩. উপমহাদেশের স্কুল-কলেজে ধর্মীয় মৌলভীর কোন পদ ছিল না। তিনি প্রত্যেকটি স্কুল-

---

৫৮. তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলা হয়– 'As a temporary epedient the assistant Director of public Instruction for Mohammadan Education has been, with the permission of the Govt. entrusted in adition to his own work, with a protion of the duties of the Assistant Director of public Instruction. This arrangement was made on the leutative basis when Khan Bahadur Ahsanullah Joined this office in July last year... to relive the Assistant Director of public Instruction of the overhelming mass of filework which to his lot. Note- Proceeding of Govt. of Bengal Education Department, August, 1926.

৫৯. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

কলেজে মৌলভীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের বৈষম্য রহিত করেন।

৪. উর্দুকে তখন Classical Language হিসেবে গণ্য করা হত না। ফলে পশ্চিম বঙ্গে উর্দুভাষী ছাত্রদের অসুবিধা হত। তাঁরই প্রচেষ্টায় উর্দু Classical Language হিসেবে পঠিত হয় এবং উর্দু সংস্কৃতির স্থান অধিকার করে।

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উক্ত কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন।

৬. তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় কলকাতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। এর ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও মুসলিম ছাত্রদের জন্য 'বেকার হোস্টেল', 'টেলার হোস্টেল', 'ফুলার হোস্টেল', 'কারমাইকেল হোস্টেল', 'মুসলিম ইন্সটিটিউট' কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজশাহীর 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণ তাঁর একটি অবিস্মরণীয় অবদান।

৭. সরকার মুসলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উপর ন্যস্ত করে। ফলে বহু মক্তব, মাদরাসা, মুসলিম হাইস্কুল ও কলেজ তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও অমুসলিম স্কুলে মুসলিম শিক্ষকের নিযুক্তি এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগও তাঁর হাতে ন্যস্ত ছিল। এ সুযোগে তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকদের লেখা পুস্তক ব্যবহারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তৎকালীন মখদুমী লাইব্রেরী, প্রোভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার পেছনেও তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার একান্ত প্রচেষ্টায় স্কুল-কলেজে মুসলিম বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হয় এবং দরিদ্র মুসলিম ছাত্রকে বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া মুসলিম মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিভিন্ন স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।[৬০]

এভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পশ্চাদপদ বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক

---

৬০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৭।

ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর সময়ের অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের মত গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে না দিয়ে তিনি সমাজ সংস্কার এবং শিক্ষা বিস্তারের মহৎ ও দুঃসাধ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙালী মুসলমান সমাজকে শিক্ষার আলোয় উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে অনেকাংশে সফল হন। তাঁর এ অবদান ও কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা

মানুষ মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি-আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ হচ্ছেন আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানে সমৃদ্ধ মনীষীরা। তারা জ্ঞানী ও সত্যদ্রষ্টা। সে জ্ঞান ও দ্রষ্টতা দিয়ে তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন সমাজ, সংঘ, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং মানব প্রাণকে। মানুষই তাঁর প্রিয় সৃষ্টি। যে মানুষ তাঁর মহিমান্বিত ইচ্ছাকে উপলব্ধি করতে পেরেছে, ধ্যানে-জ্ঞানে শিক্ষায় তিনিই হয়ে উঠতে পেরেছেন মানবরূপী মহামানব। হতে পেরেছেন উন্নত, আদর্শ, সৃজনশীল মানুষ। যে মানুষ মনন, মেধা ও অধ্যাত্ম সাধনা দিয়ে স্রষ্টার সৃজনশীলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন তিনিই মানবাদর্শের প্রতিভূ। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সেই উন্নত সৃজনশীল মানুষের এক দুর্লভ মানুষ। যিনি জ্ঞানাতীত অনন্ত সত্তার সঙ্গে জ্ঞান-কর্ম ও প্রেমযোগে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করেননি। প্রেমধর্ম ও সেবাধর্মে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। সেবাধর্ম থেকে তাঁকে কখনো বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি।[৬১] তাই এ মহান পুরুষ তাঁর পরিচ্ছন্ন, উদার ধর্ম ও সমাজ চিন্তার আলোকে 'সমগ্র মানব সমাজের উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের মহান দায়িত্ব'[৬২] নিয়ে ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা করেন।[৬৩] 'স্রষ্টার 'ইবাদত ও সৃষ্টের সেবা'–এ মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সামনে রেখেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নেতৃত্বে ধর্মীয় সেবামূলক এ মিশনের কর্মকাণ্ড নির্ণীত হয়েছিল।[৬৪]

---

৬১. প্রফেসর মুহাম্মদ মুসা আনসারী, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ১৪ পৌষ, ১৪০৩ বাংলা, পৃ. ৯।

৬২. *বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৬১-১৯৬২*, সাতক্ষীরা : নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. অনুল্লেখিত।

৬৩. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮; মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬; *মহৎ জীবন*, পৃ. ২৫।

৬৪. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২। এ মিশন সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেই বলেছেন– 'এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের কথা উল্লেখযোগ্য। দুঃস্থের সেবা করাই উক্ত মিশনের লক্ষ্য। ইহার দ্বারা কত হাসপাতাল, শিক্ষামন্দির, পাঠশালা প্রস্তুত হইতেছে। আর আমরা নিজের সেবায় দিবা-রাত্র ব্যস্ত।

এ মিশন একটি কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হত। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মিশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৩৫-১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁরই প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মিশন পরিচালিত হতে থাকে। তিনি হিদায়াতের নূর দ্বারা অবিশ্বাসের ও অজ্ঞানতার আঁধার দূর করে ঈমান ও ইসলামের প্রতি মানব সমাজকে আগ্রহী করার মিশনে সারাটি জীবন কাটিয়ে অমর হয়ে আছেন।[৬৫] মিশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেছেন :

> ১৯৩৫ সনের ১৫ই মার্চ নলতা গ্রামে একটি মিশন স্থাপিত হয় এবং উহা উক্ত মৌলভী ছাহেবের পরামর্শ মতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহ্ছানিয়া মিশন নামে অভিহিত হয়। বলিতে কি এ যাবৎ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আমার নাম প্রদত্ত হয় নাই। নলতার খোদাপরায়ণ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি নির্দিষ্ট হয় এবং মেম্বরগণের সাহায্যের দ্বারা মিশনের পরিচালনা কার্য সম্পন্ন হইতে থাকে। এই গরীবকে উক্ত মিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয় এবং এম. জওহর আলী সাহেব সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন। জনাব মোঃ কুচলউদ্দিন খান ও মোঃ সুলতান আলী সহকারী সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেন। নলতা মিশনের শাখা নানা স্থানে স্থাপিত হয় এবং স্থানীয় মেম্বরগণ দ্বারা উহাদের কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।[৬৬]

মিশনের প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে। মিশনের সদস্যগণ নিঃস্বার্থভাবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মৃতদেহের সৎকার করেছেন, নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন, কলেরা-বসন্ত রোগীর পাশে বসে রোগীর সেবা করেছেন এবং ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করেছেন। যে কোন মহামারী মোকাবেলা করেছেন, শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। এভাবে আহ্ছানিয়া মিশন নিঃস্বার্থে পরোপকারে ব্রতী হয়েছে।[৬৭] আহ্ছানিয়া মিশনের যে অগ্রযাত্রা একটি পল্লীর নিভৃত কোণে শুরু হয়েছিল তা এ পল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমান্বয়ে এ মিশনের বিস্তার ঘটে গ্রাম থেকে শহরে, দেশে এবং

মোছলেম সমাজে এই অভাব দেখিয়া 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামে একটি সমিতি গঠন করা হইয়াছে। অপরের খেদমত করাই ইহার উদ্দেশ্য-অন্য উদ্দেশ্য নয়। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার শিক্ষা ও দীক্ষা*, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন, ৩য় সং, ১৯৬৮, পৃ. ৩৮।

৬৫. আফতাব উদ্দিন আহমদ, প্রবন্ধ : মহাপুরুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আল-আহ্ছান*, ৮ম বর্ষ সংকলন, জানুয়ারী- ডিসেম্বর ১৯৯২, পৃ. ২৭।

৬৬. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৬৭. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫।

বিদেশে। বর্তমান বাংলাদেশে এবং বিদেশে মিশনের শাখা মানবতার সেবায় নিয়োজিত।

আহ্ছানিয়া মিশন বিগত ৬৭ বছর সামাজিক জীবন গঠন, নৈতিক চরিত্র গঠন, সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষার প্রসার, জনসম্পদ উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এ মিশনের প্রধান কার্যালয় (নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন) সাতক্ষীরা জেলার নলতা গ্রামে অবস্থিত। সকল শাখা মিশনের মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কার্যক্রম জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে :

> অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মসংস্থান, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সেনিটেশন, বৃক্ষরোপন, গৃহসংস্থান, কারিগরী শিক্ষা, সার্বিক সমাজ উন্নয়ন, শিক্ষা উপকরণ তৈরী, গণশিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গ্রন্থ উন্নয়ন ও বন্টন, বস্তি এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সেনিটেশন, এতদসংক্রান্ত গবেষণা, জরিপ ও মূল্যায়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মিশন ইতোমধ্যে আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আহ্ছানউল্লা ইন্সটিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, তোকেশনাল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট ফর ওয়ার্কিং চিল্ড্রেন, আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউট হাউজ, আহ্ছানিয়া মিশন ইন্সটিটিউট অফ হিউম্যান রিসোর্চ ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া চিকিৎসা সেবা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আহ্ছানিয়া মিশন ক্যান্সার ও জেনারেল হাসপাতাল।[৬৮]

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারী এ মিশন 'পূর্ব পাকিস্তান গভর্নমেন্ট সোস্যাল ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি' থেকে ৩১৭ নম্বরে রেজিস্ট্রিভুক্ত হয়।[৬৯] অদ্যাবধি আহ্ছানিয়া মিশন 'সৃষ্টের সেবা ও স্রষ্টার ইবাদত'–এ মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে মানবপ্রেম ও ইসলামী আদর্শ প্রচার-প্রসার এবং নানাবিধ সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ লক্ষ নর-নারী তাঁর জীবনাদর্শে নিজেদেরকে গঠন-মানসে এবং তাঁরই প্রদর্শিত কর্মপন্থাকে আঁকড়ে ধরার অভিপ্রায়ে মিশনের সেবাশ্রমে ঠাঁই নিয়েছে।[৭০]

---

৬৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*, পৃ. অনুল্লেখিত।

৬৯. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, পৃ. ৩৭।

৭০. আহ্ছানিয়া মিশন সম্পর্কে মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা লিখেছেন– 'খেদমত করাই মিশনের একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা খাদেম হইতে ভালবাসি। পীর সাজিয়া অপরের খেদমত গ্রহণ করা অপছন্দ করি। স্থানে স্থানে সেবক-সমিতি গঠন করিয়া জনসাধারণের সেবায় জীবনকে নিয়োগ করাই আমাদের অভিপ্রেত। আমরা সমাজের আশীষ চাই, যেন সারা জীবন সেবায় ব্রতী থাকিতে পারি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অত্যন্ত ছোট পরিসরে কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর নিষ্ঠা ছিল, নিবেদন ছিল, সততা ছিল, দূরদৃষ্টি ছিল এবং ছিল প্রজ্ঞা। সে কারণে তাঁর প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠানটি আজ একটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হতে পেরেছে। মিশনের সাধারণ সম্পাদক যথার্থই বলেছেন :

> যে সমাজসেবার বীজ তিনি তাঁর নিজের গাঁয়ে বপন করেছিলেন তা আজ মহিরূহে পরিণত হয়েছে, পল্লবিত হয়েছে। আজ আমরা বিস্মিত হই তাঁর পবিত্র নামের সাথে যুক্ত 'আহ্ছানিয়া মিশন' এতদূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে যে, দেশ এবং বিদেশে এর ১১৭টির বেশী শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটি আমাদের কাছে একটি বিস্ময়কর তথ্য পরিসংখ্যান বলে মনে হয়।[৭১]

রচনাবলী

মানুষ তাঁর কর্ম ও কৃতিত্বের মাঝে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন এ প্রকৃতির একজন বিরল প্রতিভাসম্পন্ন কৃতিত্ববান পুরুষ। এ নিষ্ঠাবান, আদর্শ মানব অন্যের জীবনকে আলোকিত করার যে মহান আদর্শের দীক্ষা নিয়েছিলেন তা তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে প্রদীপস্তম্ভের ন্যায় উজ্জ্বল করে রেখেছে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী যুগে অনেক খ্যাতনামা মুসলিম সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টায় আন্তরিক হয়ে ওঠে।[৭২] এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন অন্যতম। আধুনিক রাষ্ট্র, রাজনীতি, শিল্প-সংস্কৃতির সাথে তখন বাংলার মুসলমানদের চেতনায় শিক্ষা, ধর্ম ও কুর'আন-সুন্নাহর জ্ঞানও অনুশীলন যে একান্ত অপরিহার্য ছিল সেটি তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তাই তিনি তাঁর লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের আদর্শ, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, সৃষ্টির রহস্য, স্রষ্টার মহত্ত্ব, রাসূল (স.)-এর আদর্শ জীবন, ধর্ম-কর্ম ও মানবিকতাকে জীবনের পথ ও পাথেয় হিসেবে আঁকড়ে ধরতে প্রণোদনা সৃষ্টি করেছিলেন দেশের এক প্রান্ত

আমরা খাদেম হইয়া থাকিতে গৌরব বোধ করি। সাম্য, একতা ও ভ্রাতৃত্ব আমাদের চরম লক্ষ্য। শ্রমিক বেশে রাস্তা তৈরী করিব, আর সেই রাস্তা আশেকের পদ-ধূলি বক্ষে লইয়া চরিতার্থ হইব, ক্ষুদ্র আমরা-মহাদরবারে শোকরিয়া আদায় করিব। খাদেম হইয়া আমরা মানুষের মনকে জয় করিব, বক্তৃতার দ্বারা নয়-কার্য্যের দ্বারা। আমরা ভিক্ষুক বেড়ে চাউল কুড়াইয়া দুঃস্থের দেহে কাপড় যোগাইব, আমরা দরুদ শরীফ আবৃত্তি করিয়া ব্যাধি-পীড়া অপনোদন করিব, আমরা প্রেমের পথ দিয়া ছোট বড় সবাইকে সঙ্গে লইয়া সত্যময়কে অনুসন্ধান করিব, সত্যই আমাদের সহায় হইবে, লোকের ভ্রুকুটী আমাদিগকে দমাইতে পারিবে না। আমাদের পথের সম্বল হইবে–'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', আমীন!' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার শিক্ষা ও দীক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫-২৬।

৭১. ড. আবুল আহ্ছান চৌধুরী, নিবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যসেবী এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ২০০২, পৃ. ৫।

৭২. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

থেকে অপর প্রান্তের মানুষের কাছে।[৭৩] এর জন্য তিনি নিজ জীবনের সকল সুখ, আরাম-আয়েশ পরিত্যাগ করে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সেবায় উৎসর্গিত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের Physical ও Spiritual মুক্তির মাঝেই নিহিত রয়েছে ইসলামের শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূলনীতি। এজন্য যেমন চাই জ্ঞানের সাধনা তেমনি ধ্যানের অনন্ত রাজ্য অর্থাৎ ধুলির ধরণী থেকে অসীম অনন্ত লোকে আরোহণ করে লাভ করতে হবে সৃষ্টি ও স্রষ্টার সত্য জ্ঞান। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সেভাবেই তাঁর কর্ম ও লেখনীর মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন।[৭৪] তাঁর জীবনের পরিধি লক্ষ্য করলে দেখা যায় সাহিত্য চর্চার ব্যাপ্তি সর্বাধিক। তাঁর শিক্ষা জীবনের স্থিতিকাল বাইশ বছর (১৮৭৩-১৮৯৫), চাকরি জীবন চৌত্রিশ বছর (১৮৯৫-১৯২৯), অবসর জীবন ছত্রিশ বছর (১৯২৯-১৯৬৫), আর সাহিত্যিক জীবন বিস্তৃত ষাট বছর ধরে (১৯০৫-১৯৬৫)। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রথম গ্রন্থ 'পদার্থ বিদ্যা' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু লক্ষ্য করলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, জাতি ও সমাজ গঠনের একটি মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। তবে চাকরি জীবনে তাঁর মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধের সংখ্যা ১০৮টি। এগুলোর বিষয়ভিত্তিক নাম ও সংখ্যার তালিকা এখানে তুলে ধরা হল[৭৫] :

সারণী–০৪

১.	আল কুর'আন ও আল হাদীস বিষয়ক	৯টি
২.	জীবনী বিষয়ক	২০টি
৩.	ইতিহাস বিষয়ক	১৪টি
৪.	ইসলামী বিধান বিষয়ক	১৭টি
৫.	স্কুল-মাদরাসার পাঠ্য বিষয়ক	১১টি
৬.	শিশু সাহিত্য বিষয়ক	১০টি
৭.	দর্শন বিষয়ক	৩টি
৮.	ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক	২টি
৯.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতি বিষয়ক	৩টি
১০.	আহ্ছানিয়া মিশন বিষয়ক	২টি

৭৩. প্রবন্ধ : যে আলো আলোর অধিক, *আল-আহ্ছান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৭৪. ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সাহিত্য ভাবনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২১ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯, পৃ. ৩।

৭৫. বাংলা একাডেমী সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী প্রেস, ১৯৮৪, পৃ. ৪৯-৫০; *আল-আহ্ছান*, ১৫তম বর্ষ সংকলন, ফেব্রুয়ারী ২০০০, পৃ. ৩১; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৫।

১১.	তাসাউফ বিষয়ক	৩টি
১২.	পত্র সংকলন	২টি
১৩.	বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা বিষয়ক	২টি
১৪.	স্বাস্থ্য বিষয়ক	১টি
১৫.	ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক	১টি
১৬.	কবিতা	১টি
১৭.	অগ্রন্থিত প্রবন্ধ	৭টি
	মোট	১০৮টি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার রচনারীতি সহজে পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাঁর ভাষা সংযত ও শান্ত। তাঁর লেখায় কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও সে উচ্ছ্বাসের বন্যায় কখনো বক্তব্য ফিকে হয়ে যায়নি। তাঁর লেখায় শব্দনির্বাচনে, উপমা ও রূপকের ব্যবহারের মধ্যে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ বাস্তবতার মধ্যে লেখকের অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং নিগূঢ় রহস্যের স্পষ্টতা ত্বরান্বিত করেছে। আবার কোথাও এই বাস্তবতার সাথে অনুপম কবি প্রতিভা সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব ভাব পরিগ্রহ করেছে। বিশ্বপ্রকৃতির মহিমার প্রতি হযরত খান বাহাদুর আহছানউল্লার দৃষ্টি চিরনিবদ্ধ ছিল এবং এ দৃষ্টিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন প্রকৃতি স্রষ্টা, জীবস্রষ্টা, সকল সৃষ্টির স্রষ্টার উদ্দেশ্যে।[৭৬] তাঁর রচনা পদ্ধতি বিশ্লেষণপ্রবণ মনোভাবের দরুন হয়ে উঠেছে ঐতিহাসিক পদ্ধতি ও তুলনামূলক বিচারের ধারাবাহী। বক্তব্য-ব্যাখ্যায় তিনি অতীত মধ্য বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিত গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

ভাষা সৈনিক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সাহিত্য ভাবনার পুরো অংশ জুড়ে রয়েছে দেশ, ভাষা ও মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল। ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট। তিনি বাংলা ভাষা সম্পর্কে, মাতৃভাষা সম্পর্কে, শিক্ষার মাধ্যম কি হওয়া উচিত সে সম্পর্কে যে মতামত পেশ করেছিলেন তা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ ও যুগান্তকারী। তিনি বলেছেন :

> এতকাল পর্যন্ত মাতৃভাষার কূটতর্ক লইয়া সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। উর্দু আমাদের মাতৃভাষা মনে করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের পরিপুষ্টির জন্য কেহ অগ্রসর হন নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ সে তর্ক মিটাইয়া দিয়াছে। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে

৭৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪, পৃ. ২১৬।

বঙ্গ ভাষায় সাহিত্য রচনা করা আবশ্যক। বঙ্গভাষা বলিলে একটি অবিচ্ছিন্ন ভাষা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, হিন্দু মোছলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বঙ্গভাষা, আবার কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম ও পূর্ব বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক। ভাষার যতই ভেদ হইবে, শ্রেণীগত পার্থক্য ততই বৃদ্ধি পাইবে, জাতীয় জীবনের ততই লোপ হইবে। সাহিত্যের ততই অবনতি ঘটিবে।[৭৭]

সাহিত্য ভাবনা সম্পর্কিত একটি দীর্ঘ অভিভাষণের মধ্যে তিনি একথা বলেছিলেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ২১ এপ্রিলে লিখিত 'বঙ্গভাষা ও মোছলমান সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণটি তিনি পাঠ করেছিলেন 'যশোহর খুলনা সিদ্দিকিয়া সাহিত্য সমিতি'র এক বিশেষ অধিবেশনে। এ কথাগুলো তিনি আমাদের জন্য একটি ধ্রুবতারার মত দিক-নির্দেশনা। এর অনেক পরে আমরা ভাষা আন্দোলন করেছি। আমাদের মাতৃভাষার জন্য সংগ্রাম করেছি। কিন্তু আমরা দেখি যে, আমাদের সমাজের নেতৃবৃন্দ ভাষার প্রশ্নে দ্বিধান্বিত ছিলেন, তখন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল।[৭৮] তিনি সাহিত্য চর্চার প্রয়োজনীয়তা, মুসলমানদের বঙ্গভাষায় সাহিত্য চর্চা সম্পর্কে কৌতুহলী করে তোলা, ধর্মীয় বিষয় ও মুসলমান মনীষী ও সাধকদের বাংলা ভাষায় জীবনী রচনা সম্পর্কে মতামত ও সাহিত্য চর্চার উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সে যুগের বাঙালী মুসলমানদের জন্য বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকার করা এক দুরূহ ব্যাপার হলেও বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোঁড়ামী মুক্ত। বাঙালী মুসলমানদের জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বাংলা ভাষার উন্নতিকে তিনি অপরিহার্য বলে মনে করতেন।[৭৯] মাতৃভাষার প্রতি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। তিনি

---

৭৭. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী (বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য)*, ৭ম খণ্ড, ঢাকা : জয় প্রকাশনা, ১৯৯৪, পৃ. ৩০।

৭৮. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : সমাজ সেবক, সমাজ সংস্কারক, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, পৃ. ৫-৬।

৭৯. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩১। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন– 'বাঙ্গালা ভাষাকে জাতীয়ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে ও তদনুসারে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, সামাজিক উপন্যাস, তাপসদিগের জীবন সমস্তই আরবী, পারসী ও উর্দূ ভাষায় লিখিত, যে পর্যন্ত এতগুলি প্রকৃষ্ট বঙ্গভাষায় লিখিত না হইবে, যে পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানের নিজস্ব ভাষা বলিয়া পরিচিত না হইবে, সে পর্যন্ত বাঙ্গালা সাহিত্য জাতীয় শক্তি উজ্জীবিত করিতে সক্ষম হইবে না। সাহিত্যিকগণ যতই এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন, মুসলমান ছাত্র ততই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, স্বীয় জীবন গঠনে প্রবৃত্ত হইবে ও জাতীয় উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিব।... মাতৃভাষার স্থলে উর্দূ, পারসী এমনকি আরবীও অধিকার করিতে সমর্থ নহে।' দ্র. মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৮৭৩-১৯৬৫*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ৮৬।

মনে করতেন, ভাষার সাথে সাহিত্যের একটি নিগূঢ় সম্পর্ক বিদ্যমান। ভাষার উন্নতির মাধ্যমেই সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হয়।[৮০]

তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন। কেননা বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা, তিনি মাতৃভাষার চর্চা এবং সাহিত্য সাধনাকে জরুরী মনে করেছেন। তবে পরামর্শ দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেননি, দৃষ্টান্ত স্থাপনেও তিনি এগিয়ে এসেছেন। মুসলমানদের ধর্ম, ইতিহাস, কর্ম, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির কথা তিনি বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর শতাধিক গ্রন্থে অত্যন্ত সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন।[৮১] মাতৃভাষার প্রতি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অনুরাগ তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতে স্পষ্ট।[৮২] তখনকার অধিকাংশ অভিজাত মুসলমানদের পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা এবং দৈনন্দিন কাজে উর্দু ও ফার্সীর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নে বাঙালী হিন্দু-মুসলমানকে এগিয়ে আসার আহবান জানালেন। মাতৃভাষা চর্চাকে তিনি সকল প্রচার সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে স্থান দিয়েছেন।

মাতৃভাষা তথা বঙ্গভাষা সম্পর্কিত উপরোক্ত কথা তিনি উচ্চারণ করেছেন আজ থেকে ৮৪ বছর পূর্বে, যখন অবিভক্ত ভারতে সাম্প্রদায়িক বৈষম্য প্রকট এবং সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় মুষ্টিমেয় মুসলমানের দীপ্ত পদচারণা লক্ষ্যণীয়। কাজেই একজন যুগোপযোগী পুরুষ হিসেবে, আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ হিসেবে, সর্বোপরি একজন আদর্শ ভাষা সৈনিক হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে আমরা আবিষ্কার করতে পারি।

সম্মান ও উপাধি লাভ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার যশ, খ্যাতি, কর্ম, অবদান, জীবনবোধ একটি শতাব্দীর অক্ষয় কীর্তি। তাঁর সমগ্র জীবন ছিল দৃষ্টান্তমূলক। তিনি একজন দক্ষ, কর্মঠ, দায়িত্বশীল, কর্তব্যনিষ্ঠ ও নিবেদিতপ্রাণ সরকারী কর্মকর্তা ছিলেন। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতার স্বীকৃতি তিনি অল্প সময়ের মধ্যেই

---

৮০. তাই তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে ঘোষণা করেন– 'যে জাতির সাহিত্য নাই, সে জাতির আত্মসম্মান নাই। যে জাতির আত্মসম্মান নাই, সে জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত; যদি মুসলিম বলিয়া পরিচয় দিতে হয়, যদি অন্য জাতির সমকক্ষতা করিতে হয়, তবে মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাবে ভাবাপন্ন করিতে হইবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি একান্ত আবশ্যক।' দ্র. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ৭ম খণ্ড, পৃ. ২৫-৩০।

৮১. প্রবন্ধ : অমর মনীষী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৮২. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৯।

অর্জন করেন।[৮৩] শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকরি জীবনের প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে 'খানবাহাদুর'[৮৪] উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি চাকরিতে প্রবেশের মাত্র ১৫ বছরের মধ্যে এ সাফল্য অর্জন করেন। যাকে একটি বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে উপস্থাপন করা যায়। অন্যদিকে লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটির অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তাঁর জ্ঞান-গরিমা, বহুমুখী ও সফল কর্ম, শিক্ষা ও লেখক জীবনের পরিচয় এড়াতে দেয়নি। গুণগ্রাহী সোসাইটি তাঁদের জ্ঞানী-গুণীদের খাতায় তাঁর নাম অচিরেই লিপিবদ্ধ করে। এর ফলে তিনি ১৯১১ সালে Royel Society for the encouragement of arts, Manufactures and commerce-এর সদস্যপদ লাভ করেন।[৮৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'প্রথম মুসলিম সিনেট সদস্য' মনোনীত হন এবং পরে 'সিন্ডিকেটের সদস্য' নির্বাচিত হন। তাছাড়া তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলা অনুষদের ফেলো' ছিলেন।[৮৬] সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করে। তাই এ পদের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এক দশকেরও বেশী সময় ধরে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের

---

৮৩. *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৮৪. *The Bengal Civil list (Correct upto 1944)*, P. 442.

৮৫. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮; *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, 'আহ্ছানউল্লা খানবাহাদুর শব্দ দ্রষ্টব্য'। তাঁকে প্রদত্ত সোসাইটির সনদ পত্রটির ভাষা ছিল–

Sir, 28th June, 1911.

I have the honour to inform you that, you are this day elected a member of Royel Society for the encouragement of arts, manufactures & commerce.

Society's House, Adelphi, London.

Khan Bahadur Moulvi Ahsanullah M.A.

Iam, Sir

Your very obedient servt,

H.J. Wood. Secy.

৮৬. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ২৩।

(বর্তমান সিনেট) মেম্বর' ছিলেন।[৮৭] তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি লগ্নে ড. নাথান সাহেবের অধীনে শিক্ষা কমিটিরও মেম্বর ছিলেন।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর সেবার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমী তাঁকে 'ফেলো' সম্মানে ভূষিত করে।[৮৮] বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ডঃ এনামুল হক এ সম্পর্কে একাডেমী পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন পেশ করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে একটি পত্র লেখেন।[৮৯]

---

৮৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

৮৮. ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৪ মে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্ম পরিষদের ৩২তম সভায় তাঁদের পুরস্কার উপসংঘের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে– In view of the literary services rendered to the Bengali literature in general and Bengali literature of East Pakistan in particular, it is recommended that the following literary persons be offered the honour of being the Fellow of Academy : 1. Khan Bahadur Ahsanullah, 2. Shaikh Reazuddin Ahmed, 3. Shaikh Habibur Rahman, Sahitya Ratna, 4. Nurunnesa Khatun, Vidya vinodini.

৮৯. দ্র. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

পত্র সংখ্যা ৮০২২-বা, এ

প্রেরক : পরিচালক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জনাব, বিগত ৪ঠা ও ৫ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২-তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিরূপে একাডেমী আপনাকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির 'ফেলো' বা 'সম্মানিত সদস্যের' মর্যাদা দিয়া নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

অতঃপর, আপনি যথানিয়মে একাডেমীর যাবতীয় সুখ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আপনার বিশেষ অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে আবশ্যক কাগজ-পত্র পাঠাইলাম। আশা করি, একাডেমী আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। ইতি–

আপনার একান্ত অনুগত

পরম শ্রদ্ধেয়, জনাব খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবকে লিখিত

স্বাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক

৯, আরমেনিয়ান স্ট্রীট, ঢাকা।

দ্রঃ প্রবন্ধ : একাডেমীর কথা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪র্থ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭ বাংলা, পৃ. অনুল্লেখিত।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সত্যের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা, জ্ঞানের সাধনা, কর্মের মধ্যে আত্মপ্রকাশ, দ্বীন ইসলামের মর্মার্থ প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে এক অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছেন। সমাজ সেবা, সমাজ সংস্কার, বিশেষ করে দ্বীনি প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে যান[৯০] তাঁর স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ পুরস্কারে (১৪০৫ হি. মরণোত্তর) ভূষিত হন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সকলের কাছেই ছিলেন গ্রহণযোগ্য এবং প্রিয় সুহৃদ ও সম্মানের পাত্র। কোন নীচুতা, হীনতা, হিংসা, দ্বেষ, জাতিবিভেদ, বৈষম্য তাই কখনো তাঁকে স্পর্শ করেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'আমি মুসলিম, নিখিল বিশ্বই আমার স্বদেশ'। দৃষ্টিভঙ্গির এ ব্যাপকতাই তাঁকে একজন মনীষীতে রূপান্তরিত করেছিল।

ধর্ম ও অধ্যাত্ম জীবন

ধর্ম একটি অদৃশ্য সেতু, যা মানুষে মানুষে এক অলৌকিক বন্ধন সৃষ্টি করে। তারপর তা দেশ ও জাতিকে অতিক্রম করে সীমা থেকে অসীমে সংযোগ ঘটায়। কাঙ্খিত মঞ্জিলে যার চূড়ান্ত অভিষেক। কিন্তু সে পথ বড় দীর্ঘ, দুর্গম ও কন্টকাকীর্ণ। এ পথ কেউ একাকি পাড়ি দিতে সমর্থ নয়। কেননা এ পথ অনন্তের। যার অসীমে আছেন মহান আল্লাহ্ তা'আলা, মাঝে হযরত মুহাম্মদ (স.), আর এক তীরে আছেন পীর-মাশায়েখ, দরবেশ, আউলিয়া ও সূফী-সাধকগণ। মানুষের জন্যই ধর্ম, ইসলামও মানুষের জন্যই। ইসলাম স্রষ্টায় পূর্ণ আত্মনিবেদন ও সৃষ্টের সেবায় আত্মোৎসর্গ করারই অপর নাম। ইসলামের ভিত্তি ঈমান। আর রূপ হল আখলাক। নবী, পয়গম্বর ও পীর যার গ্রহ নক্ষত্র। এর আকর্ষণ বিকর্ষণে আবর্তিত মানব প্রবাহ। ইসলাম এদেশে বা উপমহাদেশে সত্যিকার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে সূফী সাধকদের মাধ্যমে। যারা মানবকল্যাণের জন্য তাঁদের সকল আনন্দ, ভোগস্পৃহা, লালসাকে বিসর্জন দিয়েছেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন সেই ব্যতিক্রমী দলেরই একজন।[৯১] তাঁর জন্মের পরে পরিবারের আর্থিক উন্নতি ও পারিবারিক কাঠামোর সৌকর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বাল্যকাল থেকেই কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।[৯২]

---

৯০. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সীরাতুন্নবী (সঃ) ১৪০৭ হিজরী উদযাপন কমিটি ও সীরাতুন্নবী স্মরণীকা পরিষদ কর্তৃক নভেম্বর ১৯৮৬ খ্রী., প্রকাশিত 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার' (১৪০৫ হিজরীর পুরস্কার প্রাপ্তদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি) শীর্ষক স্মরণীকা, পৃ. ১-২।

৯১. এ.এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

৯২. তাঁর ছাত্র জীবনে মুনশী তমিজউদ্দিন আহম্মদ সাহেব এক চিঠিতে বন্ধু মাজেদ বক্শকে লিখেছিলেন– 'তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি তোমার বন্ধুর জন্য একটি ভাল বাসা খুঁজিয়া দিতে বলিয়াছো। আমি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি ধর্মীয় আবহে ও ধর্মীয় কৃষ্টি-সভ্যতা লালনকারী পরিবারে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠেন। তাঁর পিতা ও পিতামহ উভয়েই বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। ফলে তাঁদের প্রভাব তাঁকে অধ্যাত্ম জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করে।[৯৩] চাকরি সূত্রে চট্টগ্রাম অবস্থানকালে তাঁর হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা বেড়ে যায়। নির্জনতা তাঁর খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। এ অবস্থা দেখে তাঁর পিতা-মাতা অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন। এক নিদারুণ ব্যাকুলতার মাঝে সময় অতিবাহিত করতে থাকেন। এ সময় তিনি বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও অলী-আউলিয়াদের মাজার অথবা চিল্লায় নিয়মিত যাতায়াত করে অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ করেও তিনি ঐশী প্রেমে বিভোর হন। তিনি দিবাভাগে যেমন সরকারী চাকরিতে একনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন তেমনি রাতেও পরমাত্মিক আলোচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন। এক রাতে স্বপ্নে এক মহাপুরুষের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। স্বপ্নের এ মহাপুরুষ 'হযরত গফুর শাহ্ আল হোচ্ছামী'[৯৪]র সাথে তাঁর প্রথম সাক্ষাত হয় ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে কুমিল্লার এক ডাকবাংলোয়। তিনি ডাকবাংলোতে সুগন্ধভরা বেলী ফুল নিয়ে আসেন এবং সেগুলো খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে উপহার দেন। তিনি চট্টগ্রামে গফুর শাহের কাছে সস্ত্রীক বায়আত গ্রহণ করেন।[৯৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর পীর-মুর্শিদ হযরত গফুর শাহ্ (র.)-এর সাথে হজ্জব্রত পালন করেন।[৯৬] স্বীয় পীরের সাথে হজ্জব্রত পালন করার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

তাহাকে অন্যত্র দিতে চাইনা, নিজের বাড়ীতেই তাহাকে স্থান দিলাম-তোমার অনুরোধ হেতু নহে-তাহার মধ্যে এমন কোন লালিত্য আছে যাহাতে আমি মুগ্ধ হইয়াছি। বালকটি আমারই সহিত থাকিবে।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৭।

৯৩. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও কর্ম, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬।

৯৪. তাঁর পূর্ব নাম ছিল হজরত সৈয়দ হাবিব আহমদ। 'আধ্যাত্মিক নবজীবন' লাভ করার পর তিনি গফুর শাহ্ নামে পরিচিত হন। হজরত গফুর শাহ্ ছিলেন পাটনামার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ও জনপ্রিয় স্যার সৈয়দ আলী এমামের জনৈক অতি আত্মীয় এবং ভারত বিখ্যাত মহাপুরুষ উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সাধক হাজী হাফেয সৈয়দ ওয়ারেছ আলী শাহ্ (র.)-এর যোগ্য শিষ্য। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে অধ্যাত্ম জীবন বেছে নেন এবং নিজের পরিধেয় ও পুস্তকাদি অগ্নিসংযোগ করে গৃহত্যাগ করেন। নগ্নপদে তিনি শত শত মাইল অতিক্রম করতেন। দিনে রোযা রাখতেন এবং সন্ধ্যাকালে দু'একটি গোল আলু খেয়ে তৃপ্ত থাকতেন। তিনি পদব্রজে ১৪ বার হজ্জ সমাধা করেছিলেন। দ্র. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১; এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

৯৫. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; মোঃ মালেকুজ্জামান *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, পৃ. ২৭-২৮।

৯৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ২৮; মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২।

ক্রমান্বয়ে তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করেন। প্রেমময়ের সেই মহান সত্ত্বার সাথে নিজেকে লয় করে দিয়েছিলেন। তিনি হুযুর (স.)-এর রওযা মোবারক যিয়ারতের বর্ণনা এমন সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় উপস্থাপন করেছেন, যা পাঠ করলে প্রতিটি মু'মিনের হৃদয়ে হুযুর (স.)-এর রওযা মোবারক যিয়ারতের সাধ জেগে ওঠে।[৯৭]

হজ্জ সমাপন করে দেশে ফিরে এসে তিনি চাকরি ক্ষেত্রে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এভাবে চাকরি জীবনের পুরোটাই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রস্তুতি পর্ব হিসেবে কাজ করে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি মানুষের রূহানী খেদমতের জন্য স্বগ্রামে ফিরে যান। কিন্তু তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ থাকলেও ভক্তপ্রাণ মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসতে শুরু করে এবং ক্রমাগত আগন্তুকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে তিনি একজন কামিল 'পীর'[৯৮] হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন।[৯৯] তবে তিনি গতানুগতিক ধারায় হুজরাখানায় বসে রূহানী তা'লিমের মাধ্যমে কর্তব্য সম্পাদন করেননি। নিজের সুখ-সম্ভোগের দিকে না তাকিয়ে বারো মাসের নয় মাস কাটিয়েছেন ইসলামের প্রচার-প্রসার, মুসলমানদের নৈতিক উন্নয়ন ও আর্তমানবতার সেবায় বঙ্গ-আসামের প্রত্যন্ত এলাকায়। তিনি তাঁর ভক্ত অনুসারী ও গুণগ্রাহীকে দিয়েছিলেন বন্ধুর স্থান। পীর

---

৯৭. তিনি লিখেছেন– 'অতঃপর মছজিদ নববীতে দাখিল হইলাম। ... মোয়াল্লেমসহ মহাদরবারে হাজীরা দিলাম। যাঁহার উদ্দেশ্যে সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র, ধন-দৌলত ত্যাগ করিয়া দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রম করিয়া নগ্ন মস্তকে, নগ্ন পায়ে ছুটিয়া আসিয়াছি জিয়ারত করিতে, নিজেকে উৎসর্গ করিতে, আজ সেই মহাজনের পদ-প্রান্তে খাড়া হইয়া কত ধন্য মনে করিতেছি, কত প্রাণ ভরা আবেগ জানাইতেছি, কত তপ্ত অশ্রুতে বক্ষঃ ভাসাইতেছি, কে তাহার ইয়ত্তা করিবেঃ আজ সকল চিন্তা বিদায় নিয়াছে, আজ স্বদেশ প্রেম সবই অন্তর্হিত। আজ সমস্ত বুকটি জুড়িয়া কোন মহাপুরুষের স্মৃতি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। প্রাণ চায় ঐ পদযুগলে রূহ উৎসর্গ করিতে, দেহকে সমর্পণ করিতে, সকল চিন্তা, সকল আশা, সকল ভরসাকে চিরতরে বিদায় দিয়া কেবল লুটিতে, কেবল অশ্রু প্রবাহে রওজা মোবারক ধৌত করিতে, কেবল ক্ষমা চাইতে, কেবল অপরাধ স্বীকার করিতে, নিজেকে কোরবান করিতে। ভাষা সে মনোভাব প্রকাশ করিতে অক্ষম, লেখনী লিখিতে অক্ষম, সমুদ্র কালি হইলেও সে হৃদয়াকাঙ্খা জ্ঞাপন করিতে অক্ষম। আজ সকল শ্রান্তির অবসাদের অবসান। ... আজ অশ্রুপ্রবাহ মায়া-দেহকে ভাসাইয়া কোন গভীর প্রেম-সমুদ্রে প্রবিষ্টঃ আজ অসত্য, অলীকতা, অপূর্ণতা, অক্ষমতা বিদায়-প্রাপ্ত। আজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার একত্র সমাহার। সে কি মনোরম দৃশ্য, কি অপার্থিব ভাব! কি অফুরন্ত আনন্দ! আজ প্রাণ চায় না বিদায় নিতে, আজ ইচ্ছা হয় না দূরে সরিতে, আল্–বেদা চাহিতে!' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮।

৯৮. 'পীর' শব্দের আভিধানিক অর্থ– 'বৃদ্ধ'। শব্দটি আরবী 'শেখ'-এর অনুরূপ। ব্যবহারিক অর্থে আধ্যাত্মিক জগতের পথপ্রদর্শক। আবার সূফী বলতে 'পীর'কেও বুঝায়। দ্র. Mohammad Mohar Ali, *History of the Muslim of Bengal*, V-IB, P. 403.

৯৯. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২।

ও মুরীদ এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অভিমত অত্যন্ত স্বচ্ছ, উদার ও নিরহংকার মনোভাবের পরিচয় বহন করে। এখানে তিনি পীরের সত্যিকার পরিচয়কে শুধু বিধৃত করেননি, মানুষের জীবনে পীর বা ধর্মগুরুর প্রয়োজনীয়তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১০০]

বংশগতভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ইসলামের প্রতি অনুগত ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি নিয়মিত নামায ও কুর'আন শরীফ পড়তেন। বার্ধক্যের ভারে শরীর বাঁকা হয়ে গিয়েছিল, কিছু লিখতে গেলে হাত কাঁপত, ঘর থেকে মসজিদ পর্যন্ত যেতে তাঁর খুব কষ্ট হত, তবুও তিনি কখনো নামায কাযা করতেন না।[১০১] তাঁর মতে নামায মানুষকে অমূল্য পুরস্কার দিতে পারে। তিনি শেষ জীবনে সর্বদা অযু সহকারে থাকতেন। জীবনে কখনো মাথার চুলে সিঁথি কাটেননি এ ভয়ে যে, যার ভেতরে সৌন্দর্য নেই, সিঁথি তাকে কি সৌন্দর্য দিতে পারে।[১০২] তাঁর জীবনের প্রতিটি সাফল্যকে আল্লাহর অশেষ রহমত বলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। বিশিষ্ট গবেষক ও গ্রাবন্ধিক সূফী মরহুম জুলফিকার হায়দার 'একটি আদর্শ জীবন' শিরোনামে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সম্পর্কে লিখেছেন :

> এ সূফী সাধকের সাথে আমার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ লাভের সুযোগ মাত্র তিন কিংবা চার বার, এর বেশী নয়। তা হোক, ধর্ম সম্পর্কে আমার যৎকিঞ্চিত উপলব্ধি থেকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে একজন উচ্চস্তরের 'আমিলুস সালিহা' যথার্থ ধার্মিক বলে মনে হয়েছে। কেননা ধর্মের মর্মবাণী মাত্র দু'টি কথায় নিহিত রয়েছে বলে জানি এবং আমি মানি। আর তা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ পালন করা এবং নিষেধ থেকে সযত্নে আত্মরক্ষা করা। তিনি তাঁর জীবনে নিখুঁত সুন্দররূপে তা বাস্তবায়িত করেছিলেন বলে আমি ধারণা পোষণ করি।[১০৩]

রাসূল (স.)-এর সুন্নাত তিনি আমৃত্যু যথাযথভাবে পালন করেছেন। রাসূল করীম (স.)-এর মানবিক গুণাবলী নিজ চরিত্রে প্রতিফলনের চেষ্টা করার ফলে আল্লাহর 'ইবাদত ও তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি

---

১০০. তাঁর মতে– 'পীরের কর্তব্য মুরিদের অন্তরে ঐশীশক্তি উন্মেষ করা। কোন পীর ঐশীশক্তি পয়দা করিতে পারেন না। তিনি কেবল খোদাপ্রদত্ত শক্তিকে উন্মেষ করেন। সকল লোহাতে অগ্নি নিহিত আছে, উহা সাধারণের দৃষ্টির বহির্ভূত। উক্ত লোহাতে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উদগম হয়, সেইরুপ খোদা সকল বান্দার হৃদয়ে তাঁর শক্তি গুপ্ত রাখিয়াছেন, উক্ত শক্তি মুহাব্বত ও ইবাদাত দ্বারা উন্মেষ করিতে হয়। আর এ জন্য প্রয়োজন সৎ শিক্ষকের। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

১০১. প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) : কিছু কথা কিছু স্মৃতি, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২-৩।

১০২. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

১০৩. প্রবন্ধ : একটি আদর্শ জীবন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

মানবকল্যাণে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে উৎসর্গ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি জীবনে কখনো দাড়িতে ক্ষুর লাগাননি এই খেয়ালে যে, যিনি তাঁর জীবনের আদর্শ সেই মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অসম্মান করা হবে। তিনি নিজেকে সর্বদা ক্ষুদ্রতম মনে করতে গৌরববোধ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল :

> আঁ-হজরতের (দঃ) ফরমান অনুসারে কাপড়ে যতক্ষণ তালি সহে, ততক্ষণ ইহা ব্যবহার করি এবং করিতেও আনন্দ অনুভব করি। তাছাড়া সুন্নাত পালন হেতু মনে এক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করি।[১০৪]

তিনি সুগন্ধি ফুল ভালোবাসতেন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি চরিত্র গঠনকে 'ইবাদতের অঙ্গ মনে করতেন এবং 'যার চরিত্র সুগঠিত নয় তার 'ইবাদত বেকার' বলে মনে করতেন। এই যুগশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের জীবনে নারী চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য যেরূপ পরিপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তেমনি খুব কম মানুষের জীবনেই দেখা যায়। সত্য, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা, মহানুভবতা, দয়া, ক্ষমাশীলতা, দরদ, মহত্ত্ববোধ, প্রেমানুভূতি, ধৈর্য্য, সাহস, সহনশীলতা, তাওয়াক্কুল, সহানুভূতিপরায়ণতা, বিনয়-নম্রতা ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর প্রকাশ নিজ জীবনে ঘটিয়ে তিনি নবী (স.)-এর ওয়ারিশের মর্যাদা অর্জন করতে পেরেছিলেন।[১০৫]

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চারিত্রিক গুণাবলী যে কোন মানুষকে তাঁর প্রতি সহজেই প্রলুব্ধ করত। তাঁর মধ্যে কি এক মোহিনী শক্তি ছিল, যার দ্বারা প্রথম দর্শনেই মানুষ মুগ্ধ হত, তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। তাঁর চেহারায় ছিল সৌম্যভাব আর অসাধারণ সৌন্দর্যের আলোকচ্ছটা। অনেকে তাঁকে একবার দেখেই সারা জীবনের জন্য ভালোবেসে ফেলত।[১০৬] তাঁর চেহারা ছিল গুরুগম্ভীর। কিন্তু কথা শুরু করলেই মনে হত একজন উচ্ছল প্রাণবন্ত মানুষ। এত দরদ, এতো ভালোবাসা

---

১০৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০।

১০৫. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ যথার্থই বলেছেন– 'ধর্মীয় সাধনার কোন স্তরে তিনি আরোহণ করেছিলেন তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে তাঁর অসংখ্য শিষ্য ভক্তবৃন্দের কাছে এ কথা স্পষ্ট উপলব্ধ হয়েছে যে, দুনিয়ার বিপদ সঙ্কুল বন্ধুর পথে এমনি একজন কান্ডারী সত্যিকারের শান্তিময় জীবনের সন্ধান দিতে পারেন।' দ্র. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : তাঁর আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৩।

১০৬. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪।

দেখে মানুষ আশ্চর্য হয়ে যেত। তিনি ছিলেন সদা সক্রিয়, গতিশীল কিন্তু শান্ত। কোন তাড়াহুড়া বা অস্থিরতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যেত না।[১০৭]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন দয়ালু, মৃদু ও মিতভাষী, পোশাক-পরিচ্ছদে তিনি অতি সাধারণ ও সহজ-সরল একজন ব্যক্তিত্ব। যথার্থ অর্থেই তিন ধার্মিক। তাঁর আচরণে মুগ্ধ হয়ে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। মুসলিম, হিন্দু, ইংরেজ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে তিনি ছিলেন বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।[১০৮] তাঁর নির্লোভ ও নিঃস্বার্থ কর্মপ্রেরণা সকলকে মুগ্ধ করত। চাকরি জীবনে একজন নিষ্ঠাবান, দৃঢ়চিত্ত ও সৎ কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও অহংকার ও প্রভুত্বজ্ঞাপক আচরণ তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি বিশ্বাস করতেন, বক্তৃতা দ্বারা মানুষ তৈরী হয় না। মানুষ তৈরীর জন্য চাই দৃষ্টান্ত। তিনি নিজে সকলের কাছে একটি মহাআদর্শের দৃষ্টান্ত ছিলেন এবং তাঁর ভক্তদেরকে দৃষ্টান্ত হতে উৎসাহিত করতেন। তাঁর প্রতিটি ভঙ্গি, প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের জন্য চিন্তা, বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির বিষয়।

তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী ও সকল ভক্তের সার্বিক কল্যাণের দিকে সর্বদা নজর রাখতেন। তিনি ছিলেন সকলের অভিভাবক, পথপ্রদর্শক। তিনি মানুষের একটু উপকার করতে সদা সচেষ্ট থাকতেন এবং পরোপকারেই তিনি প্রকৃত আনন্দ লাভ করতেন। কেউ পরামর্শ চেয়ে চিঠি লিখলে তাদের হতাশ করতেন না।[১০৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কেমন মানুষ ছিলেন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় যাদুঘরের মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সম্পর্কে অভিব্যক্তি' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন :

তিনি যে একজন বড় মাপের মানুষ ছিলেন তার অন্য একটা পরিচয়ের কথা বলতে চাই। আমার

---

১০৭. ড. আশরাফ সিদ্দিকী, প্রবন্ধ : একটি মহৎ জীবনের কথা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১০৮. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫।

১০৯. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মরহুম আব্দুল ওয়াজেদ খান চৌধুরী এ সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন– 'তাঁকে একটা চিঠি দিলাম ও আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে তাঁর নির্দেশ জানতে চাইলাম।... যা হোক এক সপ্তাহের মধ্যেই চিঠির জবাব এল। তাঁর নিজের হাতের লেখা এবং তাতে আমার অনুরোধ অনুসারে বেশ বিশদভাবে আমাকে পরামর্শ দিয়েছেন। এ সামান্য ঘনঘটা অনেকে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করবেন না। কিন্তু বহু দিনের অভিজ্ঞতায় এটাকে আমি মানব চরিত্রের একটি দুর্লভ বৈশিষ্ট্য বলে মনে করি। শুধু আমাকে নয়। যেই তার নিকট উপদেশ, নির্দেশ বা সাহায্য চেয়েছেন-কেউ হতাশ বা মনক্ষুণ্ন হয়ে ফিরেছেন বলে আমি শুনিনি। এমন কথাও কেউ বলতে পারবে না যে তাঁর নিকট থেকে রূঢ় বা অমার্জিত ব্যবহার কেউ পেয়েছেন। তাঁকে Every inch a gentleman বললে একটুও অত্যুক্তি হবে না'। দ্র. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১-৯২।

গ্রামের একজন পরিচিত মানুষ ছিলেন, তার নাম মীর শহীদ উদ্দীন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবের অফিসে ছোট একটা চাকরী করতাম। তিনি আমাকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ীতে পাঠাতেন প্রুফ নিয়ে। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি। তাঁর প্রুফটা তাঁকে দিয়েই তিনি দেখিয়ে নিতেন। সেই মীর শহীদ উদ্দীন আমাকে বলেছিলেন, আমি রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেই রবীন্দ্রনাথ বলতেন–'খোকা তুমি এসেছ, তোমাকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পাঠিয়েছেন, বড় ভাল মানুষ তিনি, তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। তাঁকে আমার আদাব জানিও। আগামীকাল এসে প্রুফটা নিয়ে যেও। আমি দেখে রাখব। এখান থেকে বুঝতে পারি কত বড় মাপের মানুষ ছিলেন তিনি। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছেও তাঁর আলাদা একটা মর্যাদা ছিল।[১১০]

আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিকতার অনুষঙ্গী কর্মবোধ, ধর্মাচরণের প্রতি উন্নাসিকতা ইত্যাদি বিষয় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ব্যক্তিত্বকে কৃত্রিম করতে পারেনি। ধর্মবোধ ও আধুনিকতার এক সুন্দর মিথস্ক্রিয়া দিয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর মোহনীয় ব্যক্তিত্ব।[১১১] ধর্মের ঐতিহ্য আর আধুনিকতার গতিময়তা তাঁর ব্যক্তিত্বকে করেছিল অনুকরণীয়। আপন ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে এমনভাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়ে প্রকারান্তরে তিনি মুসলমানদের একজন সত্যিকারার্থে এক 'রোল মডেল' তৈরী করে গেছেন।

ইন্তিকাল

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রায় ৯২ বছর জীবিত ছিলেন। ইন্তিকালের ৩ মাস পূর্বে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে অবস্থান করেন। অবশেষে তাঁরই নির্দেশে নলতায় নিজ বাসভবনে আনা হয়। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী বাংলা ১৩৭১ সনের ২৬ মাঘ মঙ্গলবার ১০টা ১০ মিনিটের সময় তাঁর পরিতুষ্ট আত্মা পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়।[১১২] অগণিত মানুষকে শোক সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন পর্দার অন্তরালে। শারীরিক তিরোধান তাঁর ঘটেছে সত্যি, কিন্তু যে তিরোধান মানুষের যশ, খ্যাতি এবং অবদানের বিলুপ্তি ঘটায় সে তিরোধান তাঁর ঘটেনি। আর সেই দিনটির স্মৃতিস্বরূপ প্রতি বছর তাঁর রওযা মোবারকে ৩ দিনব্যাপী 'ওরস'[১১৩] উদযাপিত হয়। এ ওরস শরীফ তাঁর শিষ্য ও ভক্তকুলের জন্য এনে দেয় আত্মশুদ্ধির এক সুবর্ণ সুযোগ।

---

১১০. প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সম্পর্কে অভিব্যক্তি, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫।

১১১. প্রবন্ধ : একজন সমাজ সচেতন মানুষ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ), *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

১১২. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১১৩. 'ওরস শব্দের অর্থ মিলন। পরিভাষাগত অর্থে নেয়া হয়েছে পরমাত্মার সাথে পূণ্যাত্মার মিলন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একজন যুগশ্রেষ্ঠ আওলিয়া ছিলেন। সে কারণে তাঁর ইন্তিকালের দিনকে 'ওরস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দ্র. মাওলানা মোঃ আব্দুল মোমিন, প্রবন্ধ : ওরছ পরিচিতি, *আল-আহ্ছান*, ১৪তম বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৯৯, পৃ. ২০।

অধ্যায় : তিন

মুসলিম শিক্ষা প্রসারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা

মানবজীবনে শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষা একজন অশিক্ষিত মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত করে। শিক্ষার মাধ্যমে একজন মানুষ পার্থিব উন্নতির পাশাপাশি পরকালীন মুক্তির পথও ত্বরান্বিত করতে পারে। শিক্ষার এ মহান গুরুত্ব উপলব্ধি করেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় মুসলিম সমাজে শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে উৎসর্গ করেছিলেন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কয়েকজন মুসলিম মনীষী বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম মানসে যুগোপযোগী ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি সাধনের লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৩-১৯৮৩), সৈয়দ আমির আলী (১৮৪৯-১৯২৮), সৈয়দ আমির হোসেন (জন্ম ১৮৪৩), নওয়াব নবাব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), মাওলানা ওবায়দুল্লা ওবেদী (১৮৩৪-১৮৮৫), নবাব ফয়জুন্নেছা প্রমুখ মনীষীগণের প্রচেষ্টার ফলে বাংলার পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। 'আঞ্জুমানে ইসলামী' (১৮৫৫), 'মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সমিতি' (১৮৯১), চট্টগ্রাম প্রভৃতি সংগঠন বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্র তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে বাংলার মুসলিম সমাজে আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হয়। বিশ শতকের প্রথম পাদে কয়েকজন মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও সমাজপতি মুসলিম সমাজে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করে এ সব দূরীকরণে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম (১৮৬৩-১৯৪৩), স্যার আজিজুল হক (১৮৯০-১৯৪৭), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, সৈয়দ শামসুল হুদা, দেলোয়ার হোসেন আহমদ, বেগম রোকেয়া, স্যার আবদুর রহীম প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্যার আজিজুল হক, মৌলভী আবদুল করিম ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলার মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। আবদুল করিমের Muhamadan Education in Bengal (1900), স্যার আজিজুল হকের History and Problem of Moslem Education in Bengal (1917), খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান (১৯৩১), নীতি ধর্মশিক্ষা ও চরিত্র গঠন (১৯২৯) এবং টিচার্স ম্যানুয়েল

(১৯১৫) প্রভৃতি গ্রন্থসমূহে মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে তাঁদের নীতি ও চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে। এ ছাড়াও নবাব আলী চৌধুরীর Vernacular Education in Bengal-একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থে তিনি বাঙালি মুসলমান ছাত্রদের ভাষা ও পাঠ্যসূচি সমস্যা নিয়ে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে মৌলভী আবদুল করিম ও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দীর্ঘকাল শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁরা খুব কাছ থেকে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষার নানা সমস্যা প্রত্যক্ষ করেছেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা নীতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় পূর্বে উল্লেখিত 'শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান', 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থদ্বয় থেকে। দীর্ঘ সময়ের শিক্ষা বিভাগের চাকরি ও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর গ্রন্থের আলোচনায়। বাংলার মুসলিম সমাজের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সম্পর্কে তিনি বলেন :

> সমগ্র জনসংখ্যার অনুপাতে মোছলমান শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা ৪.৫ জন মাত্র। বলা বাহুল্য যে, যাহাদের বর্ণ জ্ঞান আছে, তাহাদিগকেও শিক্ষিত পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এই প্রকার ঘোরতর মূর্খতা এক তিমিরাচ্ছন্ন বঙ্গদেশ ব্যতীত সভ্য জগতের অন্য কোথাও পরিলক্ষিত হয় না। ম্যালেরিয়া অতীব মারাত্মক ব্যাধি সন্দেহ নাই, মূর্খতা ব্যাধি অপেক্ষাও ভীষণ। জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি এবং সম্পদ জনসাধারণের জ্ঞান; বঙ্গীয় সমাজের গরিষ্ঠ অংশই মোছলমান। ইহারা শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনত এবং অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় পড়িয়া আছে।[১]

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর ভাগ্য বিপর্যয়ের পর মুসলমানদের সামগ্রিক জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রেও তারা চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। বিশেষত ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারী ভাষা হিসেবে চালু করার ফলে মুসলিম শিক্ষার উপর চরম আঘাত আসে। উইলিয়াম হান্টারের বিবরণ থেকে মুসলিম শিক্ষার বিপর্যয়ের কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় :

> উপমহাদেশের প্রতিটি খানদানী মুসলিম পরিবারে পারিবারিকভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সেখানে তারা এবং প্রতিবেশী দরিদ্র ও দুঃস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করত। ইংরেজদের বৈষম্যমূলক নীতি ও অত্যাচারের ফলে বাংলার মুসলমান পরিবার যেমন নিঃশেষ হতে থাকে, তেমনি এসব শিক্ষায়তনের সংখ্যা কমে যেতে থাকে।[২]

সিপাহী বিপ্লবের পর আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত কতিপয় বরেণ্য মনীষী বাংলার পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে পুনর্জাগরণ আনয়নে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন। মূলতঃ তাঁদের

---

১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, ঢাকা ১৯৮৭, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৫-৬।

২. উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আব্দুল মওদুদ অনূদিত, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ৩য় সং, ১৯৭৪, পৃ. ১৭৮।

প্রয়াস এবং মুসলিম সমাজের প্রতি সরকারের নমনীয় অবস্থান গ্রহণের ফলে বাংলার মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজে ইংরেজী শিক্ষার আগ্রহ সৃষ্টি হতে থাকে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৮৭১-১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ও আসাম প্রদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ৬,০৪,৬৭,৭২৪ জন। এর মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১,৯৫,৩৩,৪২০ জন অর্থাৎ শতকরা ৩২.৩%। মোট ১,৯৬,০৬ জন স্কুল ছাত্রের মধ্যে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল ২৮,৪১১ জন অর্থাৎ শতকরা ১৪.৪%। অন্যদিকে NWFP- এ মুসলিম ছাত্র সংখ্যা জনসংখ্যার তুলনায় বেশী ছিল। NWFP- এর মুসলিম জনসংখ্যা ও ছাত্রসংখ্যার হার ছিল যথাক্রমে ১৩.৫% ও ১৭.৮%।[৩]

উনবিংশ শতাব্দীর বিশের দশকে বাংলার স্কুল-কলেজে মুসলিম ছাত্রের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি বলা চলে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর 'শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান' গ্রন্থে ১৯২৬-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, মধ্য ও উচ্চ স্তরে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল অত্যন্ত কম।

সারণী-০৫

১৯২৬-১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা[৪]

১	২			৩	
বিভিন্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়	মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা			মোট ছাত্রের তুলনায় মুসলমান ছাত্রের শতকরা অনুপাত	
	পুরুষ বিদ্যালয়	স্ত্রী বিদ্যালয়	মোট	পুরুষ	স্ত্রী
কলেজ	৪,৩০০	৫	৪,৩০৫	১৪.২	১.৫
উচ্চ শ্রেণীর স্কুল	১৬,০১৫	৪৩	১৬,০৫৮	১৫.৫	২.৮
মধ্য শ্রেণীর স্কুল	১৮,৪৬৯	১০৫	১৮,৫৭৪	১৯.৩	৪.১
প্রাথমিক স্কুল	৭,৯৩,৬৫৩	২,০১,৩৭৭	৯,৯৫,০৩০ (ক)	৫০.০	৫০.৬
বিশেষ শ্রেণীর স্কুল	৭৫,১১৮	১৫২	৭৫,২৭০ (খ)	৬৬.৬	৮.৬
মোট	৯.০৭.৫৫৫	২,০১৬৮২	১১,০৯,২৩৭	–	–

৩. Syeed Mahmud, *English Education in India*, P. 148.

৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮, পৃ. ৮।

উপরোক্ত সারণীতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক স্তর ছাড়া অন্য কোন স্তরে মুসলমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল না। নারী শিক্ষার অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। এ থেকে আলোচ্য সময়ে মুসলিম সমাজ যে শিক্ষার ক্ষেত্রে দারুণভাবে পিছিয়ে পড়েছিল তার যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথার্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেন :

> অতীতে আমরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যেরূপ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছি পুনরায় সেরূপ ভ্রম করিলে চলিবে না। ইংরেজী শিক্ষা আমাদের করিতেই হইবে, তবে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন যেন এতদসঙ্গে ইছলামের আদর্শ, সভ্যতা এবং ধর্ম-প্রাণতার বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন থাকে। হিন্দু ছাত্রের সমকক্ষ হইতে হইতে মোছলমান ছাত্রের জন্যও যথোপযুক্ত উদার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, কিন্তু সেই শিক্ষার প্রতি যাহাতে মোছলেম অভিভাবকমণ্ডলীর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা বর্তমান থাকে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাও অতীব প্রয়োজন।[৫]

আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে মুসলিম সমাজের আগ্রহ পরিলক্ষিত হলেও কিছু বাস্তব সমস্যার কারণে মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তার ব্যাহত হয়।[৬] এ সময় বেশ ক'জন বরেণ্য মনীষী মুসলিম শিক্ষার সমস্যা চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে আন্তরিক প্রয়াস চালান। তাঁদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন অন্যতম। যুগোপযোগী আধুনিক শিক্ষায় দক্ষতা অর্জন ব্যতীত বাংলার মুসলমানদের ভাগ্যোন্নয়ন যে সম্ভব নয় তা তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। 'অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থাও মুসলিম সমাজের জন্য উপযোগী ছিল না'।[৭] তাই তিনি মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষার পাশপাশি ধর্ম শিক্ষার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন। এভাবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ও কয়েকজন বরেণ্য মনীষী মুসলিম সমাজের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

---

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে সমস্যাগুলো নিম্নরূপ– ১. সমাজের অধিকাংশ মানুষ দরিদ্র, ২. ধর্মশিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, ৩. ভাষা-বাহুল্য, ৪. স্কুল-কলেজের শিক্ষা এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে মুসলমানদের স্বল্পতা, ৫. স্কুল ও কলেজের হোস্টেলের ব্যয়াধিক্য। ৬. শিক্ষা বিভাগের উচ্চতর পদে মুসলমানদের অপ্রাচুর্য্য। ৭. বিশ্ববিদ্যালয় এবং তদ্‌সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানাদিতে মুসলমান প্রতিনিধির অভাব, ৮. ডিস্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডে উপযুক্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধি গ্রহণের অভাব। দ্রঃ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫-১৬।

৭. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষাবিদ ও সুসাহিত্যিক হিসেবে সমধিক পরিচিত হলেও তাঁর জীবনের মূল ভিত্তি ছিল ধর্মীয় প্রেরণা। একজন খাঁটি মুসলমানের মত তাঁর শিক্ষা সংস্কার ও শিক্ষা উন্নয়ন প্রচেষ্টা, সাহিত্য সাধনা এবং অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী সবকিছুই পরিচালিত হয়েছে ইসলামের মহান আদর্শ ও মূল্যবোধের নিরিখে।[৮] তাছাড়া সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনো দ্বীনি শিক্ষা তথা আল কুর'আন ও আল হাদীসের জ্ঞানার্জন থেকে বিরত থাকেননি। তিনি যথার্থই বলেছেন– 'আল কুরআনের শিক্ষাই হলো প্রকৃত শিক্ষা। যে জাতি এ শিক্ষা থেকে দূরে থাকবে সে জাতির ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী'।[৯] শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে রাসূল (স.) ঘোষণা করেন– 'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর জন্য ফরয'।[১০] মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর পবিত্র মুখনিঃসৃত বাণীকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করতে মোটেও ভুল করেননি এ মহান শিক্ষা সংস্কারক ও সাধক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। তাই তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মুসলিম শিক্ষা প্রসারের স্বরূপ অনুধাবনের জন্য তাঁর জীবনের আরেকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। তিনি ছিলেন তাসাউফপন্থী আধ্যাত্মিক সাধক। সুতরাং তাঁর শিক্ষা চিন্তায় স্বাভাবিকভাবে অধ্যাত্ম চিন্তার প্রভাব পড়েছিল। তিনি বলেন– 'কেবল বৈষয়িক শিক্ষা দ্বারা জীবন সমস্যার সমাধান হয় না, আধ্যাত্মিক শিক্ষাও প্রয়োজন।... শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। শরীরের সুস্থতার জন্য যেমন ব্যায়াম আবশ্যক, তেমনি আত্মার সুস্থতার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন।'[১১] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা থেকে একথা সহজে অনুধাবন করা যায় যে, তিনি মুখ্যত শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মুসলিম শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন[১২] এবং তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে মুসলিম শিক্ষার বিপুল সংস্কার সাধিত হয়।

---

৮. প্রবন্ধ : সাধক শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০।

৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *কোরআনের শিক্ষা*, কলকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লিঃ, ১৯৪১, পৃ. ২৩।

১০. শায়খ আলী উদ্দীন আল খতীব আত্তিবরীজি, *মিশকাত আল মাসাবীহ*, ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তাবি, পৃ. ৯২।

১১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

১২. ড. হাবিবুর রহমান, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা চিন্তা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২০ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৯।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার কর্মজীবনের সমগ্র অংশই শিক্ষা বিভাগে চাকরির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। একজন সাধারণ শিক্ষক থেকে শিক্ষা বিভাগের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং বাস্তবতার আনুকূল্যের সুযোগে তিনি অবিভক্ত বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষাহীনতার বিষয়টি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। এ উপলব্ধি থেকেই তিনি মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর মুসলিম শিক্ষা প্রসার ও সংস্কারমূলক উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো এখঅনে উপস্থাপন করা হল :

চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষার উন্নয়ন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চাকরি জীবনের এক বিরাট অংশ অতিবাহিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগের 'বিভাগীয় ইন্সপেক্টর' হিসেবে। এ সময় বিভাগীয় কমিশনারের প্রস্তাব অনুসারে সদরের সরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাগুলোর আবশ্যকতা অনুযায়ী স্থান পরিবর্তন ও পরিবর্ধন এবং উক্ত বিভাগের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য তাঁকে 'সম্পাদক' করে একটি 'বিভাগীয় শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়। এক বছর কঠোর পরিশ্রম করে তিনি যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন তাতে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে উচ্চতর বেতন স্কেলে উন্নীত করে পুরস্কৃত করেন।[১৩] তাঁর ব্যক্তিগত পুরস্কার প্রাপ্তি বড় কথা নয়; বরং এখানকার শিক্ষা বিস্তারে তিনি যে অবদান রেখেছেন সেটাই মুখ্য বিষয়। চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষার প্রসারের জন্য তিনি সদা সচেষ্ট ও আন্তরিক ছিলেন। কর্তৃপক্ষও ছিল তাঁর প্রতি আস্থাশীল ও আন্তরিক। তাঁর কাজে ডিরেক্টর এতই সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁর উপস্থাপিত যে কোন পরিকল্পনার জন্য তিনি নির্দ্বিধায় অর্থ মঞ্জুর করতেন।[১৪] এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বঙ্গভঙ্গ রহিত না হওয়া পর্যন্ত কেবল চট্টগ্রাম বিভাগে শিক্ষাখাতে যত টাকা ব্যয় করা হত, অন্যান্য সকল বিভাগে একত্রেও সে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হত না।[১৫] তাঁরই প্রচেষ্টার ফলে চট্টগ্রাম বিভাগে মুসলিম শিক্ষার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। নিম্নোক্ত সারণী থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

---

১৩. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; প্রবন্ধ : আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

১৪. ইমরান হোসেন, প্রবন্ধ : বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান : একটি পর্যালোচনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ২০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৭, পৃ. ৯।

১৫. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭।

সারণী–০৬

মুসলিম ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি (পাঁচটি জেলায়)[১৬]

১৯০৫-১৯০৬ থেকে ১৯২০-১৯২১

	১৯০৫-১৯০৬		১৯২০-১৯২১	
জেলা	ছাত্র সংখ্যা	বৃদ্ধির শতকরা হার	ছাত্র সংখ্যা	বৃদ্ধির শতকরা হার
বর্ধমান	৬৮২৭	১৫.৮	১১৪২৮	২৬.২
চট্টগ্রাম	৩৯৭২৫	২৭.৩	৬৪৩৭৫	৩৯.৫
ঢাকা	৪২৯৮৪	NA	৮৬৯৪২	২৫.৯
যশোর	১৭১২৭	১০.৩	৩১৮৪৫	১৯.৫
পাবনা	১৬৪৫১	NA	৩১২০৭	২২.৪

সূত্র : Bengal District Gazeetteer B. volume. District : Bardwan, Chittagong, Dacca, Jessore. Pabna.

সারণী–০৭

মুসলমান ছাত্র সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির হার[১৭]

১৯২১-২২ থেকে ১৯২৪-২৫

জেলা	মোট ছাত্র	মুসলিম (শতকরা)	মোট ছাত্র	মুসলিম (শতকরা)	বৃদ্ধি
ঢাকা	৯৬,২০৩	২২.৫	৮২,৪১৭	২৬.১	৪.৪
চট্টগ্রাম	৫৭,৭৩৭	৩২.৮	৮১,৬৮৬	৪৬.৪	১৩.৬
নোয়াখালী	৫৪,৭৭৮	৩১.৯	৭০,৭৬৫	৪১.২	৯.৩
পার্বত্য চট্টগ্রাম	২২৫	২০.৭	৩২৪	২৯.২	৮.৫
যশোর	৩১,৩৩১	১৯.৬	৩২,৫৭২	২০.৪	০.৮
পাবনা	৩৬,০৫২	১২.৬	৩৫.৫৪৪	১২.৫	০.১
বর্ধমান	১২,০০৯	১৬.৭	১৩,২৯৪	১৮.৫	১.৭
মুর্শিদাবাদ	১৬,২৫৭	১৬.০০	১৬,৯৯৬	১৬.৭	০.৭

সূত্র : বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, বি. ভলিউম, (স্ট্যাটিসটিক্স) জেলা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, পার্বত্য চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ ১৯২১-২২, ১৯২৪-২৫।

---

১৬. *Bengal District Gazeetteer*, Vol-B, District : Bardwan, Chittagong, Dacca, Jessore, Pubna, 1905-1906, 1920-1921.

১৭. *বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার*, ভলিউম-বি, (স্ট্যাটিসটিক্স), জেলা : ঢাকা, চট্টগ্রাম, পাবর্ত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, যশোর, পাবনা, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ, ১৯২১-১৯২২, ১৯২৪-১৯২৫।

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। তৎকালীন চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলা অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সময় তাঁর অধীনস্ত বিভাগের প্রতিটি জেলায় মুসলিম ছাত্র সংখ্যার বৃদ্ধির হার ছিল লক্ষণীয়। অন্যান্য ধর্মের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও এ সময় উক্ত জেলাসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বৃদ্ধি পেয়েছিল।[১৮] এ ধারা পরবর্তী সময়েও অব্যাহত থাকে।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পাকিস্তানের সেন্সাসে দেখা যায়, চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাসমূহের শিক্ষার হার পূর্ববঙ্গের চেয়ে বেশী ছিল। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও সিলেটে শিক্ষার হার ছিল যথাক্রমে ৩২%, ২৩%, ২৪% ও ২৪%। অন্যান্য জেলাসমূহের মধ্যে খুলনায় ২৩% এবং এরপর ঢাকার স্থান ২১%।[১৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে অবকাঠামো তৈরী করেন তারই ফলস্বরূপ চট্টগ্রাম বিভাগের প্রতিটি জেলায় শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। অথচ এককালে চট্টগ্রামে মুসলমানদের শিক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। তাঁর চট্টগ্রামে অবস্থানের ফলে স্থানীয় মুসলমানদের ব্যবস্থাপনায় বহু উচ্চ ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা যখন চট্টগ্রাম বিভাগের পরিদর্শকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হন, তখন পূর্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ ছিল। তখন নতুন সৃষ্ট এ প্রদেশের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়। প্রতিবছর তাঁরই মাধ্যমে এক লক্ষেরও অধিক টাকা এ বিভাগের শিক্ষাখাতে ব্যয় করা হত।[২০] তাঁর সময় হাইস্কুলগুলোর উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়। শিক্ষা বিভাগের 'সহকারী পরিচালক'-এর দায়িত্ব পালনকালে (প্রথম তিন বছর) তিনি ৪০টিরও অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাহায্য প্রদান করেন। সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলগুলোর অধিকাংশই ছিল মুসলিম প্রধান এলাকায়।[২১] এ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল, মুসলিম হাইস্কুল, আরমানিটোলা গভঃ হাইস্কুল, ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, জামালপুর জেলা স্কুল, ফরিদপুর জেলা স্কুল, বরিশাল জেলা স্কুল, ঝালকাঠি গভঃ হাইস্কুল, পিরোজপুর গভঃ হাইস্কুল, ভোলা গভঃ হাইস্কুল, রংপুর জেলা স্কুল, রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল, বগুড়া জেলা স্কুল, পাবনা জেলা স্কুল,

---

১৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৯. *Cansus of East Pakistan*, 1951, P. 102.

২০. এ. এফ. এম এনামুল হক, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

২১. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[২২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার একান্ত প্রচেষ্টায় 'চট্টগ্রাম মুসলিম হাইস্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম মাদরাসার 'Integral Part' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ক্রমান্বয়ে এটি এ্যাংলো পার্সিয়ান স্কুলে রূপান্তরিত হয়। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এটি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে হাইস্কুলের মর্যাদা লাভ করে।[২৩] এ ছাড়াও ঢাকা মাদরাসার উন্নয়ন, কলকাতা মাদরাসার এ্যাংলো-কার্সী বিভাগের উন্নয়ন এবং মহসীন তহবিলের সঠিক ব্যবহারে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।[২৪]

চট্টগ্রাম মাদরাসা ১৮৭৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত ছিল। তিনি এ প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেন। তাঁরই উদ্যোগে এখানে ইন্টারমিডিয়েট সেকশন চালু করা হয়। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে স্যার আব্দুর রহিম এ মাদরাসা পরিদর্শন করেন এবং ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে এটি ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে রূপান্তরিত হয়।[২৫] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিভাগের উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা

বিশিষ্ট শিক্ষা সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা বিভাগে 'সহকারী পরিচালক' হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তি বাংলার মুসলিম ইতিহাসে এক নতুন মাইল ফলক। এ দায়িত্ব প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে মুসলিম শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব তাঁর কাঁধে ন্যস্ত হয়। তিনিও তাঁর মেধা, দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা ও অনাগ্রহ দূরীকরণে এবং অগ্রগতি সাধনের অনুকূলে তিনি উচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেন। নতুন দায়িত্বে যোগদানের পরপরই তিনি দীর্ঘদিন ধরে স্থগিত স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[২৬]

---

২২. *Proceeding of Govt. of Bengal*, Education Dept., September 1927, P. 77-78.

২৩. প্রবন্ধ : বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান : একটি পর্যালোচনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

২৪. *Proceeding of Govt. of Bengal*, Education Dept., July 1928, P. 38.

২৫. *Letter of DPI to Education Secretary*, 19th February, 1926, File-1-M-8 (1), P. 7.

২৬. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ২১।

কলকাতায় মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার দাবী ছিল দীর্ঘদিনের। সরকার নীতিগতভাবে এ দাবী মেনে নেয়ার পরও নানা কারণে এ প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। মুসলমানদের পুনঃ পুনঃ দাবী পেশ সত্ত্বেও এ কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নতুন দায়িত্ব গ্রহণের এক মাসের মধ্যে কলকাতায় মুসলমানদের জন্য প্রস্তাবিত কলেজ (ইসলামিয়া কলেজ) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্টার যৌক্তিকতা দেখিয়ে তিনি তাঁর দপ্তর থেকে তথ্যভিত্তিক দীর্ঘ প্রতিবেদন[২৭] প্রকাশ করেন। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চ পর্যায়ের একটি পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সদস্যদের মধ্যে ছিলেন :

১. খানবাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী–সভাপতি।
২. খানবাহাদুর শামছুল 'ওলামা হেমায়েত হোসেন।
৩. মৌলভী আব্দুস সালাম, এম.এল.সি।
৪. কাজী জহিরুল হক, এম.এল.সি।
৫. খানবাহাদুর মোশাররফ হোসেন।
৬. মিঃ আলতাফ আলী, এম.এল.সি।
৭. মিঃ জে.এ. বটমলি–সেক্রেটারী।
৮. খানবাহাদুর সুজাত আলী।[২৮]

১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে এ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবিত কলেজের নাম 'ইসলামিয়া কলেজ' রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[২৯] উল্লেখ্য যে, খানবাহাদুর সুজাত আলী অসুস্থতার কারণে উক্ত সভায় উপস্থিত থাকতে পারেননি।

---

২৭. উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়– 'Proposal for the establishment of such a college in Calcutta was first made in 1811, and Intermediat classes were opened in Calcutta Madrasa in 1883. The Classes were however abolished in 1919, and since then a certain number of Muslim students have been allowed to read in the presidency college in the payment of reduced fees.'

'On account of the increase of Muslim students Govt. expressed desire to establish in 1913 and again in 1914, Calcutta University commission also recommended for such college'. Note-proceeding of the Government of Bengal, Education Dept. September, 1926.

২৮. প্রবন্ধ : বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান : একটি পর্যালোচনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

২৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার পেশকৃত প্রতিবেদনে সে সময়ের মুসলিম সমাজের উচ্চশিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করা হয়। ১৯২১-১৯২২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯২৩-১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ক্লাসে মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ- কলা অনুষদে ২২১ জন এবং বিজ্ঞান অনুষদে ৮ জন। একই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রাজুয়েট ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ছিল যথাক্রমে কলা অনুষদে ৮৬১ জন এবং বিজ্ঞানে ২১৭ জন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে কলকাতাস্থ বিভিন্ন কলেজে আইএ ও বিএ ক্লাসে ছাত্র সংখ্যা ছিল- কলা বিভাগে ৬০৭ জন এবং বিজ্ঞান বিভাগে ২১৪ জন।[৩০]

সারণী-০৮

ঢাকা, মফস্বল ও কলকাতায় অধ্যয়নরত মুসলিম কলেজ ছাত্রসংখ্যা[৩১]

১৯২০-১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ

	আই.এ.	আই.এস.সি.	বি.এ.	বি.এস.সি	এম.এ.	এম.এস.সি.
ঢাকা	৮৬১	২৫৭	-	-	-	-
কলকাতা	১০৩৫	৪৩৫	৭৭৯	৬৩	২২১	০৮
মফস্বল	২৯৯১	৪৫৬	৫৯	-	-	-

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে কলকাতায় ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়ার পর ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে এ কলেজে ক্লাস শুরু হয়। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুন তিনি উক্ত কলেজের পরিচালনা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।[৩২] ফলে কলেজের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নে কাজ করার অধিকতর সুযোগ পান। এ কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন।[৩৩] মুসলিম ছাত্রদের ইসলামী আদর্শে গড়ে তোলার

---

৩০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৩১. *Proceeding of Govt. of Bengal, Education Dept.*, September, 1926.

৩২. *Syndicate Resolution of Calcutta University*, 1929.

৩৩. ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন- 'কলিকাতার মোছলেম ছাত্রদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব হয়। উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিবার ভার আমার উপর ন্যস্ত হয়। হিন্দু সদস্যগণ ইহার বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করে। আমি বলিলাম-হিন্দুদের জন্য সংস্কৃতি কলেজের যদি আবশ্যকতা থাকে, তবে মোছলেম কলেজের আবশ্যকতা নিশ্চয় আছে। ব্যয় গভর্ণমেন্ট বহন করিবেন, সুতরাং, আপত্তির কারণ অগ্রাহ্য। প্রস্তাবিত মোছলেম কলেজে আরবী, পারসী ও উর্দূ শিক্ষার বৈশিষ্ট্য থাকিবে। ইছলামিক ঐতিহ্য, ইছলামিক আচার, বাধ্যতামূলক নামাজ ও

লক্ষ্যে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজের প্রতিষ্ঠালাভ কোনভাবেই খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। পরবর্তীতে কলকাতা মাদরাসার সংস্কার ও প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের লক্ষ্যে তিনি তাঁর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় 'মোছলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৩৪]

পরীক্ষার খাতায় রোলনম্বর লেখার রীতি প্রচলন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত থাকাকালীন সময় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম এবং প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে শিক্ষা ক্ষেত্রে যে সংস্কার সাধন করেন তা মূলতঃ দু'টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রথমতঃ অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করা, দ্বিতীয়তঃ পশ্চাদপদ ও বঞ্চিত মুসলিম মধ্যবিত্তদের ন্যায্য অংশ প্রাপ্তির পথ নিশ্চিত করা।[৩৫] এ লক্ষ্যেই পরীক্ষার খাতায় নামের পরিবর্তে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর লেখার পদ্ধতি প্রচলন একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। আর এর প্রবর্তক ছিলেন স্বয়ং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা।

তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার নিয়ম প্রচলিত ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল, সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান থাকার কারণে হিন্দু ও মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হওয়ার সুযোগ থাকে।[৩৬] মানুষমাত্রই দল ও মতের উর্ধ্বে নয়। সেজন্য পরীক্ষার খাতায় ক্রমিক নম্বরের পরিবর্তে পরীক্ষার্থীর নাম লেখা থাকলে পরীক্ষকের স্বজনপ্রীতি সাম্প্রদায়িকতার রূপ পরিগ্রহ করা অসম্ভব নয়। তখন তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হিন্দু শিক্ষকদের কারো কারো মধ্যে একটা তীব্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান রয়েছে। ফলে

ইছলামিক পারিপার্শ্বিকতা গঠন এই কলেজের অন্যতম উদ্দেশ্য হইবে। এই প্রস্তাবে কেহ আপত্তি করিতে পারেন নাই। তবে অন্যপক্ষ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যে পর্যন্ত মোছলেম শিক্ষার্থীর সংখ্যা আশানুরূপ হইবে, ততদিন হিন্দু ছাত্র ইচ্ছা করিলে মোছলেম কলেজে ভর্তি হইতে পারিবে। ইহাতে আমরা সম্মতি জানাইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। ... কলেজ খুলিতেই প্রচুর মোছলেম ছাত্রের সমাবেশ হয়, সুতরাং হিন্দু ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থার আবশ্যক হয় নাই। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

৩৪. *Education Proceedings*, Vol-1, April, 1929.

৩৫. প্রবন্ধ : আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

৩৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২।

মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণে তারা সর্বক্ষেত্রে সমতা বজায় রাখত না। তাছাড়া সমগ্র শিক্ষা বিভাগের শিক্ষকদের মধ্যে তখন হিন্দু শিক্ষকদের ছিল সংখ্যাধিক্য।[৩৭] ফলে যে কোন পরীক্ষায় মুসলিম ছাত্ররা উচ্চস্থান অধিকার করতে পারত না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম পরীক্ষার্থীদের অনেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করত, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্ররা সহজে প্রথম বিভাগও লাভ করতে পারত না।[৩৮] এর পিছনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নয়। সেজন্য শিক্ষা প্রশাসনের চোরাপথগুলো বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা চালান।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, উত্তরপত্রে শুধুমাত্র পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নম্বর লেখা হয়, কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি নেই। এ তথ্যের ভিত্তিতে তিনি তুমুল আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং কতিপয় নিরপেক্ষ মেম্বরের সহানুভূতি লাভে সমর্থ হন। আন্দোলনে বিরোধীপক্ষ আপত্তি তুললেও তিনি অন্ততঃ অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে ক্রমিক নম্বর ব্যবহার রীতি প্রবর্তনের দাবী জানান। তিনি বলেন– 'বাংলাদেশ বাদ দিলে পৃথিবীর আর কোথাও পরীক্ষার খাতায় নাম লেখার রীতি প্রচলিত নেই, তা হলে বাংলাদেশে তা থাকবে কেন? হ্যাঁ, যদি এই পদ্ধতি সঠিক ও যথার্থ হত কিংবা বিশেষ কোন গুণগত কারণে প্রচলিত রাখার প্রয়োজন থাকত, তা হলে অবশ্যই তা রাখা যেত।[৩৯] বিরোধী পক্ষ তাঁর অকাট্য যুক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হয়। অতঃপর বহু তর্ক-বিতর্কের পর তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় সর্বপ্রথম অনার্স ও এমএ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে ক্রমিক নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।[৪০] এ নিয়ম প্রবর্তনের ফলে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়[৪১] এবং মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকে অনেকে উচ্চস্থান লাভ করে।

---

৩৭. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) : স্মৃতিচারণ ও মূল্যায়ন, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪।

৩৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪; এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩।

৩৯. প্রবন্ধ : সৈয়দ সাঈদ হোসেন, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) স্মরণে, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯।

৪০. মোঃ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১; প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৪; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আমাদের চেতনায় প্রতিফলিত মানব (অভিব্যক্তি), *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮২; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭; *বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৬-১৯৯৭)*, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. ১৭।

৪১. *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*, আহ্ছানউল্লা-খানবাহাদুর, শব্দ দ্রষ্টব্য।

অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় ক্রমিক নম্বর লেখার নিয়ম প্রবর্তনের ফলে কোন প্রকার সমস্যা দৃষ্ট হয়নি। ফলে পরবর্তীতে তিনি এর অনুকরণে আইএ এবং বিএ পরীক্ষার খাতায়ও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পদ্ধতি রহিত করেন।[৪২] কিন্তু তখনও ম্যাট্রিক (এসএসসি) পরীক্ষায় উক্ত নিয়ম অবলম্বিত হয়নি। এজন্য তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায়ও একই নিয়ম অবলম্বনের প্রস্তাব পেশ করেন, কিন্তু এতে অধিকাংশ মেম্বর অসম্মতি প্রকাশ করে। যার কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উক্ত রীতি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি।[৪৩] এমনকি তাঁর পরবর্তীগণও দীর্ঘকাল যাবত এ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হননি। কয়েকবার মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলর সিন্ডিকেট-এর সভাপতির পদ অলংকৃত করলেও এত বড় আবশ্যকীয় বিষয়টি তাঁদের বিবেচনাধীন ছিল না।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর কর্ম ও সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জীবন ও মানসে যে শ্রেয় চেতনা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তাতে তিনি পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেন। মুসলিম সমাজে তিনি যে শিক্ষা বিস্তার করেছিলেন তা আজ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। তাঁরই প্রচেষ্টায় অবিভক্ত বাংলার শিক্ষাঙ্গণে বিপুল সংস্কার সাধিত হয়।

মুসলিম ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ছিল একজন পরিপূর্ণ মানুষের জীবন। আর সে জীবন ছিল মানব সেবার জীবন। মানব সেবার মাধ্যমে তিনি কিভাবে একজন পরিপূর্ণ মহাপুরুষে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিলেন তা নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক ও অনুকরণীয়। আলোচ্য অনুচ্ছেদের অবতারণা এ প্রশ্নের উত্তর পাবারই প্রয়াস। তৎকালীন সময় মুসলমান ছাত্রদের আবাসন সংকট ছিল একটি বড় সমস্যা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল বড়ই অপ্রতুল। আর হোস্টেল সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন এলাকায় স্বচ্ছল মুসলিম পরিবারের সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল বলে মুসলিম ছাত্রদের জায়গীর পাওয়াও ছিল বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার।[৪৪]

---

৪২. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩১।

৪৩. এ সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর স্মৃতিকথায় বলেন– 'যদি আই.এ. এবং বি.এ. পরীক্ষায় ভুল দৃষ্ট না হয়, তবে অতঃপর ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একই প্রথা অবলম্বনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দুঃখের বিষয় এই দীর্ঘকাল ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উক্ত প্রথা অবলম্বিত হয় নাই। বহু কষ্টে অন্যান্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর নাম উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা গিয়াছিল, কিন্তু আমার পরবর্তীগণ এই বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হন নাই। উপর্য্যুপরি কয়েকবার মোছলেম ভাইস-চ্যান্সেলর Syndicate এর সভাপতির পদ অলংকৃত করিয়াছেন, কিন্তু এত বড় আবশ্যক বিষয়টি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। দ্র. গোলাম মঈনউদ্দিন, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

৪৪. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৩।

অন্যদিকে হিন্দু অবস্থাপন্নরা মুসলমানদের বাড়ি ভাড়া দিতে সম্মত হত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্রজীবনে কলকাতায় সরকারী প্রস্রাব-পায়খানার ঘরের পাশে মুটে-মজুরদের বস্তিতে থাকার যে ঘটনা বর্ণনা করেছেন তা-ই এ সংক্রান্ত একটি জ্বলন্ত প্রমাণ। এ কারণেই মুসলিম ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা ছাত্র জীবন থেকেই তাঁকে বিচলিত করে তুলেছিল। তাই তিনি মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে তরুণ বয়সে (৩০ বছর) তিনি রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হন।[৪৫] এখানে অবস্থানকালে তিনি মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেন এবং দীর্ঘদিনের অন্তরায়গুলো অপসারণ করতে সচেষ্ট হন। সে সময় রাজশাহীতে নাটোর মহারাজার পক্ষ থেকে একটি হিন্দু ছাত্রাবাস তৈরী করা হয়, কিন্তু মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোন ছাত্রাবাস না থাকায় তারা ভীষণ সমস্যার সম্মুখীন হত। এমতাবস্থায় তিনি মুসলমানদের নিকট থেকে চাঁদা তুলে এবং সরকারের সহযোগিতায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন।[৪৬] তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।[৪৭]

ইতোমধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসামের তৎকালীন ছোটলাট 'Sir Banfylde Fuller' রাজশাহী পরিদর্শনে আসেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এ সুযোগে ছোটলাট বাহাদুরকে অভ্যর্থনা দিয়ে মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক হোস্টেলের অসুবিধার কথা নিবেদন করার ইচ্ছা পোষণ করেন, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর এ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেবার জন্য নানারকম হীন কৌশল অবলম্বন করে। রাজশাহীর কোন ছাপাখানার মালিক অভিনন্দনপত্র ছাপাতে রাজী হয়নি।[৪৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এতে হতোদ্যম হননি। তিনি গোপনে

---

৪৫. প্রবন্ধ : ড. গোলাম সাকলায়েন, মানব কল্যাণব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১৫ ফাল্গুন, ১৪০২ বাংলা, পৃ. ৫।

৪৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

৪৭. '... নাটোর মহারাজার পক্ষ হইতে একটি হিন্দু ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছিল, কিন্তু মোছলমান ছাত্রদিগের জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাই আমি রাজশাহী জেলার স্থানে স্থানে জন-সাধারণকে আহ্বান করিয়া ভিক্ষার প্রস্তাব করি। কত দিবা, কত রাত্রি, বৃক্ষতলে একাকী যাপন করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, সহৃদয় ব্যক্তিগণ আমাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন। এই রূপে প্রায় সহস্রাধিক টাকা সংগৃহিত হইল। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৪৮. প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃ. ২১৪; *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ১২।

কলকাতায় লোক পাঠিয়ে অভিনন্দনপত্র ছাপিয়ে আনার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু এতেও শেষ রক্ষা হয়নি। ছোটলাট সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নির্মাণ করা হয়েছিল হিন্দুরা তা পুড়িয়ে ছাই করে দেয়।[৪৯] ফুলার সাহেব সবকিছু জানার পর সন্ধ্যায় তাঁর লঞ্চে সভার আয়োজন করেন।

কলেজ পরিদর্শন শেষে ফুলার সাহেব কলেজিয়েট স্কুল পরিদর্শনে এলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা 'মুসলিম হোস্টেল'-এর অভাবের কথা নিবেদন করলে কলেজের হিন্দু অধ্যক্ষ তার সরাসরি বিরোধিতা করে অদ্ভুত যুক্তি দেখিয়ে বললেন যে, রাজশাহীতে মাঝে মাঝে ভূকম্পন অনুভূত হয়। সুতরাং এখানে ইটের তৈরী বিল্ডিং (হোস্টেল) নির্মাণ করা সমীচীন হবে না।[৫০] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অত্যন্ত ধীর ও শান্তভাবে এর জবাবে বললেন– 'স্থানীয় কলেজ বহুদিবস যাবৎ ইষ্টক নির্ম্মিত দ্বিতলগৃহে অবস্থিত, এ যাবৎ তাহার উপর কোনো প্রকার ভূমিকম্পের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। আমরা ঐরূপ একটি মোছলেম ছাত্রাবাস পাইলেই তৃপ্ত হইব, তদপেক্ষা অধিকতর ব্যয়-সাপেক্ষ প্রাসাদের আমরা প্রয়াসী নহি'।[৫১] ফুলার সাহেব মুসলিমবিদ্বেষী অধ্যক্ষের চতুরতা বুঝতে পেরে মৃদু হেসে মুসলিম হোস্টেলের প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

ফুলার সাহেব সন্ধ্যায় তাঁর লঞ্চে একটি সভা ডাকলেন এবং সেখানেই মুসলিম হোস্টেল তৈরীর পরিকল্পনা ও ৭৫,০০০ টাকা অনুমোদন করলেন। পরবর্তীতে হিন্দুদের তীব্রবিরোধিতার মুখেও দ্বিতল বিরাট হোস্টেল নির্মাণে খানবাহাদুর সক্ষম হন। ছোটলাট সাহেবের নামানুসারে 'ফুলার হোস্টেল' নামকরণ করা হয়।[৫২] প্রথমে কলেজিয়েট স্কুল ও মাদরাসার ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও পরবর্তীতে রাজশাহী কলেজের ছাত্রদের জন্যই ব্যবহৃত হতে থাকে। হোস্টেলটি রাজশাহীবাসীর গৌরবে পরিণত হয়েছিল। 'ফুলার হোস্টেল' নির্মাণের পেছনে খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদানের কথা অনেকে ভুলে গেলেও তাঁর এ অবদানকে মানব সেবার ক্ষেত্রে এক স্মার্থক প্রয়াস বলা যায়।[৫৩] মানব সেবার মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েই তরুণ বয়সে এ রকম জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। আজকের রাজশাহী ফুলার হোস্টেল খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার দুঃসাহসিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এ

40419

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. প্রবন্ধ : সাধক শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩; *বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৬-১৯৯৭)*, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন, পৃ. ১৭।

৫১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ২২।

৫২. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৫৩. প্রবন্ধ : মানব কল্যাণব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বিশেষ ক্রোড়পত্র, পৃ. ৫।

সম্পর্কে গোলাম মঈনউদ্দিন-এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> The Fuller Hostel of Rajshahi is a glowing witness to his immortal contributions.
>
> অর্থাৎ, রাজশাহীর ফুলার হোস্টেল নির্মাণ তাঁর (খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার) অমর অবদানের অন্যতম সাক্ষী।[৫৪]

তৎকালীন সময়ে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের একই গৃহে থাকার কারণে সামাজিক সমস্যা দেখা দিত। পারস্পরিক স্পর্শ, জাত ও বর্ণের বৈষম্যের বেড়াজালে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু ছাত্রদের পক্ষ থেকে মুসলমান ছাত্রদের সঙ্গে একত্রে আহার ও অবস্থানে আপত্তি উঠত।[৫৫] এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে স্বতন্ত্র হোস্টেলের প্রস্তাব করেন, কিন্তুখানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রস্তাব ছিল ভিন্ন প্রকৃতির ও বাস্তবানুগ।[৫৬] আহারের ক্ষেত্রে হিন্দু সমাজের গোঁড়ামী তাৎক্ষণিকভাবে দূরীভূত করা সম্ভব ছিল না, অপরদিকে তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র হোস্টেল নির্মাণও ছিল অসম্ভব। আবাসিক সমস্যার কারণে মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে বাধাগ্রস্ত না হয় সে জন্য তিনি আহার ও রান্নাঘর পৃথক রেখে একই গৃহে বিভিন্ন ধর্মের ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করার জন্য সুপারিশ করেন।[৫৭] এক সঙ্গে বাস করলে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠবে বলে তিনি মতপ্রকাশ করেন। এক্ষেত্রে তাঁর উদার ও অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁরই পরামর্শক্রমে হিন্দু-মুসলিম ছাত্ররা একই ছাত্রাবাসে থেকে পড়ালেখা করার সুযোগ লাভ করে। পরবর্তীতে খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলকাতার বুকে মুসলিম

---

৫৪. Gholam Moyenuddin, *Khan Bahadur Ahsanullah (R) A small Introduction, Ibid.*

৫৫. বদরুদ্দীন উমর, *সংস্কৃতির সংকট*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১; ড. কীরণ চন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১।

৫৬. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের কাছে সাক্ষ্য প্রদানকালে তিনি বলেন– 'Hindu and Muhammadan borders should as possible, be accomodated in the same place, seperate arrangment being made for cooking and other purposes. Combined hostel will be wellcomed both from the ... and will permil at an organised tutorial system'. *Calcutta University Commision*, 1917-1919, Part-1, Vol-1, Chapter-VI, P. 178.

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৯।

ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল ও কারমাইকেল হোস্টেল প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৮] এ সকল হোস্টেলে থেকে মুসলমান ছাত্ররা পড়ালেখার ব্যাপক সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এ ছাড়া কলকাতায় 'দি মুসলিম ইন্সটিটিউট' প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫৯] কলকাতায় যা এখনও কালের সাক্ষী হিসেবে বিদ্যমান।

রাজশাহীতে মুসলমান ছাত্রদের ইসলামী শিক্ষার জন্য মাদরাসার বড় অভাব ছিল। কলেজের কয়েকটি অন্ধকারাচ্ছন্ন কক্ষে মাদরাসার পাঠদান কার্যক্রম চলত। খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মিশনারীদের বিস্তৃত এলাকা অধিগ্রহণ করে তা মাদরাসার জন্য বরাদ্দ করেন। এর ফলে মাদরাসার ছাত্ররা প্রশস্ত পাকা ঘর, বিস্তৃত খেলার মাঠ ও উপযুক্ত ছাত্রাবাস লাভ করে।[৬০] ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তাঁর এ অবদান মুসলিম জাতি যুগ যুগ ধরে মনের মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করবে। রাজশাহীতে সে সময় কোন মুসলমান ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হতে পারতেন না। খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বহু প্রচেষ্টার ফলে 'মৌলবী মোহাম্মদ এমাদউদ্দীন বিএল' সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।[৬১] এমনিভাবে তিনি রাজশাহীতে অবস্থানকালে রাজশাহী এলাকার মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে বহুবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ

শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সামাজিক চেতনার সঠিক মূল্যায়ন আজো হয়নি। কারণ আজীবন শিক্ষাপ্রিয়তার অবদানগুলো অনেকের চোখে পরিদৃষ্ট হয় না অথবা

---

৫৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৩।

৫৯. ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ২৭।

৬০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভাষায়– 'রাজশাহীতে একটি মাদ্রাসা ছিল, কলেজ গৃহের মধ্যে কয়েকটি অন্ধ কক্ষে ক্লাস বসিত। মিশনারীদিগের একটি বিস্তৃত প্রাঙ্গন ছিল। আমারই পরামর্শে উক্ত প্রাঙ্গন Acquire করা হয় এবং সেখানেই মাদ্রাসা নীত হয়। উহা প্রশস্ত পাকা গ্রহে অবস্থিত, তদ্ব্যতীত বিরাট খেলিবার মাঠ ও ছাত্রাবাসের সরঞ্জাম বিদ্যমান।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২।

৬১. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ২৩; ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯; প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা* (বর্ষপূর্তি সংখ্যা), পৃ. ২১৫।

এড়িয়ে যেতে চান। মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুস্তক মুদ্রণ, পুস্তক প্রকাশনা এবং পুস্তক ব্যবসার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এ শতাব্দীর প্রথম দিকে ঐতিহাসিক কারণে বাঙালী মুসলিম সমাজ ব্যবসা ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ছিল। কাজেই পুস্তক ব্যবসার মত জনগুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় তাদের দৃষ্টি ছিল না। অথচ বাঙালী মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশের সাথে এ ব্যবসায়ের একটা যোগাযোগের ব্যাপার ছিল।[৬২] কলকাতা কলেজ স্ট্রিট ও কলেজ স্কোয়ারের বেশীর ভাগই ছিল হিন্দুদের। তারা স্কুল-কলেজে শিক্ষকতার পাশাপাশি নিজেদের উদ্যোগে লাইব্রেরী খুলে বইয়ের ব্যবসা করত।[৬৩] তিনি সেই দুঃসময়ে প্রবল প্রতাপশালী, স্বার্থান্বেষী ও মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও মুদ্রকগণের মোকাবেলায় তাদের নাকের ডগায় ছিলেন একমাত্র সাহসী ব্যক্তিত্ব।

খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর চাকরি জীবনে কনিষ্ঠ ভাই খানবাহাদুর মোবারক আলীর জন্য ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতা কলেজ স্কোয়ারে একটি পুস্তকের দোকানের ব্যবস্থা করে দেন।[৬৪] তাঁর পীর-মুর্শিদের ইঙ্গিতে বিহার শরীফের বুজুর্গ হযরত মাখদুমুল হক (র.)-এর নামানুসারে এর নাম 'মখদুমী লাইব্রেরী' রাখা হয়।[৬৫] তাঁর এ লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা ছিল মুসলিম শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রসারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যা সে সময় আরো অনেকের উৎসাহের উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিছুকাল পর স্বীয় পুত্র মোঃ বদরুদ্দোজাকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তিনি 'এম্পায়ার বুক হাউস' নামে আরেকটি লাইব্রেরী স্থাপন করেন। পরবর্তীতে এ লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে 'আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' রাখা হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে উক্ত দু'টি লাইব্রেরী 'মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানিয়া বুক হাউস' নামে একীভূত হয় এবং ৩নং কলেজ স্কোয়ার থেকে ১৫নং কলেজ স্কোয়ারে (এলবার্ট হলের দক্ষিণে) স্থানান্তরিত হয়।[৬৬] তৎকালীন কলকাতায় 'ইসলামিয়া লাইব্রেরী', 'মোসলেম ভারত লাইব্রেরী'সহ যে ক'টি হাতে গোনা মুসলিম লাইব্রেরী ছিল তাঁর মধ্যে খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মখদুমী লাইব্রেরী' ছিল

---

৬২. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, পৃ. ৯।

৬৩. কাজী আবুল কাসেম, প্রবন্ধ : কলিকাতায় আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮, পৃ. ৮।

৬৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১।

৬৫. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

৬৬. গোলাম মঈন উদ্দিন, প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃ. ২১৭; এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

অন্যতম। প্রাক স্বাধীনতা যুগে এ লাইব্রেরী ইসলামী গ্রন্থ সরবরাহ ও প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।[৬৭]

এই লাইব্রেরী থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শ্রেণীর বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয় এবং সর্বত্র এ প্রতিষ্ঠানের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তবে 'মখদুমী লাইব্রেরী'র ভিত্তি স্থাপন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভুল হবে। খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন একজন সত্যিকার শিক্ষানুরাগী ও মনেপ্রাণে সাহিত্যানুরাগী। তাই তিনি তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসেবে এ লাইব্রেরীকে ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক মানসিকতা নয়, একান্ত আন্তরিকতা ও সুহৃদয়তার সাথে এখান থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ করা হত।[৬৮] মখদুমী লাইব্রেরীর উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অনেক মুসলমান লেখক নতুন নতুন সৃজনশীল সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি মনোনিবেশ করেন। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি এ লাইব্রেরীর সাথে জড়িয়ে পড়েন। তৎকালীন আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'আনোয়ারা'র মত গ্রন্থ এ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।[৬৯]

মখদুমী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'আনোয়ারা' গ্রন্থটি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে।[৭০] সুতরাং শুধুমাত্র মুসলিম শিক্ষার ক্ষেত্রে নয়, মুসলিম সাহিত্যের বিকাশেও তিনি অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র সম্পাদনায় শিশুদের জন্য সচিত্র মাসিক পত্রিকা 'আঙুর' এ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়। এ লাইব্রেরী থেকে 'কাজী

---

৬৭. *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, পৃ. ১১০-১১১।

৬৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৪।

৬৯. মোঃ মালেকুজ্জামান, *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী*, পৃ. ৫; প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবকে যতটুকু দেখেছি, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, ৭৬-৭৭। বিষাদ সিন্ধু সম্পর্কে খানবাহাদুর মোবারক আলী বলেছেন– '... হঠাৎ একদিন নদীয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মীর মশাররফ হোসেন সাহেবের জেষ্ঠ্যপুত্র মীর ইব্রাহীম হোসেন সাহেব তাঁর পিতার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' অবাঁধা অবস্থায় গাড়ী ভর্তি করিয়া আমার দোকানে আনিয়া জমা দিলেন। চুক্তি হইল-বাঁধাই খরচ বাদে ২৫ টাকা হিসাবে কমিশন পাইব।' দ্র. *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী, আমাদের পরিচয়*, কলকাতা : সুরিস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৬, পৃ. ১৫।

৭০. 'আনোয়ার' গ্রন্থ সম্পর্কে প্রকাশক খানবাহাদুর মোবারক আলীর বক্তব্য– 'সে সময়ে পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পর গ্রামবাসীগণ হয়ত কোন বৃদ্ধলোকের নিকট গিয়া গল্প শুনিত অথবা তাস পাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। কিন্তু যে গ্রামে একখানা 'আনোয়ারা' গ্রন্থ গিয়াছে সেখানে সকলে অবাক হইয়া আনোয়ারার কেচ্ছা শুনত। এই কারণে পুস্তকটি প্রচুর বিক্রী হইতে থাকে। এ আনোয়ারা গ্রন্থটি দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা করিবার আগ্রহ সৃষ্টি করে...।' দ্র. খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী, *আমাদের পরিচয়*, পৃ. ১৫-১৬।

নজরুল ইসলাম'[৭১]-এর 'জুলফিকার', 'বন্য গীতি', 'কাব্যে আমপারা', খ্যাতনামা কথাশিল্পী আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'পরিত্যক্ত স্বামী', সৈয়দ আলী আহসান প্রণীত 'নজরুল ইসলাম', আশরাফউজ্জামান প্রণীত 'খেয়া নৌকার মাঝি', শেখ হাবিবুর রহমান প্রণীত 'বাশরী', 'নিয়ামত' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এছাড়া হিরণ রেখা, ঘরের লক্ষ্মী, নতুন বৌউ, প্রেমের সমাধি, খেয়াতরী, পারের পথে, আলোকের পথে, সোলতানা রাজিয়া, কালা পাহাড়, প্রণয় যাত্রী, স্বর্গোদ্যান, দুনিয়া আর চাহিনা, চিন্তার ফুল, বীর কাসেম, পীরের কাহিনী, ডনকুইস্ট সোস্ট, শিশুর মজলিশ, ছোটদের হজরত মোহাম্মদ (ছঃ), হজরত ফাতেমা (রাঃ), বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ, হেজাজ ভ্রমণ ইত্যাদি বহু গ্রন্থ এ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হয়।[৭২] এছাড়াও সে সময় যে সকল সাহিত্যিক বই লিখে হিন্দু প্রকাশকদের দুয়ারে দুয়ারে ঘরে বেড়াতেন বই প্রকাশের জন্য, তাঁদেরকে তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানান এবং প্রথম অবস্থায় অত্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণ করে এ সমস্ত লেখকদের বই প্রকাশ করেন। বিশিষ্ট লেখিকা জোবেদা খানম 'হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবকে যতটুকু দেখেছি' শিরোনামে তারই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন।[৭৩]

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে সরকারী নির্দেশ বলে মুসলমান লেখকদের প্রণীত পুস্তকই মক্তব-মাদরাসার পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। মখদুমী লাইব্রেরী এ সময়ও একটি

---

৭১. কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি।

৭২. এ. এফ. এম এনামুলক হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮।

৭৩. তিনি বলেন– 'আমার আব্বা সাহিত্য চর্চা করতেন। লিখতে ভালোবাসতেন। বাড়ি বসে কয়েকখানা উপন্যাস লিখে ফেললেন। তারপর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে ঘুরলেন অনেক প্রকাশকের কাছে, কিন্তু কেউ সে পাণ্ডুলিপি ছাপানোর ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সে যুগে মুসলমানগণ পুস্তক ব্যবসা করতে আগ্রহ দেখাতেন না। সুতরাং সব ব্যবসায়ীই ছিলেন হিন্দু সমাজের লোক। খুব প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লেখকের লেখা তাঁরা দুই একটা ছাপাতেন, কিন্তু নতুন লেখকদের ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহ তো দেখাতোই না; বরং অবজ্ঞাই দেখাতেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেব তাঁর ছোট ভাই মোবারক আলীর জন্য মখদুমী লাইব্রেরী নামে একটি পুস্তক বিক্রয়ের দোকান দিয়েছিলেন কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যবসা ছিলো না। মুসলমান সমাজে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেওয়া এবং নিজের কৃষ্টি ও ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানদের সচেতন করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। অবসর গ্রহণের পর তিনি মখদুমী লাইব্রেরী পুস্তক প্রকাশনালয় করলেন। আমার আব্বা আজহারুল ইসলাম সসংকোচে তাঁর লেখা 'আলোকের পথে', 'আশার আলো', 'হিমালয় বক্ষে' উপন্যাস তিনটির পাণ্ডুলিপি নিয়ে তাঁর কাছে গেলেন। সঙ্গে নিয়ে গেলেন আমাকে।... তারপর বেশ সঙ্কোচের সংগেই আবার তার পাণ্ডুলিপির কথা পাড়লেন। খানবাহাদুর সাহেব অতি আগ্রহের সঙ্গে পাণ্ডুলিপি তিনটি টেনে নিলেন, এতদিন আসেন নাই কেন? আমি মুসলমান লেখকদের লেখা ছাপাবার জন্যই এই লাইব্রেরী খুলেছি, আপনার বই অবশ্যই ছাপাব। আপনি পাণ্ডুলিপি রেখে যান।' দ্র. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবকে যতটুকু দেখেছি, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮।

যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে। মুসলমান লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক বিপুল পরিমাণে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি একমাত্র মখদুমী লাইব্রেরীই গ্রহণ করেছিল। মুসলিম সাহিত্যে উৎসাহী ও অনুরাগী পাঠক-পাঠিকা মখদুমী লাইব্রেরীর এ অবদানের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। এ লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত সেদিনের সচিত্র বর্ণ পাঠ, প্রথম পড়া, মক্তব বর্ণ পাঠ, মক্তব বাল্য শিক্ষা, নীতি ও শিক্ষা, মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য, ধারাপাত, আমপারা, উর্দূ কায়দা প্রভৃতি বই বহু মুসলিম শিক্ষার্থীর পাঠ্য বইয়ের অভাব পূরণ করেছিল। এ সকল পুস্তক মুসলিম সমাজে শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[৭৪]

লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে খানাবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজেই বলেছেন :

> ধুম গতিতে লাইব্রেরীর কাজ চলিতে থাকিল। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও কর্মীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইলাম। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পাঠ্যের বই এবং অন্যান্য বহু পুস্তক আমরা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। দিকে দিকে আহ্ছানউল্লা বুক হাউসের সুনাম সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আমাকেও পুস্তক লেখার আবার কখনো লাইব্রেরীর কাজে সারা দিনরাত খাটিতে হইত।[৭৫]

সে সময় হাতে গোনা ক'টি ছাড়া অন্যকোন উন্নত ও রুচিশীল মুসলিম প্রকাশনালয় ছিল না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার পুত্র মোঃ বদরুদ্দোজা তাঁর লাইব্রেরীর মাধ্যমে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল খ্যাতনামা তরুণ মুসলমান সাহিত্যিক, কবিদের কিছু কিছু বই সর্বাঙ্গীন সুন্দর, উন্নত ও নান্দনিক রুচিসহকারে প্রকাশ করা।[৭৬] তাছাড়া সে সময় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার আহবানে ও প্রেরণায় বহু মুসলমান নিজেদের ধর্ম ও ঐতিহ্য মুসলমান সমাজের কাছে তুলে ধরার জন্য কলম ধরেছিলেন। তাঁদের বইগুলো নিয়মিত ও দ্রুত মখদুমী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত হতে লাগল।

এ সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তৎকালীন মুসলমান লেখক-লেখিকাদের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন। এ লক্ষ্যে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য তিনি 'মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস প্রতিষ্ঠা করে ইসলামপ্রিয় মানুষের মনে এক বিরাট স্থান দখল করেছিলেন।

---

৭৪. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ৩৫; প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, পৃ. ২১৭; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ১৭-১৮; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২।

৭৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ১০১-১০২।

৭৬. মাহফুজুর রহমান খান, প্রবন্ধ : নজরুলের জুলফিকার ও বনগীতি, *নজরুল একাডেমী পত্রিকা*, গ্রীষ্ম-বর্ষা সংখ্যা, ১৩৮৪ বাংলা, পৃ. ১১১।

রচনাবলীর মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ

মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদানের অত্যন্ত উজ্জ্বল উপমা হচ্ছে ইসলামী ভাবধারা সম্বলিত তাঁর অসংখ্য রচনা। তাঁর রচনায় ইসলামের তত্ত্ব ও আদর্শসমূহ ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রয়েছে তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্র।[৭৭] তৎকালীন মৃতপ্রায় মুসলমানদের নবজাগরণের জন্য তিনি মুসলিম ঐতিহ্য, ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিধি-বিধান সম্পর্কিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।[৭৮] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থগুলোর বিষয়ভিত্তিক নাম ও সংখ্যা তালিকা এখানে উপস্থাপন করা হল :

জীবনী বিষয়ক

১. হজরত মোহাম্মদ
২. ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ
৩. বিশ্ব শিক্ষক
৪. ইছলাম নবী
৫. পেয়ারা নবী (শিশু সাহিত্য)
৬. ছেলেদের মহানবী (শিশু সাহিত্য)
৭. ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ (ধর্ম)
৮. আল ওয়ারেছ
9. Al-WARIS
১০. কুতুবুল আকতাব হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ
১১. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (সংক্ষিপ্ত)
১২. হাজী ওয়ারেছ আলী শাহ (অনুবাদ)
১৩. আমার জীবন ধারা (আত্মচরিত)
১৪. মোস্তফা কামাল
১৫. এবনে ছউদ
১৬. দরবেশ জীবনী

---

৭৭. নবাব আবদুল লতিফ খান, *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭।

৭৮. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, পৃ. ২১৮।

১৭. হজরত মহর্ষি রুমি আলাইহে রহমত
১৮. হজরত ফাতেমা
১৯. আউলিয়া চরিত
২০. মহানবীর কথা

ইতিহাস বিষয়ক

১. মোছলেম জগতের ইতিহাস
২. History of the Muslim World
৩. ইছলামের ইতিবৃত্ত
৪. আমাদের ইতিহাস (পাঠ্য পুস্তক)
৫. ভারতের ইতিহাস (ইংল্যান্ডের ইতিহাস সম্বলিত)
৬. রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা–১ম খণ্ড (জীবনী) ও ২য় খণ্ড (পাকিস্তান)
৭. ইছলামের দান (মুসলিম মনীষীদের অবদান সম্পর্কিত)
৮. মুছলিম জাহান (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)
৯. মুছলিম প্রাচীন ভূ-ভাগের মানচিত্র
১০. সৌদি আরব
১১. ইতিবৃত্ত
১২. পুরাবৃত্ত
১৩. মধ্য ও দূর প্রাচ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (অপ্রকাশিত)
১৪. মধ্য ও দূর প্রাচ্যের মুছলিম রাষ্ট্র সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় (অপ্রকাশিত)

কুর'আন ও হাদীস বিষয়ক

১. কোরআন ও হাদীসের আদেশাবলী
২. কোরআনের সার
৩. হজরতের রচনাবলী
৪. কোরআনের শিক্ষা
৫. কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ
৬. বাংলা হাদীছ শরীফ (১ম খণ্ড)
৭. বাংলা হাদীছ শরীফ (২য় খণ্ড, অপ্রকাশিত)

৮. হাদীছ গ্রন্থ

৯. সংক্ষিপ্ত হাদীস

ইসলামী বিধান বিষয়ক

১. আল ইছলাম

২. নামাজ শিক্ষা (ধর্ম ও ফেকাহ্)

৩. নামাজের ছুরা

৪. দোয়া ও দরূদ

৫. ইছলামের মহতী শিক্ষা

৬. মোছলেমের নিত্য-জ্ঞাতব্য

৭. মহাপুরুষদের অমীয় বাণী (ধর্মীয় উপদেশ)

৮. পাঁচ ছুরা

৯. ইছলামী তালীম

১০. বাংলা মৌলুদ শরীফ

১১. তালীমী দীনিয়াত

১২. আরবী দোয়া (বাংলা উচ্চারণ ও অনুবাদসহ)

১৩. ইছলাম ও জাকাত (জাকাত ও সমাজতন্ত্র)

১৪. দীনিয়াত (১ম ভাগ)

১৫. দীনিয়াত (২য় ভাগ)

১৬. দীনিয়াত (৩য় ভাগ)

১৭. দীনিয়াত (৪র্থ ভাগ)

স্কুল-মাদরাসার পাঠ্য বিষয়ক

১. পদার্থ শিক্ষা (১৯০৫)

২. দীনিয়াত শিক্ষা (১ম ভাগ)

৩. দীনিয়াত (২য় ভাগ)

৪. দীনিয়াত (৩য় ভাগ)

৫. দীনিয়াত (৪র্থ ভাগ)

৬. প্রথম পড়া

৭. Childs's Grammer

৮. The Reader

৯. The Primer
১০. First Book of Translation
১১. Second Book of Translation

শিশু সাহিত্য বিষয়ক

১. মক্তব সাহিত্য (১ম খণ্ড)
২. মক্তব সাহিত্য (২য় খণ্ড)
৩. মক্তব সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
৪. বাংলা সাহিত্য (১ম খণ্ড)
৫. বাংলা সাহিত্য (২য় খণ্ড)
৬. বাংলা সাহিত্য (৩য় খণ্ড)
৭. বাংলা সাহিত্য (৪র্থ খণ্ড)
৮. প্রাইমারী সাহিত্য (১ম খণ্ড)
৯. প্রাইমারী সাহিত্য (২য় খণ্ড)
১০. প্রাইমারী সাহিত্য (৩য় খণ্ড)

দর্শন বিষয়ক

১. ছুফী (তাছাওয়াফ)
২. সৃষ্টি তত্ত্ব
৩. আমার শিক্ষা ও দীক্ষা (তাছাওয়াফ)

ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক

১. বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য
২. মাওয়া

শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতি বিষয়ক

১. টিচারস্ ম্যানুয়েল (১৯১৬)
২. নীতি শিক্ষা ও চরিত্র গঠন (ধর্ম ও নীতি)
৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান

আহ্ছানিয়া মিশন বিষয়ক

১. আহ্ছানিয়া মিশনের মত ও পথ

২. আহ্ছানিয়া মিশনের মূল নীতি

তাছাওয়াফ বিষয়ক

১. ভক্তের পত্র (পত্র সাহিত্য)

২. প্রেমিকের পত্রাবলী (পত্র সাহিত্য)

৩. তরীকত শিক্ষা

পত্র সংকলন

(পরবর্তীতে সংকলিত)

১. ইরশাদে মুরশীদ

২. অমীয় বাণী

বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা বিষয়ক

১. ইছলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি

২. বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী

স্বাস্থ্য

১. মানবের পরম শত্রু

ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক

১. হেজাজ ভ্রমণ

কবিতা

১. গীত গুচ্ছ (অপ্রকাশিত)

অগ্রন্থিত প্রবন্ধ

১. অতীত দিনের কাহিনী (মাসিক মোহাম্মদী)

২. মুছলিম শিক্ষা সমস্যা (মাসিক মোহাম্মদী)

৩. ধন ও ব্যভিচার (মাসিক মোহাম্মদী)

৪. সান্দারদের প্রতি অবিচার (সাম্যবাদী)

৫. মোল্লাদের প্রভাব ও শিক্ষিত সমাজ (মাসিক শরিয়াতে এসলাম)

৬. মিশন প্রতিষ্ঠাতার গুজারেশ

৭. আহ্ছানিয়া মিশনের মুখ্য উদ্দেশ্য (বার্ষিক রিপোর্ট, নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন)[৭৯]

এছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টেও তাঁর কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। আহ্ছানিয়া মিশনের বার্ষিক রিপোর্টে তাঁর বহুমুখী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এ সকল রিপোর্টেও তিনি শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মুসলিম জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির কথাই তুলে ধরেছেন।

আল কুর'আন ও আল হাদীসের শিক্ষা ব্যতীত মুসলমানদের কোন শিক্ষাই পূর্ণ হয় না। এ কথা তিনি মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই আল কুর'আন ও আল হাদীস বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। আল কুর'আনের অমূল্য বাণীকে তিনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপনের উপযোগী করে তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার যথাযথ মূল্যায়ন করে পাঠক মনে বদ্ধমূল করতে চেষ্টা করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর মতে– 'ইসলাম বিজ্ঞানের অনুকূল, প্রতিকূল নহে।'[৮০] তাঁর রচিত আল কুর'আন ও আল হাদীস বিষয়ক রচনাবলীর ভাব, ভাষা ও বিষয়বস্তু আমাদের এক অলৌকিক জগতের সন্ধান দেয়। সংসারাচ্ছন্ন মনকে সকল বন্ধন ছিন্ন করে পরম করুণাময়ের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর মধ্যে বিলীন হওয়ার পথ দেখায়।

মুসলমানদের হারানো ঐতিহ্য ও ধর্মীয় চেতনার পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে রচিত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবনী বিষয়ক গ্রন্থগুলোর উপযোগিতা ও ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। এ পর্যায়ে তিনি ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য চরিত্র পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব 'হযরত মুহাম্মদ (স.)' ও অলী-আওলিয়াদের জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়ক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনী রচনা করেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী রচনার উদ্দেশ্য তিনি তাঁর 'ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (ছঃ)' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় এভাবে বর্ণনা করেছেন :

---

৭৯. বাংলা একাডেমী সম্পাদিত, *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯-৫০; *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮১-১৮২; *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৩২-৩৭; *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) রচিত পুস্তক পুস্তিকা ও প্রবন্ধের তালিকা*, আল-আহ্ছান, ১৫তম বর্ষ সংকলন, ২০০০, পৃ. ৩১- ৩২।

৮০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *কোরআনের বানী ও একত্ববাদ*, খুলনা : আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, ২য় সং, ১৯৫১, পৃ. ৭৬।

> বঙ্গভাষায় আঁ হজরতের জীবনী অপ্রতুল নহে; কিন্তু তাঁহার জীবনীকে ইসলামের নীতিসমূহের ঠিক পাশাপাশি সজ্জিত করিয়া সহজে সাধারণের বোধগম্য করিবার সম্যক চেষ্টা হইয়াছে এরূপ বোধ হয় না। এইজন্য ভারতবাসী মোছলেমের উপর আঁ হজরতের পবিত্র জীবনের বিশেষ কোন প্রভাব দেখা যায় না।[৮১]

এগুলোতে শুধু নবী-জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীই উল্লেখিত হয়নি। ইসলামের আবির্ভাব ও ক্রমবিকাশের সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ চিত্রও প্রস্ফুটিত হয়েছে। 'ইছলাম ও আদর্শ মহাপুরুষ' গ্রন্থ সম্পর্কে প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল হাই যথার্থই মন্তব্য করেছেন।[৮২] তাঁর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'আমার জীবন ধারা'।[৮৩] গ্রন্থটিতে তাঁর জীবনের বিস্তৃত ঘটনা খণ্ড চিত্র আকারে উল্লিখিত হয়েছে।[৮৪] তাঁকে জানার জন্য, তার সময় ও কালকে বুঝার জন্য, দেশ-জাতি ও সমাজের জন্য উৎসর্গিত এ মনীষীর কর্মবহুল জীবনের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এ জীবনী গ্রন্থটি একটি ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে স্বীকৃত হতে পারে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ইতিহাস বিষয়ক রচনার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে মুসলমানদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী। এতে তিনি মুসলিম সভ্যতার প্রসারগত দিক বিস্তৃততাবে আলোচনা করেছেন। বস্তুতঃ তাঁর সমগ্র রচনা ইতিহাসের রসে ভরপুর।[৮৫] ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এরূপ :

> ইতিহাস জাতীয় জীবনের প্রধানতম উৎস এবং ইতিহাস আলোচনা জাতীয় উন্নতির সুপ্রশস্ত সোপান। ইতিহাস অতীতের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের জীবন-যুদ্ধের ধারার সন্ধান বলিয়া দেয় এবং তাহাদের গুণ গরিমায় এবং বীরত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে সেই সংগ্রামে জয়লাভ করিবার শক্তি প্রদান করে।[৮৬]

---

৮১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ইছলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (সঃ)*, ভারত : চব্বিশ পরগণা, ১৯৫২, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৮২. '... আহ্ছানউল্লা ভক্ত, সুতরাং ইসলাম প্রচারক আদর্শ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে তাঁর গ্রন্থে যে ভক্ত মনের পরিচয় তিনি দেবেন তা অবধারিত। এই বইটিতে প্রকৃতপক্ষে ঘটেছেও তাই। এই বইটিতে সূফী তত্ত্বের প্রভাব পড়েছে'। দ্র. মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২য় সং, ১৯৮৬, পৃ. ১৬৪।

৮৩. এ গ্রন্থটি ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে মখদুমী লাইব্রেরী, কলকাতা থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এর সর্বশেষ সপ্তম সংস্করণ হয় ২০০০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে।

৮৪. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য কর্ম, *কারমাইকেল কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৬।

৮৫. এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১।

৮৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *মুছলিম জাহান*, ঢাকা : মজিদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৩, পৃ. ৩।

প্রত্যেক যুগের ঐতিহ্য নিয়ে বর্তমান ইতিহাস রচিত।[৮৭] এ আলোকেই তিনি ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। 'রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা'[৮৮] শীর্ষক গ্রন্থে তিনি মোঘল বাদশাহ্ ও আওরঙ্গজেবেরর শাসনপ্রণালীই শুধু বর্ণনা করেননি; বরং ধর্ম, শিক্ষা এবং কৃষ্টি-সভ্যতায় তাঁর অবদান সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা ও মূল্যায়ন করেছেন। গ্রন্থটিতে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও বর্তমান যুগের শিক্ষা-সভ্যতার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক আর্যযুগের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা, দিল্লীর সুলতান ও মোঘল আমলের ইতিহাস ও তৎসহ পাকিস্তানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন।[৮৯]

ধর্মের ক্ষেত্রে অজ্ঞতা মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। আবার ধর্ম সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান অর্জন ছাড়া ধর্মের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের আকর্ষণ ও অনুরাগ সৃষ্টি হয় না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এ দু'টি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অনেগুলো গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইসলাম সম্পর্কে আলোচনার সময় তিনি সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে যেমন বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরেছেন, তেমনি প্রকাশিত হয়েছে ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ।[৯০] তাঁর রচিত এ গ্রন্থগুলো পাঠ করলে মানুষের মনে ইসলামের প্রতি অনুরাগ ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পাবে এবং পাঠক সত্যিকার মুসলমান হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। 'ইছলাম ও জাকাত'[৯১] গ্রন্থে তিনি দেশ-বিদেশের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং দেশের কম্যুনিজম সম্পর্কে ইসলামের মধ্যপথ অবলম্বনের ইতিহাস থেকে শুরু করে ইসলামে সম্পদ আহরণ ও বন্টনের কথা অত্যন্ত সুন্দর, সাবলীল ও যুক্তিসহকারে আলোচনা করেছেন।

তিনি শিশু সাহিত্যের মধ্যে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে নীতি শিক্ষার সংযোগের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। শিশুদের পড়ালেখার ধারাকে যতদূর সম্ভব সহজ-সরল করে তুলে ধরার প্রচেষ্টা তাঁর লেখার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। চরিত্র গঠন, নীতি শিক্ষা ও ধর্মশিক্ষার প্রতি তাঁর

---

৮৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা*, ভারত : ভাঙ্গড়, চব্বিশ পরগণা, ১৯৪৯, অবতরণিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৮৮. এ গ্রন্থটি ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে চব্বিশ পরগণা ভারত থেকে ডাঃ মুহাম্মদ সৈয়দ আলী এল.এম.এফ. কর্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮৯. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

৯০. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সাহিত্য ভাবনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

৯১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচিত ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কিত 'ইছলাম ও জাকাত' গ্রন্থটি আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী খুলনা থেকে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়।

কঠোর দৃষ্টি ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, চরিত্রই মানব জীবনের একমাত্র মূল্যবান সম্পদ।[৯২] তাঁর রচিত শিশু-কিশোরদের উপযোগী অধিকাংশ গ্রন্থের মধ্যে এ মনোভাব ও মূল্যবান শিক্ষা ঐকান্তিকতা সহকারে বিধৃত হতে দেখা যায়। আমরা আজকের দিনে বাংলা ভাষার শব্দ গঠন, শব্দের বানান ও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সরলীকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি তা পঞ্চাশের দশকে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সচেতন মনকে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর রচিত 'ছেলেদের মহানবী' গ্রন্থে এর বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন– 'যুক্তাক্ষর শিশু পাঠ্যের প্রধান অন্তরায়। দ্বিতীয় অন্তরায় ফলাযোগে অক্ষরের আকার পরিবর্তন। এই অন্তরায়কে অতিক্রম করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।'[৯৩]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একজন ইসলামী দার্শনিক, তরীকতপন্থী সূফী-সাধক ছিলেন। জীবন, জগত ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর গভীর, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন মূল্যবোধ ছিল। তিনি ধর্মকে দর্শনের আলোকে দেখতেন এবং স্বার্থক ও সফল জীবনযাত্রার উপযুক্ত প্রায়োগিক উপকরণ হিসেবে মনে করতেন। তাঁর মতে– 'মানব জীবনের চরম লক্ষ্য পরমাত্মার জ্ঞান। মানবাত্মা পরমাত্মা হইতে আগত এবং পরমাত্মার সহিত পুনর্ম্মিলনই মানবাত্মার উদ্দেশ্য।'[৯৪] আর পরমাত্মার সাথে মিলনপ্রচেষ্টাতেই তিনি জীবন অতিবাহিত করেন। তাঁর রচিত 'ছুফী'[৯৫] গ্রন্থটিতে আল্লাহর স্বরূপ এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্ক তথা স্রষ্টার সাথে মানবের সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবশ্য করণীয় বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এতে তিনি সূফী তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।[৯৬] যা মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করে।

স্রষ্টা, সৃষ্টি ও ধর্ম সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা একটি স্বচ্ছ ও উদার মনোভাব পোষণ

---

৯২. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মতে– 'চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পদ। চরিত্রবান হইতে দৃঢ় সংকল্প হওয়া একান্ত কর্তব্য। সত্য কথন, মাতা-পিতা ও গুরুজনের ভক্তি, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার শিক্ষা মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী*, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনী, ১৯৬৪, পৃ. ৭১।

৯৩. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছেলেদের মহানবী*, খুলনা : আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫১, ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

৯৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, ঢাকা : মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী, ২য় সং, ১৯৪৭, পৃ. ১১০।

৯৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচিত 'ছুফী' গ্রন্থটি ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদ কাসিম কর্তৃক মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী ঢাকা থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৯৬. তিনি এ গ্রন্থে বলেন– 'এই সংসারের মধ্যে অবস্থিতি কর কিন্তু সংসার কীট সাজিও না; তোমার সমস্ত চিন্তা শক্তি আত্মার উন্নতি পথে নিয়োগ কর, তবেই জাগতিক কর্তব্য প্রকৃতরূপে প্রতিপালিত হইবে।' দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯।

করতেন বলেই বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর উদারনৈতিক আদর্শবোধের প্রতিফলনও সমভাবে লক্ষ্য করা যায়। এ পর্যায়ে তিনি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)সহ অন্যান্য মহাপুরুষগণের পরামর্শবিষয়ক অমীয় বাণী সম্বলিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী' গ্রন্থে তিনি বলেছেন :

> স্রষ্টা দয়ার সাগর রহমানুর রহীম। তিনি যুগে যুগে ভ্রান্ত মানবকুলের পথ নির্দেশের জন্য বিভিন্ন পথ প্রদর্শক প্রেরণ করিয়াছেন। ... স্রষ্টার উদ্দেশ্য চিরকালের জন্য একই। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য কিরূপে মানব তাঁহারই প্রতিনিধি হিসাবে জগতের বুকে তাঁহারই মাহাত্ম্য প্রচার করিবে।[৯৭]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চাকরি জীবনের সিংহভাগই শিক্ষা বিভাগে অতিবাহিত হয়েছে। প্রথম জীবনে শিক্ষকতা এবং পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে তিনি সরাসরি জড়িত ছিলেন। এর ফলে তিনি অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন এবং এর যাবতীয় সমস্যা দূরীকরণে সচেষ্ট হন। শিক্ষা, শিক্ষকতা ও শিক্ষা সংস্কার সম্পর্কিত তাঁর উল্লেখযোগ্য দু'টি গ্রন্থ হল *টিচার্স ম্যানুয়েল* ও *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*। *টিচার্স ম্যানুয়েল* গ্রন্থে শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাঙ্গনে পঠিত বিভিন্ন পঠন-পাঠনের রীতিনীতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান* গ্রন্থটিতে মুসলমানদের শিক্ষার প্রকৃত অবস্থা, তাদের শিক্ষা বিস্তারের সমস্যাসমূহ এবং শিক্ষার উন্নতির স্বপক্ষে বহুমুখী বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে। 'টিচার্স ম্যানুয়েল' গ্রন্থটিতে তিনি শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একজন শিক্ষকের বিভিন্নমুখী দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে যেমন আলোকপাত করেছেন তেমনি শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কেও বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।[৯৮] ভাষা বাহুল্য সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার যুক্তি ও পরামর্শ অত্যন্ত বাস্তবমুখী ও সময়োপযোগী চিন্তার পরিচয় বহন করে। একই সঙ্গে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা ও আস্থার কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে তিনি এ সম্পর্কে বিস্তারিত

---

৯৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী*, মুখবন্ধের শেষাংশ দ্রষ্টব্য।

৯৮. শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'মনুষ্যত্ব লাভ শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক এই ত্রিবিধ বৃত্তির সম্যক অনুশীলন আবশ্যক। শরীর মন ও আত্মা প্রত্যেকেরই পুষ্টি সাধন হইলে শিক্ষা প্রকৃত শিক্ষাপদবাচ্য হয়। উদ্ভিজ্জ বীজ যেমন বায়ু, জল ও সূর্য্যাতপ সাহায্যে ফলবান বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, শিশুও সেইরূপ শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা বলে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করে।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *টিচার্স ম্যানুয়েল*, কলকাতা : ম্যাকমিলান কোম্পানী, ১৯১৫, পৃ. ৯।

আলোচনা করেছেন।[৯৯]

'হেজাজ ভ্রমণ' খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উল্লেখযোগ্য একটি ভ্রমণ কাহিনী, হজ্জ পালনের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা এবং দীর্ঘ বিপদসংকুল সফর কাহিনী অবলম্বনে এ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। একজন হজ্জযাত্রীর আবশ্যকীয় বিষয়াদি ছাড়াও গ্রন্থটিতে প্রাধান্য পেয়েছে মক্কা ও মদীনার সামাজিক বিন্যাস ও রাজনৈতিক ইতিহাস।[১০০] এতে মক্কা-মদীনার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের কথাও আলোচিত হয়েছে। হেজাজ ভ্রমণের দৈনিক ঘটনাবলীর একটি বিবরণী তিনি গ্রন্থটির শেষাংশে লিপিবদ্ধ করেছেন। আপাতঃদৃষ্টিতে এটি একটি হজ্জের দিনপঞ্জী মনে হতে পারে, কিন্তু গ্রন্থটিতে মক্কা-মদীনার সমাজ জীবনের সার্বিক দিক সন্নিবেশিত হওয়ায় এর গুণগত মান বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই 'হেজাজ ভ্রমণ' গ্রন্থটিকে গতানুগতিক ভ্রমণকাহিনী না বলে একটি ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে শিক্ষা সম্প্রসারণ

১. স্রষ্টা ও সৃষ্টির মহব্বতকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে।

২. মেম্বরগণ পরস্পর পরস্পরকে জান ও দেলের সহিত সাহায্য করিবে।

৩. বিপন্নকে সাহায্য করা, প্রতিবেশীর খবর লওয়া, মাতাপিতা ও গুরুজনের সেবা করা, প্রধান কর্তব্য মনে করিবে।

৪. সর্ব্বদা সত্য বলিবে।

৫. মৃত ব্যক্তির অন্তিম কার্য্যে সাহায্য করিবে।

৬. দুর্ব্বল বা স্ত্রীলোক বা এতীমের উপর কেহ জুলুম না করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি

---

৯৯. সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'ভাষা বাহুল্য মোছলমান ছাত্রের পক্ষে একটি জটিল সমস্যা এবং ইহার সম্যক সমাধানও প্রায় অসম্ভব। (ধর্ম গ্রন্থ) কোরআনের ভাষা, মোছলমানের ইতিহাস এবং হাদীস তাফছিরাদির ভাষা, সরকারী রাজভাষা এবং স্বীয় মাতৃভাষা মোছলমান ছাত্রকে ইহার সবগুলি শিক্ষা করিতে হয়। ধর্ম গ্রন্থের ভাষা এবং মাতৃভাষা শিক্ষা করা অপরিহার্য্য। আবার ইংরেজী প্রায় পৃথিবীর সাধারণ ভাষা হইয়া পড়িয়াছে; বিশেষতঃ সামাজিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কারণে ইংরেজী শিক্ষা না করিলে চলে না। সুতরাং জাতীয় ইতিহাস ইত্যাদি বহুল পরিমাণে মাতৃভাষায় লিখিত ও প্রচারিত হইলে মোছলমান ছাত্রের গুরুভারের কিঞ্চিত লাঘব হইবে। বাঙ্গালার মোছলমানের মাতৃভাষা ভারতের অন্যান্য মোছলমানের মাতৃভাষা হইতে স্বতন্ত্র বিধায় তাহাদের পক্ষে এই ভাষা সমস্যা আর জটিলতর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পারস্য ভাষা উঠাইয়া দিলে এবং ক্রমে ক্রমে উর্দূর পরিবর্তে বাঙ্গালা প্রচলন হইলে ভাষা সমস্যা কিছু সরল হইয়া আসিবে।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০।

১০০. প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা ভাবনা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩।

রাখিবে।

৭. দুস্থ, পীড়িত ও নিপীড়িতকে সাহায্য করিবে।

৮. দুরূদ ও মিলাদ শরীফে যোগদান করিবে।

৯. মেহমান ও মোছাফেরদিগের তত্ত্বাবধান করিবে।

১০. প্রত্যেক সজীব বস্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

১১. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

১২. অভিমান সর্ব্বদা পরিহার করিবে।

১৩. ঈর্ষা, দ্বেষ, কুচিন্তা, কুবাক্য, উপহাস ও কছম হইতে সতত বিরত থাকিবে।

১৪. নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিবে।

১৫. অতিভোজন, অতি পান, অতি নিদ্রা ও অতি বাক্যব্যয় হইতে সাবধানে থাকিবে।

১৬. লোকের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, উহাতে জাতি বিচার করিবে না।

১৭. ছবর এখ্‌তেয়ার করিবে, রেজা ও তছলীম নীতি অনুসরণ করিবে, শোকর-গোজার থাকিবে।

১৮. অপরকে কথা ও কার্য্যে সন্তুষ্ট করিবে।

১৯. মঙ্গল ও অমঙ্গলকে সমচক্ষে দেখিবে।

২০. শরীর ও মনকে সর্ব্বদা পাক রাখিবে।

২১. প্রতিদিন তেলাওয়াত করিবে ও যথা সময়ে নামাজ আদায় করিবে।

২২. দরুদ শরীফ আবৃত্তিকে প্রধান দৈনন্দিন ব্রত করিবে।

২৩. স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ করিবে ও মাহবুবের প্রতি গাঢ় ভক্তি পোষণ করিবে।

২৪. গ্রাম্য বিবাদ বা দলাদলির মধ্যে যোগদান করিবে না।

২৫. কাহারও হকুক নষ্ট করিবে না।

২৬. কথা ও কার্য্যের দ্বারা কাহারও অন্তঃকরণে ব্যথা দিবে না।

২৭. কখনো শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করিবে না।

২৮. কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইবে না।

২৯. আমানতকে খেয়ানত করিবে না।

৩০. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না।

৩১. বৃথা তর্ক করিবে না, কাহাকেও নিন্দা বা ঘৃণা করিবে না, পীড়ন বা অযথা তোষামোদ করিবে না।

৩২. কাহারও অপরাধের প্রতিশোধ লইবার চিন্তা পোষণ করিবে না।

৩৩. কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না।

৩৪. কোন ধর্মকে অশ্রদ্ধা করিবে না।

৩৫. কারো ছিদ্রান্বেষণ করিবে না।

৩৬. অহঙ্কার করিবে না।

৩৭. লোকের বাহবা লইবার উদ্দেশ্যে, কিংবা নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না।

৩৮. পার্থিব সুখ-সম্ভোগের জন্য আখেরাতকে নষ্ট করিবে না।[১০১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন বিগত কয়েক যুগ ধরে মুসলিম শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এ সকল কার্যক্রম জনমনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে। এমনকি বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং সম্মানসূচক কয়েকটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভেও সক্ষম হয়েছে। মিশনের শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমগুলো এরূপ :

> অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, কারিগরী শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ তৈরী, গণশিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ, গ্রন্থ উন্নয়ন ও বণ্টন, বস্তি এলাকায় শিক্ষা সম্প্রসারণ, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে– আহ্ছানউল্লা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, আহ্ছানউল্লা ইনস্টিটিউট অফ ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি, আহ্ছানিয়া মিশন বুক ডিস্ট্রিবিউশন হাউস ইত্যাদি।[১০২]

'আহ্ছানিয়া মিশন' খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার বিশ্বাস, আদর্শ ও অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ। মানব সেবা ও শিক্ষা বিস্তারই ছিল মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার তিরোধান হলেও তাঁর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আহ্ছানিয়া মিশন আজও নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ

জনশিক্ষা বিভাগের সহকারী পরিচালক হিসেবে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উপর মুসলিম শিক্ষা বিস্তার ও উন্নয়নের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তিনি পরম আন্তরিকতা ও সাহসিকতার সাথে এ মহান দায়িত্ব পালন করে বাংলার মুসলিম সমাজে শিক্ষার আলো বিস্তারে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন

---

১০১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ভক্তের পত্র*, ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ৫ম সং, ১৯৮৪, পত্র নং ২০৮, পৃ. ৩৪৪।

১০২. Gholam Moyenuddin, *Khan Bahadur Ahsanullah (R) A Small Introduction, Ibid.*

করেছেন। সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী পরিষদসমূহে মুসলমানদের আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব না থাকায় তাদের স্বার্থ নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, পোস্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের শিক্ষক সংখ্যা ছিল ১৫৮ জন। এদের মধ্যে মাত্র ১২ জন ছিলেন মুসলমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট মুসলিম কর্মচারীরর সংখ্যা ছিল ১৮ জন। পক্ষান্তরে হিন্দুদের সংখ্যা ছিল ৫৪৭ জন। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি মাসে হিন্দুরা সর্বসাকুল্যে বেতন পেত ১,১৬, ৫৯৬ টাকা আর মুসলমানরা বেতন বাবদ পেতেন মাত্র ৩৫২৫ টাকা।[১০৩] এ সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। হিন্দুদের একচেটিয়া প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হত। এর ফলে সে সময় মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সিলেবাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল। কোন কোন বিষয় দুরূহ, হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীনির্ভর, ইসলামী ভাবধারাবিরোধী বলে অভিযোগ করা হয়। এমনকি ইন্টারমিডিয়েট ক্লাসের দর্শন ও ইতিহাসের পাঠ্যসূচীতে নির্দেশিত গ্রন্থে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃতরূপে উত্থাপন করা হয়েছে বলে দাবী করা হয়। বিংশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী মহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বৈষম্যমূলক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে *মাসিক মোহাম্মদী* পত্রিকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। এতে বুদ্ধিজীবীবৃন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিবিধি, সংস্থাপন ও সিলেবাসের তীব্র সমালোচনা করেন।[১০৪]

'স্যার আজিজুল হক'[১০৫] ভর্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের ইংরেজী না শেখাকে অন্যতম অন্তরায়

---

১০৩. মোহাম্মদ আবুল খয়ের, প্রবন্ধ : জবন বর্জিত বিদ্যাপীঠ, *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯৪৩, পৃ. ১১৯-১২০। The majority our Muslim witness do not hasitate to this lach of Muslim representation in the University (and the Muslim community its fair share in the appointment of University examiners... some of the leading Muslim leaders contended that the jurisdiction of the Calcutta University should be curtailed. Note- Calcutta University commission, Vol-1, Part-1, Chapter-7, P. 175-176.

১০৪. মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়– 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য হতে মুসলমানকে এবং মুসলমানের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অস্পৃশ্যরূপে বর্জন করে রাখা হয়েছে।... মুসলমান যুবক যা পাঠ করে মুসলমান হিসেবে একটু আনন্দ, গৌরব বা জ্ঞান লাভ করতে পারে, স্কুল ও কলেজ স্তরের কোন পাঠ্যপুস্তকে তার সামান্য একটু আভাস-ইঙ্গিতও খুঁজে পাওয়া যায় না।' দ্রঃ *মাসিক মোহাম্মদী*, ১৯৪৩, সম্পাদকীয় দ্রষ্টব্য।

১০৫. মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম লীগের নীতিতে বিশ্বাসী বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তানায়ক ও মুসলিম শিক্ষার প্রবক্তা স্যার মুহাম্মদ আজিজুল হক ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলার শান্তি পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্রাবস্থায় (১৯১২-১৯১৪) মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রকাশ

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে ভর্তির সুযোগ পাওয়া গেলেও পছন্দের বিষয় নিয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়া যেত না। তাই অনেক মুসলিম ছাত্রকে বাধ্য হয়ে পালি, সংস্কৃত পড়তে হত। সিলেবাসের সমালোচনা করে তিনি বলেন :

> পাঠ্যপুস্তকসমূহ প্রায়ই সংস্কৃতি উদ্ধৃতিযুক্ত হিন্দু পুরাণ কাহিনীতে এবং কিংবদন্তীতে পরিপূর্ণ। এমন কয়েকটি ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, মুসলমান ছাত্ররা সকল বিষয়ে কৃতিত্বপূর্ণ নম্বর পেয়েছে, অথচ তাদের দুর্ভাগ্য কেবল মাতৃভাষার পরীক্ষাতেই তারা অকৃতকার্য হয়েছে।[১০৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলিম শিক্ষার এ সকল সমস্যা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত ও সজাগ ছিলেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। কাজেই খুঁটিনাটি বিষয়ও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। বাঙালী মুসলিম জাতির সৌভাগ্য যে, তিনি ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে মুসলিম শিক্ষা বিষয়ক সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। একই সময়ে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি কলা অনুষদের ফেলোও নিযুক্ত হয়েছিলেন। ফলে তিনি বাঙালী মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্তরায়সমূহ দূরীকরণের সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যান। তিনি এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন।[১০৭] তিনি ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সিলেবাস সমস্যার সমাধানকল্পে বলেন :

> মুসলমানদের জন্য বর্তমানে এরূপ বিদ্যালয়ের প্রয়োজন যেখানে শিক্ষা লাভ করে ছাত্রগণ ইসলামের আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও বর্তমান জাগতিক সভ্যতার সমকক্ষতা অর্জন করতে সমর্থ হবে।[১০৮]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান* গ্রন্থে মুসলিম উচ্চশিক্ষার অন্তরায়

করেন। যা সরকারী ও বেসরকারী মহলে সমাদৃত হয়। তাঁর রচিত প্রবন্ধ 'History and problems of Moslem Education in Bengal' ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে সরকারী উদ্যোগে গ্রন্থাকারে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরও নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে এ মহান জ্ঞানতাপস ইন্তিকাল করেন। দ্র. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪; Shahanara Alam (ed), *Azizul Haque : Life- Sketch and selected Writings 1892-1947*, Dacca : Shahanara Alam, 1984, P. 2-17.

১০৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

১০৭. এ প্রসঙ্গে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনা ভার Syndicate-এর হস্তে ন্যস্ত। তাই এই পদের গুরুত্ব অত্যধিক। এই কার্য্যকরী সভায় তৎকালে দুইটি Party বর্তমান ছিল। একদল গভর্ণমেন্টের স্বপক্ষে অপর দল বিপক্ষে। যাহা হউক এইখানকার সভ্য নির্বাচিত হইয়া বহু হিতকর কার্য্য সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১০৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৪।

হিসেবে যে সব মত প্রকাশ করেছেন, তিনি একই গ্রন্থে সে সব অন্তরায়সমূহ দূর করার জন্য বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিষদে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নিয়োগ, হোস্টেল সুবিধা বাড়ানো এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের সুপারিশ করেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

> শিক্ষার আদর্শ নির্ম্মাণকার্য্যে সিনেট-সিন্ডিকেট, সেকেন্ডারী বোর্ড, নিয়োগ সমিতি, নির্ব্বাচন সমিতি ইত্যাদির প্রভাব অতি প্রবল। এ সকল সমিতিতে মোছলমান না থাকায় মোছলেমের শিক্ষার যথেষ্ট অনিষ্ট সাধিত হইতেছে। এরূপ সতর্কতার সহিত ব্যবস্থা করিতে হইবে যেন সকল সম্প্রদায়েরই স্বার্থ অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমিতিতে যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি স্থান পাইতে পারে তজ্জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম প্রণয়ন করিতে হইবে।[১০৯]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলমানদের শিক্ষা গ্রহণের উৎসাহ প্রদানকল্পে শিক্ষা বিভাগে অধিকতর মুসলিম শিক্ষক ও পরিদর্শক নিয়োগের পরামর্শ দেন। তৎকালে শিক্ষা বিভাগের চাকরিতে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নগন্য। তাই তিনি মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও লোকাল বোর্ডের শিক্ষা সম্পর্কীয় সভায় যথেষ্ট পরিমাণে মুসলিম প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক বলে মনে করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নিরলস প্রচেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক মুসলিম সদস্য নিযুক্ত হয়, পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা নির্ধারিত হয়, স্কুল-কলেজ ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত হয়, সকল শ্রেণীর পরীক্ষকদিগের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বর্ধিত করা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা গৃহীত হয়।[১১০] এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে তৎকালীন সময়ে মুসলমানদের জন্য শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় এবং মুসলিম সমাজে শিক্ষা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়।

মক্তবের স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বীয় সমাজে সময়োপযোগী জাগতিক ও ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন :

---

১০৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪।

১১০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৯৬-৯৭; প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : শিক্ষা সংস্কার ও সাহিত্য, *কারমাইকেল* খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *কলেজ জার্নাল*, পৃ. ৩৪; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২; গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১-২৩।

> জীবন সংগ্রামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য এদেরকে পৃথিবীর অপর সকলের সমকক্ষ করতেই হবে। জনসাধারণের অজ্ঞতার অন্ধকার বিদূরিত করতে হলে সম্যকরূপে শিক্ষা বিস্তার প্রয়োজন। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যুগের জটিলতার মধ্যে জীবন সংগ্রামে মোটামুটিভাবে সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর নয়।[১১১]

তৎকালীন গভর্নমেন্ট মুসলিম শিক্ষার ভার খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উপর ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব, মাদরাসা ও মুসলিম হাইস্কুল তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সুযোগে তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মুসলমান লেখকগণের লিখিত পুস্তক ব্যবহারের রীতি প্রবর্তন করেন।[১১২] এ বিষয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের আপত্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে অনুমোদন লাভ করতে সক্ষম হন। ফলে মুসলমান লেখকগণ পাঠ্য পুস্তক লেখার সুযোগ পান এবং মুসলমান পুস্তক প্রকাশকগণের অবস্থার উন্নতি হয়। তৎকালীন মখদুমী লাইব্রেরী, প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ইসলামিয়া লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠা ও টিকে থাকার পেছনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান অনস্বীকার্য।[১১৩]

শিক্ষার্জনের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে মক্তব। এখান থেকেই কোমলমতি মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের জ্ঞানের ভিত্তি রচনা করে। মক্তবের মাধ্যমেই তারা পবিত্র কুর'আনুল কারীম, আরবী বর্ণপরিচয় ও দোয়া-কালেমা শিক্ষা লাভ করে। প্রতিটি মুসলমানদের জন্য যা শিক্ষা করা একান্ত জরুরী।

---

১১১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-৬।

১১২. মোহাম্মদ আবুল হোসেন, *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬২; এ. এফ. এম এনামুল হক, *হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর জীবন ও কর্ম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন– 'আমি সুযোগ বুঝিয়া স্বতন্ত্র মক্তব-পাঠ্য নির্বাচন করিলাম ও মোছলেম ছাত্রদিগের শিক্ষার জন্য একমাত্র মোছলেম লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রবর্তনের নিয়ম প্রবর্তন করিয়া গভর্ণমেন্টের অনুমোদন লইলাম।... মোছলেম লেখকের পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত করা হইল। হিন্দু লেখকগণ ইহাতে আপত্তি করিলেও গভর্ণমেন্ট সে আপত্তি শুনিলেন না। কোমল-মতি মোছলেম ছাত্রদের জন্য মোছলেম ভাবাপন্ন পুস্তকের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিলাম।... মোছলেম শিক্ষার নতুন প্রেরণা আসিল, ধর্ম্মভাবের পুণরুদ্ধার হইল, হিন্দু-মোছলেম শিক্ষার্থী সমসূত্রে অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইল।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

১১৩. He introduced an independent aducational curriculum for the Muktah students and made provisions so that Muslim students could study the Book written my Muslim scholars. This created the opportunity for Muslim Scholars to write Textbooks and also improve the lot of the Muslim Book-publishers. For the founding and survival of institutions like Makhdumi Library, Provincial Library and Islamia Library, he had enormous contributions. Note- Gholam Moyenuddin, *Khan Bahadur Ahsanullah (R) A small Introduction*, Ibid.

তাই তিনি এ শিক্ষা গ্রহণের জন্য মুসলিম সমাজের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান[১১৪] এবং এ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ১৯০৬ ও ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে মফঃস্বলের মক্তবগুলোতে সরকারী অনুদানের ব্যবস্থা করা হয়।[১১৫] ফলে ইসলামী শিক্ষা অর্জনের প্রতি মুসলমান জনগণের আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়ন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে যুগোপযোগী ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য, নবাব আব্দুল লতিফ মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের সুপারিশ করেছিলেন।[১১৬] সে সময় উচ্চ মাদরাসা ও মাধ্যমিক মাদরাসা হতে পাশ করে ছাত্র-ছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারতো না। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ও বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন মুসলমান ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পথে

---

১১৪. তিনি বলেন- '... আরবী বর্ণ পরিচয় এবং কিছু দোয়া কলেমা শিক্ষা করিতে হয়। হিন্দু ছেলেদের এরূপ কিছু শিক্ষা করিতে হয় না। কারণ তাহাদের কোন বিধিবদ্ধ উপাসনার নিয়ম নাই এবং অধিকাংশ লোক ইহার ততটা দরকারও বোধ করে না। পূজা পার্ব্বণ যাহা কিছু হয়, তাহাতে কোন মন্ত্র তন্ত্র আওড়াইতে হইলে, তাহা ব্রাহ্মণদেরই করিতে হয়। অন্যান্য লোকের তাহার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু প্রত্যেক মোছলমানকে নামাজ, রোজা ইত্যাদি বিধিবদ্ধ উপাসনা স্বাধীনভাবে করিতে হয়; উপাসনায় কোরআন ও আরবী দোয়া কলেমা পাঠ করিতে হয়।... সুতরাং মোছলমান মোছলমানরূপে বাঁচিতে ও মরিতে চাহিলে, এসব বিষয় তাহার শিক্ষা করিতে হইবে।' দ্রঃ *মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা*, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃ. ২৫৩।

১১৫. Report of the Committee appointed by the Bengal Government to consider question connected with muhammadan Education, Calcutta, 1915, P. 15. মক্তব শিক্ষা সম্পর্কে এক রিপোর্টে বলা হয়- 'The number of Maktabs or primary Schools for Moslems rosefrom 20,723 in 1927-1928, of these 14,599 were boys and 8,293 were girls. The number of the pupils enrolled in Maktabs increased during the year under review from 6,28,446 to 70,439 of whom 5,07,736 were boys and 1,97,703 were girls. The total district expenditure to the Maktabs rose from Rs, 17,71,586 in 1926-1927 to Rs, 20,77,941 in 1927-1928. Note- Report on the Public instruction of Bengal, 1927-1928, PP. 103-104.

১১৬. তিনি বলেন- 'ইংরেজী ও ফার্সী একত্রে শিক্ষা দেয়া হলে কোনরূপ কুফল ফলার আশংকা নেই। মুসলিম ক্লাসিকের সঙ্গে ইংরেজী শিক্ষা দেয়া হলে ফল বরং বেশী ভাল হবে। আরবী ফার্সীতে বিদ্বান না হলে মুসলমান তাঁর সমাজে স্থান পায় না। অর্থাৎ তাঁকে পণ্ডিত বলে মনে করা হয় না।... সুতরাং ইংরেজী এবং আরবী ফার্সী একই সঙ্গে এবং অনতিবিলম্বে মুসলিমদিগকে শিক্ষা দেয়ার উপায় অবলম্বন করা সরকারের উচিৎ বলে আমি মনে করি।' দ্র. নবাব আবদুল লতিফ খান, *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬।

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল।[১১৭] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উক্ত দু'স্তরের মাদরাসা শিক্ষামান উন্নীত করেন এবং ভর্তির ক্ষেত্রে সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে মাদরাসা শিক্ষিত ছাত্রদের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন :

> হাই মাদ্রাসা ও Intermediat মাদ্রাসা হইতে ছাত্র পাশ করিয়া কলেজে ভর্তি হইতে পারিত না। ক্রমে উক্ত মাদ্রাসাদ্বয়ের Standard যথোচিত উন্নীত করা হইল। বহু প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখে আমরা কৃতকার্য্য হইলাম। তদবধি বহু মাদ্রাসার ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার সুযোগ পাইয়াছে। কেবল আরবী-ফারসী বিষয়ে নহে, ইংরেজী, অঙ্ক ও দর্শন-সকল বিষয়েই হিন্দু ছাত্রদিগের সহিত মাদ্রাসার মোসলেম ছাত্রগণ সমতুল্যভাবে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতেছে।[১১৮]

সরকারী রিপোর্টে দেখা যায়, তাঁর সহকারী পরিচালকের দায়িত্ব পালনকালে শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯২৬-২৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় মোট মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল ১১,৩৯, ৯৪৯ জন। এক বছরের মধ্যে ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে তা বেড়ে ১২,৩৫,৭০৬ জনে উন্নীত হয়। মাদরাসা শিক্ষায়ও সন্তোষজনক অগ্রগতি সাধিত হয়। ১৯২৬-২৭ থেকে ১৯২৭-২৮ খ্রীস্টাব্দে এক বছরে শুধু প্রেসিডেন্সি বিভাগে মাদরাসার ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১,০০০ জন এবং মাদরাসার সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ১২৭টি।[১১৯] তাঁর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এ সকল মাদরাসা শিক্ষা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার একান্ত উদ্যোগে 'New Scheme' মাদরাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।[১২০] সঠিকভাবে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে 'New Scheme' মাদরাসাগুলোর জন্য একটি স্পেশাল বোর্ড গঠিত হয়। তিনি তৎকালীন 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকায় 'Reformed Scheme' –এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত 'New Scheme' মাদরাসাকে সমর্থন করে 'শিক্ষার সমস্যা' নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত প্রতিবেদন পেশ করেন।[১২১]

---

১১৭. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

১১৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-৯৫।

১১৯. *Report of the public Instruction in Bengal*, 1927-1928, PP. 101-102.

১২০. New Scheme মাদরাসার সমর্থনে তিনি বলেন– 'জুনিয়ার এবং সিনিয়ার মাদ্রাসাগুলিকে মধ্য এবং উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সমকক্ষ করিয়া লইবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে; আর বিলম্ব করা উচিত নহে। কিন্তু এই সকল মাদ্রাসাকে এই প্রকারে উন্নীত করিতে হইলে সরকার হইতে প্রভূত পরিমাণে অর্থ-সাহায্য প্রয়োজন। মোছলমানের জনসংখ্যা এবং সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যের জন্য উপযুক্ত অর্থ ব্যয়ে কুণ্ঠিত হওয়া সরকারের পক্ষে অনুচিত।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।

১২১. New Scheme মাদরাসার সমর্থনে পেশকৃত প্রতিবেদনের কিয়দংশ ছিল এরূপ– 'যতদিন না মোছলমানের ধর্ম ও সভ্যতাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্থান দেওয়া হইবে, ততদিন পৃথক থাকা উচিত। যদি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মৌলভী শিক্ষক নিয়োগ

শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনস্বীকার্য। শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা পদ্ধতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষকই হচ্ছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। আদর্শ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রের সুশিক্ষা ত্বরান্বিত হয়। তাঁর কর্মকুশলতার উপরই নির্ভর করে ছাত্রের অবনতি ও উন্নতি। ইসলামী শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে ইসলামী জ্ঞানসম্পন্ন শিক্ষকের কোন বিকল্প নেই, কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সময় উপমহাদেশের সব স্কুল-কলেজে মৌলভীর (ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষক) পদ ছিল না। এর ফলে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলামী শিক্ষা অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। তখন তিনি ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রতিটি স্কুল-কলেজে মৌলভীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের মধ্যকার যে বিশেষ বৈষম্য ছিল সেটাও রহিত করেন।[১২২] এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন :

> ধর্ম্ম শিক্ষার (ইসলামী শিক্ষার) অভাব দুই প্রকারে দূর করা যাইতে পারে-মোছলমানের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্ম শিক্ষা দানের জন্য বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ। সাধারণ শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বহু মোছলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং ইসলাম-সম্মত নীতি এবং ধর্ম শিক্ষার জন্য সেই সকল স্কুল-কলেজে এবং তদসংলগ্ন ছাত্রাবাসে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আরও অধিক সংখ্যক মোছলমান হেডমাষ্টার ও ইন্সপেক্টর নিয়োগ করিতে হইবে। যেন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে উভয়ত্রই ছাত্রগণের সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে তাঁহারা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে পারেন। নিম্নপদে কয়েকজন মোছলমান শিক্ষক নিয়োগ দ্বারা মোছলমান ছাত্র সমাজের উপযুক্ত সংগঠন হইতে পারে না।[১২৩]

ছাত্রের চিন্তাধারার সাথে সম্যকরূপে পরিচিত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। ছাত্র-শিক্ষক ভিন্ন মতাদর্শের হলে শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ

কখনো স্থান দেওয়া হয়, তখন শিক্ষা সমস্যার সমাধান হইবে। তাহা এইরূপে হইতে পারে– ১. ইংরেজীর জোর আর একটু কমাইয়া হাইস্কুলে দীনিয়াত ও আরবী (একটি পত্র সপ্তাহে ৬ ঘন্টা) ৩য় বা ৪র্থ শ্রেণী হইতে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত যোগ করিয়া দিতে হইবে। হিন্দুরা ধর্ম শিক্ষা চাহিলে তাহাদের জন্যও অনুরূপ ব্যবস্থা থাকিবে। অথবা তাহারা সঙ্গিত-শিক্ষা করিতে পারিবে। ২. উর্দূ ও ফারসী উঠাইয়া দিতে হইবে। ৩. ৭ম শ্রেণী হইতে আরবী সাহিত্য দুই পত্র (অতিরিক্ত পত্র সহ ৯ ঘন্টা) করিতে হইবে। ৪. দীনিয়াত এক পত্র (বাংলা ভাষায় ৮ ঘন্টা) করিতে হইবে। ৫. সমস্ত শিক্ষা বাংলায় দিতে হইবে। ৬. বর্তমানে স্কুলে যে পরিমাণ আরবী পড়ান হয়, আপোস হইলে আরবীর Standard আর একটু উচ্চ করিতে হইবে...।' দ্রঃ *মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যা*, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১ খণ্ড, পৃ. ২৫৭।

১২২. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০; প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫।

১২৩. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।

সমস্যা দূরীকরণে তিনি মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Islamic B.A. বা ফাইনাল মাদরাসা পাশ বা Islamic I.A. পাশ মৌলভী শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। মৌলভী শিক্ষক নিয়োগের মানদণ্ড কী হবে সে সম্পর্কেও তিনি সুস্পষ্ট মতামত পেশ করেন।[১২৪] এছাড়াও খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টাতেই বিভিন্ন ট্রেনিং কলেজসমূহে মুসলিম শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

মুসলিম নারী শিক্ষার উন্নয়ন

পৃথিবীর সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। পুরুষের শিক্ষার প্রতি যেমন গুরুত্ব দেয়া উচিত নারী শিক্ষার প্রতিও অদ্রুপ গুরুত্ব দেয়া উচিত। শিক্ষা নারীদের আদর্শ মুসলিম নারী হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একই সাথে গড়ে তোলে একটা স্বাধীন মুসলিম দেশের গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে। এ লক্ষ্যেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার একান্ত বাসনা ছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়া। তাঁর শিক্ষা চিন্তার মূল বৈশিষ্ট্য ছিল পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজে যুগোপযোগী শিক্ষার বিস্তার ঘটিয়ে তাদেরকে জীবন সংগ্রামের জন্য যোগ্য করে গড়ে তোলা। তাই তিনি অবহেলিত মুসলিম নারী সমাজের শিক্ষার উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। 'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য শিক্ষা অর্জন করা ফরয'[১২৫]– মহানবী (স.)-এর এ মহাপবিত্র বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন– 'যিনি 'ইলম জানেন তাঁর কর্তব্য পুরুষ ও স্ত্রী উভয়কে অংশীদার করা। স্ত্রী জাতিকে চির অজ্ঞতা ও তমসাচ্ছন্ন রাখা সমীচীন নয়।'[১২৬] তিনি তাঁর 'মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য' গ্রন্থের মাধ্যমে নারী জাতিকে শিক্ষার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন।[১২৭]

---

১২৪. তাঁর মতে– 'শিক্ষকের বিদ্যাবত্তা যতই গভীর হউক না কেন, ছাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং স্বতন্ত্র আদর্শবাদী হইলে শিক্ষক সহজে তাহার হৃদয়াধিকার করিতে পারেন না। সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা ছাত্রের আনুপাতিক হারে হওয়া আবশ্যক। নীতি শিক্ষা ও ধর্মতত্ত্ব পরস্পর সংলগ্ন... যে শিক্ষা বিশ্বপতির সম্বন্ধে একটা ধারণা মানবের জ্ঞানপটে অঙ্কিত করিতে না পারে, তাহার স্বার্থকতা নাই। যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত গ্রন্থাবলীতে ধর্ম্মোপদেশ ও আত্মোউন্নতির স্থান না থাকে, তবে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না।' দ্রঃ *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৪৩০।

১২৫. শায়খ আলী উদ্দীন আল খতীব আত্ তিবরীজি, *মিশকাতুল মাসাবীহ*, পৃ. ১২৭।

১২৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৭১।

১২৭. তিনি বলেন– 'পর্দ্দার উদ্দেশ্য সতীত্ব সংরক্ষণ। নারীর চরিত্র নির্ভর করে তাহার শিক্ষার উপর, স্বামীর নিয়ন্ত্রণের উপর, পারিপার্শ্বিকতার উপর। সারা দিবা-রাত্র কেবল কারারুদ্ধ থাকিলে তাহার মনোবৃত্তির প্রসার হয় না, বিচার শক্তি কর্মশক্তির উন্মেষ হয় না। আত্মার স্ফুরণ চাই, মহিলা সমাজের সংস্পর্শ চাই, প্রাকৃতিক রহস্যের তফাক্কেল চাই।' দ্রঃ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য*, কলকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, ১৯৪৯, পৃ. ১২৮-১২৯।

মুসলমান ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁদের শিক্ষা ও শিল্পের বিস্তারকল্পে তিনি অনুকূল সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেন। কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত 'মোহ্সেন এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজ' তাঁর প্রশংসনীয় অবদানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এছাড়াও তিনি তাঁর কর্মজীবনে মুসলিম রমণীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[১২৮]

সে সময় কলকাতার সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, বুরাদী মুসলিম গার্লস স্কুল, মোহামেডান অরফানেজ ও মোসলেম এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল গার্লস কলেজে মুসলিম মেয়েরা লেখাপড়া করত।[১২৯] খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উদ্যোগে তৎকালীন মুসলিম নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের 'অমৃত বাজার পত্রিকা' থেকে জানা যায়, প্রতি ৫ জন মুসলিম শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন মুসলিম ছাত্রী ছিল।[১৩০] ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ৪৪,৯০৪ জনে অর্থাৎ শতকরা ৫১.৯% ভাগে।[১৩১] ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলার ১৪টি বালিকা বিদ্যালয় ছাড়াও ২৮০৮টি মক্তবে ৭৩,২৩৬ জন মুসলমান ছাত্রী লেখাপড়া করত। বঙ্গভঙ্গের পরও মুসলমানগণ তাদের শিক্ষার প্রাচীন ধারাটি ধরে রাখতে সক্ষম হন।[১৩২] কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় নারী শিক্ষার প্রতি আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। এ সময় বাংলার হিন্দুদের চেয়ে মুসলমানগণ অগ্রণী ছিল। ১৯১৮-১৯১৯ এবং ১৯১৯-১৯২০ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু-মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা নীচের প্রদত্ত সারণীতে দেখানো হলো :[১৩৩]

সারণী–০৯

বছর	হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা	মুসলমান ছাত্রীর সংখ্যা
১৯১৮-১৯১৯	১,৫১,৯৮০	১,৬১,১৫২
১৯১৯-১৯২০	১,৫২,১৬৪	১,৭৭,৪৫৮

১২৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

১২৯. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, পৃ. ৩৫০।

১৩০. প্রবন্ধ : বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী মুসলিম নারী শিক্ষা : একটি পর্যালোচনা ১৯০৫-১৯১৯, *ইসলামী গবেষণা পত্রিকা*, পৃ. ৪১।

১৩১. মাসুদ মজুমদার, *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪।

১৩২. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৫।

১৩৩. মোঃ আমিরুল ইসলাম, *যশোর জেলার শিক্ষার প্রকৃতি ও বিকাশ : একটি সমীক্ষা ১৯৮৬-১৯৪৭*, অপ্রকাশিত এম.ফিল গবেষণা অভিসন্দর্ভ, কুষ্টিয়া : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৭, পৃ. ৮৪।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় বৈদেশিক শিক্ষার জন্য মুসলিম শিক্ষার্থীকে সরকারী সাহায্য প্রদানের নিয়ম নির্ধারিত হয়। এর সুফল মুসলিম নারীদের ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। বেগম ফজিলাতুন্নেছাকে সরকারী বৃত্তি দিয়ে বিদেশে পড়তে পাঠানোর ব্যাপারে তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।[১৩৪] বস্তুতঃ তিনি তৎকালীন উপমহাদেশের মুসলমানদের অগ্রগতির রুদ্ধদার খুলে দিয়েছিলেন এবং মুসলিম নারী সমাজ শিক্ষা ও উন্নতির পথ খুঁজে পেয়েছিল।

মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি নির্ধারণ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষা বিভাগের উচ্চপদে কর্মরত থাকায় মুসলমানদের শিক্ষা সমস্যার নানা দিক খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পান। এ সকল সমস্যার সমাধানকল্পেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। সে সময় মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের প্রধান অন্তরায় ছিল দারিদ্রতা। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার রচনার মধ্যেও এ সমস্যাগুলোর কথা সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন :

> দারিদ্র মোছলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারে প্রধানতম অন্তরায়। তবে নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে কিয়ৎ পরিমাণে এই বিপত্তির নিরসন হইতে পারে : অধিক পরিমাণে সরকারী সাহায্য (Grant in aid) প্রদান; মোছলমান ছাত্রের জন্য অধিক সংখ্যক বৃত্তি (Free studentship) সংরক্ষণ; মোছলমানের জন্য নির্দিষ্ট বিশেষ বিদ্যালয়গুলিতে স্বল্পহারে বেতন গ্রহণ ইত্যাদি। এই প্রকারে অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইলে দরিদ্র যুবকদের মধ্যে যাহারা মেধাবী তাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত লাভ করিতে সমর্থ হইবে।[১৩৫]

তাই তিনি এ অন্তরায় দূরীকরণে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। এমনকি সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ে বৃত্তি বণ্টনের পূর্বে তাঁর মতামত চাওয়া হত। পরবর্তীতে ক্রমান্বয়ে এ বৃত্তির পরিমাণ বর্ধিত করা হয়।[১৩৬] তিনি দরিদ্র ও কৃষিজীবী মুসলমানদের আর্থিক

---

১৩৪. এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন– 'আমি ডিরেক্টর অফিসে থাকিতে প্রস্তাব হইয়াছিল একটি উপযুক্ত মোছলেম মহিলাকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে ট্রেনিং এর জন্য পাঠাইতে এবং ট্রেনিং অন্তে ইন্সপেক্টর বা তত্তুল্য কোন পদে নিয়োগ করিতে। ভবিষ্যৎ মোছলেম মহিলাদিগের উচ্চ শিক্ষার উন্নতি কল্পে এই প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্য যে, বিলাতে পাঠাইবার সময় আমি আমার ভবিষ্যৎ পুত্রবধুকে সাহায্য করিবার অবসর পাইয়াছিলাম, তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে, তিনি অবশেষে আমারই পুত্রবধু হইবেন, ঐ সময়ে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন জলপাইগুড়ির নওয়াব মুশাররফ হোসেন।' দ্র. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, পৃ. ৯৯।

১৩৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬।

১৩৬. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*, পৃ. ১৭২-১৭৪; খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮; প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জীবন ও কৃতি, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, পৃ. ২১৬-২১৭।

দূরাবস্থার কথা তুলে ধরে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার সরকারকেই গ্রহণ করার আবেদন জানান।[১৩৭] এর ফলে স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হয় এবং গরীব ও মেধাবী ছাত্রকে বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। এ ছাড়াও তিনি বৈদেশিক উচ্চশিক্ষার জন্য মুসলমানদের সরকারী বৃত্তি প্রাপ্তির পথ সুগম করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চাকরিকালীন স্থানে স্থানে 'মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্স'-এর অধিবেশন হত এবং তাঁদের সুপারিশ অনুসারে গভর্নমেন্ট মুসলিম শিক্ষার সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। তদনুসারে তিনি মফঃস্বলের স্কুল-কলেজ ও মাদরাসা পরিদর্শনের অনুমতি পান এবং মুসলিম শিক্ষার যে সব অভাব-অভিযোগ প্রত্যক্ষ করেন, তা দূরীকরণের জন্য তিনি সুব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এভাবে তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় ভারতীয় উপমহাদেশে শিক্ষা দ্রুতগতি লাভ করে।

টেক্সট বুক কমিটিতে মুসলিম সদস্যের অন্তর্ভুক্তি

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমসাময়িককালে ইসলামী ভাবধারায় রচিত কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। কারণ গ্রন্থ প্রণয়ন কমিটিতে মুসলিম সদস্য ছিল নিতান্তই নগণ্য। ভিন্নধর্মী সদস্যদের সংখ্যাধিক্যের কারণে পাঠ্যপুস্তকে ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের প্রভাব বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হত। এর ফলে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হত। সে সময় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় 'টেক্সট বুক কমিটি'তে মুসলিম সদস্য নিযুক্ত হয়। ফলে মুসলিম পাঠ্যপুস্তকসমূহে ইসলামী শব্দের প্রয়োগ হতে থাকে।[১৩৮] এটাকে তাঁর শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

উক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে মুসলমান লেখকদের পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। পূর্বে যে সকল লেখক ও পুস্তক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হত, সরকারী ব্যবস্থায় তখন তা সমাদৃত হতে

---

১৩৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভাষায়– 'অধিকাংশ মুসলমানই যে কৃষিজীবী এবং গ্রামে বাস করিয়া থাকে সে সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ নাই। অপিচ ইহাও সত্য যে স্ব স্ব সন্তানগণকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়া আপনাদিগের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের স্পৃহা মোছলমান কৃষকদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু সর্বজন বিদিত দারিদ্রবশতঃ তাহাদের সন্তানগণ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না, ফলে উচ্চতর শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার পূর্বেই মোছলমান ছাত্রের সংখ্যা শোচনীয়রূপে হ্রাস প্রাপ্ত হইতে থাকে।... সর্বসাধারণের জন্য মোটামুটি প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় গভর্ণমেন্টের সর্ব প্রথম কর্ত্তব্য। ভারত সরকার এবং বঙ্গীয় সরকার সমবেত ভাবে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সম্মত হইলে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।' দ্র. খানবাহাদুর আহছানউল্লা, *শিক্ষা ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২-৩৩।

১৩৮. গোলাম মঈনউদ্দিন, *মহৎ জীবন*, পৃ. ১৭-১৯; প্রবন্ধ : সাধক শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬; গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১।

থাকে। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলমান পুস্তক প্রকাশক ও লেখকদের অবস্থা আশাতীত উন্নতি সাধিত হয়। তারা আর্থিকভাবেও স্বচ্ছলতা লাভ করেন। তাছাড়া এর মাধ্যমে মুসলিম সাহিত্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং মুসলিম সাহিত্যিকগণ নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করেন।

তখন উর্দুকে Classical Language হিসেবে গণ্য করা হত না। ফলে পশ্চিম বঙ্গে উর্দুভাষী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাক্ষেত্রে নানারকম সমস্যায় পড়ত। কারণ সংস্কৃত ভাষায় তাদের পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না। পরবর্তীতে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় উর্দু সংস্কৃতের স্থান দখল করে। হাইস্কুলে আরবী অধিকতরভাবে Classical Language রূপে গৃহীত হয়।[১৩৯] যা মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থার আরও এক ধাপ উন্নতিতে সহায়তা করে।

শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অন্যান্য অবদান

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পিছিয়ে পড়া মুসলিম জাতিকে যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কৃষি ও কারিগরী শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদেরকে কৃষি বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করার জন্যও তিনি সুপারিশ করেছিলেন। বাংলার মুসলমানদের সিংহভাগ কৃষিজীবী। সুতরাং কৃষি বিষয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টিকে তিনি অগ্রাধিকার প্রদান করেছিলেন।[১৪০]

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অবিভক্ত বাংলার গভর্নর মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে বাংলার সরকারের নিকট একটি পত্র প্রেরণ করে। এ পত্রে বাংলার মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা এতোটাই পরিষ্কাররূপে বিবৃত হয় যে, পত্রটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলীল হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে।[১৪১] ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ৩০ জুন ২৪৭৪ সংখ্যক রেজুলেশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতিকল্পে

---

১৩৯. Urdu During those days was not considered among the 'Classical Languages'. This created Problems for the Urdu speaking students in west Bengal. It was through his initiative that Urdu occupied the Place of sanskrit. He also Played a Pioneering role in consolidating the status of Arabic as the 'Second Language' in the high schools. Gholam Moyenuddin, *Khan Bahadur Ahsanullah (R) A Small Introduction, Ibid.*

১৪০. তিনি বলেন– 'আমাদের দেশ মূলত কৃষিনির্ভর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে থাকবে একখন্ড জমি এবং কৃষি বিষয়ে বাস্তব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। বালকেরা অবশ্যই জানবে কিভাবে জমির উর্বরতা বাড়াতে হয় এবং কিভাবে করতে হয় উচ্চ শ্রেণীর সারের বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিতে চাষাবাদ ও সেচ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের প্রতিটি জমি চাষাবাদের আওতায় আনতে হবে।' দ্রঃ প্রবন্ধ : হজরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) এর শিক্ষা ভাবনা, *আল-আহ্ছান,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

১৪১. সম্পূর্ণ পত্রটি ছিল এরকম–

'৫৮৫-৫৯৫ ডি সংখ্যক পত্রের নকল, সিমলা, ৩রা এপ্রিল, ১৯১৩'

তিনটি বিশেষ ধারার[১৪২] স্বপক্ষে সুপারিশ পেশ করার জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সভাপতি ছিলেন প্রাদেশিক জনশিক্ষা পরিষদের ডিরেক্টর 'মিঃ হর্নেল' এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এ কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন।[১৪৩] উক্ত কমিটির সুপারিশ মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে একটি সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়। বস্তুতঃ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ফলে মুসলিম শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে।[১৪৪] ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার জেলাভিত্তিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এখানে সারণীতে প্রদর্শন করা হল :[১৪৫]

প্রেরক, অনারেবল মিঃ এইচ, শাপ, সি.ই.ই. ভারত সরকারের জয়েন্ট সেক্রেটারী, শিক্ষা বিভাগ।

প্রাপক, বাংলা সরকারের সেক্রেটারী, সাধারণ (শিক্ষা) বিভাগ সমীপে,

কর্তৃপক্ষ কর্তক আদিষ্ট হয়ে আপনাকে মুসলিম শিক্ষা বিষয়ে এ পত্র লিখছি, ভারত সরকারের ১৯১৩ খ্রী. ২১ ফেব্রুয়ারী তারিখের ৩০১ সি.ডি সংখ্য রেজুলেশনের ৫৭ সংখ্যক অনুচ্ছেদে পরিদৃষ্ট হয় যে, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে বিদ্যালয় সমূহে মুসলমানদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সম্প্রদায় তাদের অংশ বুঝে নিয়েছে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা এখনো মোট জনসংখ্যার আনুপাতিক অংশের অনেক কম। এ অনগ্রসর জনসংখ্যার শিক্ষার জন্য ভারত সরকার সর্ব প্রকার ন্যায়-সঙ্গত সুযোগ প্রদান করতে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং উক্ত শিক্ষার ব্যাপারে যে প্রকার তদন্ত ও বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ হিতকর হবে বলে সরকার বিবেচনা করেন, এ পত্র মারফত তার পথ নির্দেশ করা হচ্ছে।' দ্র. মোহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৫।

১৪২. ধারাগুলো হল– ১. মুসলিম শিক্ষা সম্পর্কে ভারত সরকারের কতিপয় সুপারিশ, ২. ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের প্রস্তাবাবলী, ৩. মুসলিম শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য জনশিক্ষা পরিষদের ডিরেক্টর অপর যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। দ্র. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৪৩. এ কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হলেন– ১. ঢাকার অনারেবল নবাব স্যার খাজা সলিমুল্লাহ্ বাহাদুর জি.সি.আই.ই.কে.সি.এস.ই, ২. অনারেবল মিঃ এ.কে. গজনবী, ৩. অনারেবল মিঃ এ.কে. ফজলুল হক, ৪. অনারেবল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ৫. অনারেবল মৌলভী মাজহারুল আনোয়ার চৌধুরী, ৬. নবাব এ.এফ.এম. আব্দুর রহমান, ৭. শামছুল 'ওলামা মৌলভী আবু নসর মোহাম্মদ ওয়াহিদ, ৮. খানবাহাদুর দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাব্বী, ৯. খানবাহাদুর মির্জা সুজাত আলী বেগ, ১০. খানবাহাদুর মৌলভী মোহাম্মদ ইব্রাহীম, ১১. খানবাহাদুর মৌলভী আমিনুল ইসলাম, ১২. জে.আর. জাহিদ সোহ্রাওয়ার্দী, ১৩. এ. এইচ. হারলে এস্কোয়ার, ১৪. মৌলভী ওয়াহেদ হোসেন, ১৫. মৌলভী মুহাম্মদ মুসা, ১৬. জনশিক্ষা পরিষদের মুসলিম শিক্ষার সহকারী ডিরেক্টর জে. এ. টেলার এস্কোয়ার (সম্পাদক)। দ্র. Mohammad Mohar Ali, *History and Problems of Muslims Education in Bengal*, Ibid, PP. 47-48.

১৪৪. Report on the Committee appointed by the Bengal Government to consider question connected with Muhammadan Education, Calcutta, 1915, P. 15.

১৪৫. গৌতম চট্টোপাধ্যায় সমআদিত, *ইতিহাস অনুসন্ধান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৯-৩৫০।

সারণী–১০

ক্রমিক নং	জেলার নাম	বিদ্যালয়ের সংখ্যা
১	কলিকাতা	৪৭
২	নদীয়া	৫৩
৩	খুলনা	১০৫
৪	হাওড়া	২২
৫	চব্বিশ পরগণা	২৩
৬	যশোহর	৬৭
৭	বাঁকুড়া	–
৮	বর্ধমান	১৪
৯	বীরভূম	৪২
১০	হুগলী	২২
১১	ঢাকা	৩১২
১২	ময়মনসিংহ	৪০০
১৩	ফরিদপুর	১৯৪
১৪	বাখরগঞ্জ	৩২২
১৫	রাজশাহী	১১২
১৬	দিনাজপুর	৫১
১৭	রংপুর	১০৮
১৮	পাবনা	৮৩
১৯	বগুড়া	২৮০
২০	দার্জিলিং	১
২১	জলপাইগুড়ি	১৪
২২	মালদা	৪২
২৩	ত্রিপুরা	২৮৫
২৪	নোয়াখালী	১৮৬
২৫	চট্টগ্রাম	১৬৮

এক নজরে খানবাহাদুরের শিক্ষা সংস্কারসমূহ

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার হাতেই স্থাপিত হয়েছিল আমাদের শিক্ষার ভিত্তি। যার উপর আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ইমারত নির্মিত হয়েছে। এ সময় মোট ২৮ দফা সংস্কার সাধিত হয়। একনজরে তাঁর শিক্ষা সংস্কারসমূহ এখানে উপস্থাপিত হল :

১. তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেকেরই ধারণা ছিল সাম্প্রদায়িকতা বিদ্যমান থাকায় হিন্দু ও মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব হয়। ফলে যে কোন পরীক্ষায় মুসলিম ছাত্ররা উচ্চস্থান অধিকার করতে পারে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম পরীক্ষার্থীদের অনেকে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করত। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্ররা সহজে প্রথম বিভাগেও স্থান পেত না। এর পশ্চাতে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁর সংগৃহীত তথ্যে প্রতীয়মান হয় উত্তর পত্রে পরীক্ষার্থীর ক্রমিক নং (Roll number) লেখা হয়, কিন্তু কোথাও পরীক্ষার্থীর নাম লেখার রীতি নেই। এ ভিত্তিতে তিনি তুমুল আন্দোলন করেন। আন্দোলনে বিরোধী পক্ষ আপত্তি তুললে তিনি অন্ততঃ অনার্স ও এম.এম পরীক্ষায় পরীক্ষা মূলকভাবে ক্রমিক নম্বর ব্যবহার বিধি প্রবর্তনের দাবী জানান। অতঃপর বহু বাক-বিতণ্ডার পর তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এর ফলে মুসলিম পরীক্ষার্থীদের মধ্য থেকেও প্রথম স্থান অধিকার করে।

পরবর্তীতে আই.এ. ও বি.এ. পরীক্ষার ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখা রহিত করা হলেও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উক্ত প্রথা অবলম্বিত হয়নি। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় একই প্রথা অবলম্বনের প্রস্তাব রাখেন। কিন্তু তাঁর পরবর্তীগণ এ বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হননি। এমনকি কয়েকবার মুসলিম ভাইস চ্যান্সেলর Syndicate-এর সভাপতির পদে অলংকৃত করলেও এত বড় আবশ্যকীয় বিষয়টি তাদের বিবেচনাধীন ছিল না।

২. সে সময় হাই ও Intermediate মাদরাসা হতে পাশ করলে ছাত্ররা কলেজে ভর্তি হতে পারত না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উক্ত মাদরাসাদ্বয়ের শিক্ষার মান উন্নীত করেন। ফলে মাদরাসা থেকে পাশ করা ছাত্ররা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পায়।

৩. সব স্কুল কলেজে মৌলভীর পদ ছিল না, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সব স্কুল-কলেজে মৌলভীর পদ সৃষ্টি করেন এবং পণ্ডিত ও মৌলভীর বেতনের বিশেষ বৈষম্য রহিত করেন।

৪. তখন উর্দুকে Classical language হিসেবে গণ্য করা হত না, ফলে পশ্চিম বঙ্গে উর্দুভাষী ছাত্রদের অসুবিধা হত। তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দু সংস্কৃতির স্থান অধিকার করে।

৫. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খসড়া বিল সিনেটে উপস্থাপিত হলে দারুণ বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে তা বিবেচনার জন্য একটি স্পেশাল কমিটি গঠিত হয়। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা উক্ত কমিটির একজন মেম্বর ছিলেন এবং যতদূর সম্ভব তিনি এর আবশ্যকতা সমর্থন করেন।

৬. কলকাতার মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি স্বতন্ত্র কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব সমর্থন করার ভার হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার উপর ন্যস্ত হয়। হিন্দু সদস্যগণ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করেন। তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কাছে হিন্দুদের আপত্তি টেকেনি। ফলে ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কলেজের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী ঐতিহ্য, আচার ঐতিহ্য, আচার-আচরণ, বাধ্যতামূলক নামায ও ইসলামী পারিপার্শ্বিকতা গঠন।

৭. গভর্নমেন্ট মুসলিম শিক্ষার ভার হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.) উপর ন্যস্ত করেন। ফলে বহু মক্তব-মাদরাসা, মুসলিম হাইস্কুল এবং কলেজ তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়াও অমুসলিম স্কুলে মুসলিম শিক্ষকের নিযুক্তি এবং অন্যান্য সরকারী বিভাগে মুসলিম কর্মচারী নিয়োগও তাঁর হাতেই ন্যস্ত ছিল।

এ সুযোগে তিনি স্বতন্ত্র মক্তব পাঠ্য নির্বাচন ও মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার জন্য একমাত্র মুসলিম লেখকের প্রণীত পুস্তক প্রচলনের নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং গভর্নমেন্টের অনুমোদন নেন। প্রত্যেক মুসলিম বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য হয় এবং প্রত্যেকের জন্য মুসলিম রচিত পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার প্রচলন হয়। এতে হিন্দুদের আপত্তি থাকলেও গভর্নমেন্টের কোনো আপত্তি ছিল না। এ সময় মখদুমী লাইব্রেরী, প্রোভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ও পরে ইসলামিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে মুসলিম শিক্ষায় নব প্রেরণা আসে, ধর্মভাবের পুনরুদ্ধার হয়। হিন্দু মুসলিম শিক্ষার্থী সমভাবে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

৮. মুসলিম ছাত্রদের জন্য বৃত্তির ধারা নির্দিষ্ট হয়। সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের বৃত্তি বন্টনের পূর্বে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করা হত।

৯. মুসলিম লেখকদের পাঠ্যপুস্তক লেখার সুযোগ দেয়া হয়েছিল। পূর্বে যে সকল লেখক ও পুস্তক ঘৃণিত বলে বিবেচিত হত সরকারী ব্যবস্থায় তা সমাদৃত হতে থাকল। অল্প সময়ের মধ্যে মুসলিম পুস্তক প্রকাশক ও লেখকদের অবস্থা আশাতীত উন্নতি লাভ করে।

১০. পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা নির্ধারিত হল। মুসলিম বৃত্তির পরিমাণ বর্ধিত হল।

১১. মুসলমান ছাত্রদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল,

মুসলিম ইনস্টিটিউট কলকাতার বুকে প্রতিষ্ঠিত হয়।

১২. মুসলিম সাহিত্যের বিপুল প্রসার লাভ করে। মুসলিম সাহিত্যিকগণ নতুন প্রেরণা পান।

১৩. বৈদেশিক শিক্ষার জন্য মুসলিম সরকারী সাহায্য প্রদানের নিয়ম নির্ধারিত হয়।

১৪. টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলিম সদস্য নিযুক্ত হয়, মুসলিম পাঠ্যে ইসলামী শব্দ প্রয়োগ হতে থাকে।

১৫. New Scheem মাদরাসার সৃষ্টি হয় এবং আরবী শিক্ষার মধ্যস্থতায় ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয়।

১৬. হাইস্কুলে আরবী অধিকতরভাবে Second language রূপে গৃহীত হয়।

১৭. স্কুলে-কলেজে মুসলিম বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারিত হয় ও মুসলিম ছাত্রকে বর্ধিত হারে বিনা বেতনে শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

১৮. স্থানে স্থানে মুসলিম এডুকেশনাল কনফারেন্সের অধিবেশন হত ও তাঁদের সুপারিশ অনুসারে গভর্নমেন্ট মুসলিম শিক্ষার সর্বাঙ্গীন ব্যবস্থা করতে থাকে।

১৯. তদনুসারে তিনি মফঃস্বলের স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পরিদর্শনের অনুমতি পান এবং মুসলিম শিক্ষার যে সব অভাব অভিযোগ দেখেন তা দূরীকরণের জন্য সুব্যবস্থা করেন।

২০. বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর সংখ্যায় মুসলিম সদস্য নিযুক্ত হতে থাকে।

২১. পরিদর্শক কর্মচারীদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

২২. ট্রেনিং কলেজে মুসলিম শিক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

২৩. মুসলিম মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ বিশেষ স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৪. নিউ স্কিম মাদরাসাগুলোর জন্য একটি স্পেশাল বোর্ড গঠিত হয়।

২৫. সকল শ্রেণীর পরীক্ষকদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যা বর্ধিত হয়।

২৬. স্কুল ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটির মধ্যে মুসলিমদের নূন্য সংখ্যা নির্ধারিত হয়।

২৭. মুসলিম অন্তপুরবাসিনীদের মধ্যে শিক্ষা ও শিল্পের বিস্তার সাধিত হয়।

২৮. বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম কর্মচারী নিয়োগের আবশ্যকতা গৃহীত হয়।[১৪৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় লক্ষ্য করেছিলেন এদেশে মুসলমানদের জন্য শিক্ষার সুযোগ সীমিত। ইংরেজদের সাথে মুসলমানদের অসহযোগিতার কারণে হিন্দুরা শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রণী হয়। ফলে চাকরি এবং সমাজ জীবনে ইংরেজদের সহযোগিতায় তাঁরা মর্যাদার আসনে উন্নীত হয়। দেশের সকল কর্মকাণ্ডে হিন্দুদের একচেটিয়া প্রাধান্য ছিল।

---

১৪৬. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৯, পৃ. ১৫৪-১৬০।

অপরদিকে মুসলমানরা ধর্মীয় অভিমান হেতু ইংরেজী শিক্ষাকে গ্রহণ না করে হিন্দুদের অপেক্ষা পশ্চাদপদ হয়ে পড়ে। সমাজ জীবনেরও তারা হিন্দুদের ঈর্ষা ও ঘৃণার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। মুসলমানদেরকে মনে করা হতো অস্পৃশ্য যবন। কোন মুসলমান শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত তাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হতো। খানবাহাদুর নিজের জীবনেও এমন ষড়যন্ত্রের সম্মুখীন হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর রহমতে স্বীয় প্রতিভাবলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে উচ্চাসন লাভে সমর্থ হন। তাঁর পূর্বে ভারতীয়দের মধ্যে কেউ শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদ লাভ করেননি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষাক্ষেত্রে যে পরিবর্তন এনেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও দেশের শাসন ব্যবস্থা এবং চাকরি ক্ষেত্রে তাদের উপযোগী করে তোলা। ইতোপূর্বে হিন্দুরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের মনে যে বিদ্বেষভাব জাগ্রত করেছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় তার নিরসন ঘটে।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পিছিয়ে পড়া অশিক্ষিত বাঙালী মুসলিম সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন। তাঁর মতে, শিক্ষা একজন মানুষের সুপ্ত শক্তি বিকাশের, মানুষকে মানবসম্পদে পরিণত করার এবং একটি সমাজ, দেশ ও জাতি গঠনের প্রধান ও একমাত্র হাতিয়ার। ড. মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সাথে তুলনা করে বলেন :

> এই দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে কিন্তু বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পেশাগত জীবনে উভয়েই শিক্ষা বিভাগের কর্মচারী, শিক্ষা সংস্কারক এবং দেশী শিক্ষার উন্নতি সাধনে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রদানে সর্বোতভাবে উদ্যমী এবং বলিষ্ঠ সমাজ সংস্কারক। এমনকি উভয়ে গ্রন্থ প্রকাশনা ও গ্রন্থ বিপণনকর্মেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লার ভূমিকা আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই ঈশ্বরচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। উনিশ শতকে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে দুর্গম অভিযানে পথ অতিক্রম করেছিলেন, বিংশ শতকের প্রথম দিকে বাঙালী মুসলমানের শিক্ষা ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সেই প্রকার দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করেছিলেন। পশ্চাৎমুখী কুপমণ্ডুক বাঙালী মুসলমান সমাজে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার, বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের প্রয়াস-তৎকালে এ সমস্ত ছিল অমার্জনীয় অপরাধের সমতুল্য। সেই নেপথ্য কর্মী কদাপী যিনি পাদ-প্রদীপের আলোতে আসনেনি, তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ প্রয়াসে এই সব কর্মে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বাঙালী মুসলমান সমাজে আহ্ছানউল্লা আরেক বিদ্যাসাগর।[১৪৭]

---

১৪৭. ড. মুস্তফা নূর-উল ইসলাম, প্রবন্ধ : বাঙালী মুসলমান সমাজে আহ্ছানউল্লা আরেক বিদ্যাসাগর, *বাংলাবাজার পত্রিকা*, ১৪ পৌষ, ১৪০৩ বাংলা, পৃ. ৯।

যুগ, পারিপার্শ্বিকতা ও বিশ্বপ্রেক্ষিত এবং প্রয়োগের ক্ষেত্র বিবেচনায় নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন অত্যন্ত উদার। বাঙালী মুসলিম জাতির জন্য যুগোপযোগী শিক্ষার সম্প্রসারণই ছিল তাঁর শিক্ষা বিস্তারের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তাই তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ভাবনা ও পদক্ষেপ আমাদের দেশসহ মুসলিম বিশ্বে শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস করা যায়। পরিশেষে বলা যায়, অনগ্রসর ও অশিক্ষিত বাঙালী মুসলিম সমাজকে শিক্ষার আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করার ক্ষেত্রে তাঁর এ সকল অবদান ও দুঃসাহসিক কৃতিত্বপূর্ণ কর্মের কথা মানুষের মনে ও ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

অধ্যায় : চার

মুসলিম সমাজ সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ভূমিকা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অবহেলিত এবং নিগৃহীত মুসলিম জাতিকে আপন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। তিনি মুসলমানদের কেবল চাকরি উপযোগী করে তুলতে চাননি। তিনি জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রত্যেককে যথার্থ মুসলমান এবং বাঙালীরূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তার মতে, শিক্ষার বদৌলতেই মানুষের মধ্যে যাবতীয় সৌন্দর্য এবং গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করলে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তিনি শুধু শিক্ষাসেবী বা শিক্ষাবিদই ছিলেন না; বরং প্রকৃত অর্থে তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক এবং জাতির বিশিষ্ট নকীব। তিনি তাঁর জীবনে দর্শন ও কর্মের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন।

তিনি তাঁর শিক্ষামূলক কার্যক্রমে ইসলামী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার মিলন ঘটিয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষানীতির মূলে ছিল পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের শিক্ষা। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানুষের চারিত্রিক ও আত্মিক উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এবং মানবিক হিত সাধনে প্রেরণা দান করে।

ভাষা ও সাহিত্য

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি দেশ এবং জাতিকে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ বলে বিবেচনা করতেন। তিনি যথার্থ মুসলমান ছিলেন বলেই যথার্থ বাঙালী ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্যও তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন, বাংলাভাষা মুসলমানদের অবদান। তিনি তাঁর *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য* গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন।

বাংলা ভাষাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার মূলে মুসলমান রাজন্যবর্গের অবদান অপরিসীম। বাঙালী ও বাংলা ভাষার জন্য তুর্কী অভিযান ছিল আশীর্বাদ স্বরূপ। পাঠান সুলতানগণ নিজেরা বাংলা ভাষা

শিক্ষা করে যেমন বাঙালী হয়েছেন তেমনি পণ্ডিত ও কবিদেরকে এই ভাষায় সাহিত্য চর্চার প্রেরণা যুগিয়ে বাংলা ভাষার অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলিম রাজন্যবর্গের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয়দান করেছেন তাঁর *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য* নামক গ্রন্থে। এই প্রবন্ধের রচনাকাল ২১ এপ্রিল ১৯১৮। এ পুস্তিকার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি বিধানে মুসলমান সুলতানদের ভূমিকা বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে বাঙালী জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করা। খানবাহাদুর তাঁর গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রমাণ করেছেন, বাংলা ভাষা মূলতঃ মুসলমানদের দান এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া নয়। তিনি উল্লেখ করেছেন, আরবী ও ফারসী শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে এ ভাষার শ্রীবৃদ্ধি এবং পরিপুষ্টি সাধন করেছে। তিনি আলাওলসহ অনেক মুসলিম কবি-সাহিত্যিকের বাংলা ভাষার উৎকর্ষ বিধানে তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের প্রয়াসী ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষাকে এ মিলনের ক্ষেত্র বিবেচনা করতেন। তিনি বলেন :

> বঙ্গভাষা হিন্দু ও মুসলমানের নিকট সমভাবে আদরণীয়। বঙ্গভাষার উন্নতি উভয়েরই সমভাবে আকাঙ্খা। যখন উভয় জাতি স্ব-স্ব মনোভাব আদান প্রদান করে, তখনই পরস্পরের সাহায্যে ভাষার উন্নতি হইতে থাকে। যে পর্যন্ত হিন্দু মুসলমান পরস্পরের কুৎসা হইতে বিরত না হইবে, যে পর্যন্ত বঙ্গভাষায় সংস্কৃত ও মুসলমানী শব্দের সমবায় না হইবে, যে পর্যন্ত উভয় জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপিত না হইবে, সে পর্যন্ত বঙ্গদেশের উন্নতি সুদূর পরাহত। যেখানে সম্মিলন, সেইখানেই প্রীতি ও উন্নতি, যেখানে দূরত্ব, সেইখানেই অপ্রীতি ও অবনতি। যে পর্য্যন্ত আমাদের দ্বিত্বভাব তিরোহিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত একত্ব লাভ কিরূপে সম্ভব হইবে? বঙ্গভাষা সহস্র বৎসর পূর্বের ইতর শ্রেণীর মধ্যে প্রাকৃত নামে অভিহিত ছিল। বহুকাল পর্য্যন্ত পণ্ডিতগণ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাই বঙ্গভাষার উন্নতির ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।[১]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে ভাষার উন্নতির মাধ্যমে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তিনি সকলকে পূর্ণ বাঙালী হতে আহবান জানিয়েছিলেন।

আমরা ১৯৫২ সালকে প্রথম ভাষা আন্দোলনের কাল বলে মনে করি। কিন্তু এই আন্দোলন যে পাকিস্তান পূর্বকাল থেকে শুরু হয়েছিল তা আমরা জানি না। ব্রিটিশ আমলে কতিপয় হিন্দু ও

---

১. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পা., *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ৭ম খ, ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, পৃ. ২৬।

মুসলমান রাজনীতিকবৃন্দ হিন্দী এবং উর্দু ভাষার প্রাধান্যের যে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন যার ফলে বাংলা ভাষা তার গুরুত্ব এবং মর্যাদা হারাতে বসেছিল। এমনি ক্রান্তিলগ্নে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সৈনিক হিসেবে অবতীর্ণ হন। বলা যেতে পারে, আজ যে বাঙালী জাতীয়তাবাদ আমাদের রক্তের প্রতিটি ধমনীতে প্রবহমান তার ভিত্তিমূল রচনা করেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার ন্যায় গুটিকয় দেশসেবী বরেণ্য মহাপুরুষ।

একথা সত্য যে, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু একটি পতনোন্মুখ জাতিকে স্বীয় মর্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল। রাজত্ব হারাবার পর মুসলমান জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তৎকালীন হিন্দু রাজনীতিকগণ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য হিন্দুর ধ্বংস কামনা করেননি। তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক। তিনি বাঙালী জাতি ও ভাষার উন্নতি কামনা করেছিলেন এবং হিন্দু ও মুসলমানকে এক গোত্রীভূত দেখতে চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

> কোন কোন ব্যক্তির ধারণা আছে, হিন্দুর সাহিত্য অনুসরণ করিলে আমাদিগকে হিন্দুত্বের বশীভূত হইতে হইবে। আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমরা জাতীয় ভাব দ্বারা বঙ্গ সাহিত্যকে অনুপ্রাণিত করিব ও জাতীয় মহত্ব অপর জাতিকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিব। ইহাতে ভাষার সৌষ্ঠব বাড়িবে, চিন্তা শক্তির প্রসার হইবে ও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সহানুভূতি উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকিবে।[২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্বাস করতেন যে, সভ্য জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করতে হলে ইংরেজী ভাষা জানা বিশেষ প্রয়োজন।। সভ্যতার ইতিহাস কোন একটি বিশেষ জায়গায় স্থির থাকে না। এক সময় মিসর সভ্যতার দিক থেকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত ছিল। পরবর্তীতে গ্রীক জাতি মিসরীয় সভ্যতা থেকে জ্ঞান আহরণ করে উন্নতি লাভ করে। অতঃপর মুসলমানরা এ উভয় সভ্যতা থেকে জ্ঞান আহরণ করে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। কিন্তু কালের বিবর্তনে মুসলমানদের এ অগ্রগতি নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। পাশ্চাত্য দুনিয়া মুসলমানদের থেকে জ্ঞান আহরণ করে আজ সারা পৃথিবীর বুকে সভ্যতার ধারক ও বাহক বলে পরিচিত হচ্ছে। আর ইংরেজী ভাষা এ সভ্যতার বাহন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বিশ্বাস করতেন, যে জাতির মধ্যে

---

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০।

যেটুকু উৎকৃষ্ট আছে তা গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের লক্ষণ এবং বর্জন করা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন :

> আজ কাল ইংরেজী শিক্ষা লইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মহা আন্দোলন চলিতেছে। এক পক্ষের মত এই যে, যে শিক্ষা মাতৃভাষার সাহায্যে প্রদত্ত না হয়, সে শিক্ষা অসম্পূর্ণ। অপর পক্ষের মত এই যে, উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের সমস্ত শিক্ষাই ইংরেজীর সাহায্যে হওয়া উচিত। ... প্রায় একশত বর্ষ অতীত হইল। সর্বশ্রেণীর ইংরেজী বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিতেছে এবং ভারত বর্ষ দিন দিন উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে। ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে বঙ্গ ভাষা ক্রমশঃ প্রসার প্রাপ্ত হইতেছে। যে বঙ্গভাষা পূর্ব্বের ইতর শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, যে বঙ্গভাষা পণ্ডিতগণের নিকট পৈশাচী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই বঙ্গভাষা এক্ষণে ইংরেজীর সাহায্যে ভারত বর্ষের অতি সম্মানিত ভাষার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। ... ...
>
> তাই বঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের নিকট বিনীত অনুরোধ যে, তাঁহারা জাতি নির্বিশেষে বঙ্গ ধর্মাভাব উদ্দীপ্ত করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার মাহাত্ম্যে ও মাতৃভাষার সাহায্যে দেহ, মন ও আত্মাকে পরিপুষ্ট করতঃ ভারতবাসীর পূর্ব-গৌরব রক্ষা করিতে সহায়তা করুন, সুনীতি ও সুশাসনের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া প্রেমময়ের উদ্দেশ্য সাধন করিতে তৎপর হউন এবং বিশ্বজগতে স্বীয় স্মৃতি কাহিনী নিবেদিত করিয়া ইহ ও পরজগতের সম্মান অর্জন করুন।[৩]

ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষানীতি এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রমুখের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাঙালী মুসলমানের অনীহা হ্রাস পেতে থাকে এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে। তবে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা কোন সময়ই ধর্মকে শিক্ষার বহির্ভূত করেননি। তিনি যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য ইংরেজী ভাষা শিখতে অন্যকে প্রেরণা দিয়েছিলেন তেমনি মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য উর্দুর প্রচলনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন :

> সকলেই অবগত আছেন যে, স্কুল ও কলেজ পাঠ্যে আজকাল ধর্মালোচনার কোন আদেশ নাই। এই অভাব অপনোদনার্থে মুসলমান নেতৃগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু শিক্ষার প্রচলন করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। মুসলমান ছাত্র ইচ্ছা করিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য বাঙ্গলা উর্দ্দু উভয়েই গ্রহণ করিতে পারিবে। ইহাতে বাঙ্গলা শিক্ষার ব্যাঘাত হইবে না, অথচ প্রত্যেক মুসলমান বালক বাল্যকাল হইতে স্বীয় ধর্মে আস্থা স্থাপন করিতে শিখিবে। পূর্ব পুরুষদিগের ইতিহাসে গর্ব্বিত হইয়া ভবিষ্যতৎ ছবি হৃদয়ে অংকিত

---

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯।

করিয়া ইংরেজী ও মাতৃভাষার সাহায্যে দিন দিন খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইবে।[৪]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর সকল চেতনা, ধ্যান-ধারণা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতো। এ ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য :

> ভাষার সহিত সাহিত্যের অতি নিকট সম্বন্ধ। সাহিত্যের উন্নতি জাতীয় উন্নতির পরিচায়ক। ভাষার উন্নতির সহিত সাহিত্যের উন্নতি সংঘটিত হয়। মনের ভাব ভাষায় পরিণত হয়। ভাব যাহার যত উচ্চ, তাহার ভাষাও তত প্রকৃষ্ট। ভাষা দ্বারা শিক্ষা ও সভ্যতার পরিমাপ পাওয়া যায়। ... যে সমাজ বা যে জাতির মধ্যে উচ্চ ভাবাপন্ন ব্যক্তি যত অধিক, সে সমাজ বা জাতির সাহিত্যও তত উন্নত।[৫]

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলের কল্যাণকামীতা। সমাজসেবাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য সম্পর্কে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা এমন ধারণা পোষণ করতেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। এ উপমহাদেশে ব্রিটিশ আমলে হিন্দু স্বৈরাচারী নীতির ফলে মুসলমানরা যেভাবে নিগৃহীত এবং লাঞ্ছিত হয়েছিল জীবনের প্রতি পদক্ষেপে মুসলমানরা যেভাবে হিন্দুদের নিকট 'অছ্যুৎ' বলে ধিকৃত হয়েছিল তারই বাস্তব ফল হিসেবে দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং তা থেকেই পাকিস্তান জন্মলাভ করে। কিন্তু পাকিস্তান আমলে পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি ঔপনিবেশিক ও বিদ্বেষজাত ভাবনা পোষণ করলে পূর্ব পাকিস্তানীরা স্বাধীকার আন্দোলন শুরু করে এবং তারই বাস্তব ফল সার্বভৌম বাংলাদেশ।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, উর্দুকে ভাষা হিসেবে শিখতে আপত্তি না করলেও উর্দুকে সাহিত্য ও সংস্কৃতির বাহন হিসেবে চাপিয়ে দেবার ষড়যন্ত্র হলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্য জাতি নির্বিশেষে সমগ্র বাঙালীকে আহবান করেছেন। সে কালে এমন বলিষ্ঠ মনোভঙ্গি তৎকালীন মুসলমানদের মধ্যে বিরল ছিল। তিনি বলেন :

> বাংলা ভাষাকে জাতীয়ভাবে পূর্ণ করিতে হইবে, তদনুসারে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। আমাদের জাতীয় ইতিহাস, সামাজিক উপন্যাস, তাপসদিগের জীবন সমস্তই আরবী, পারসী ও উর্দু ভাষায় লিখিত, যে পর্য্যন্ত এইগুলি প্রকৃষ্ট বঙ্গভাষায় লিখিত না হইবে যে পর্যন্ত বাংলা ভাষায় মুসলমানেরা নিজস্ব বলিয়া পরিচিত না হইবে, সে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য জাতীয় শক্তি উদ্দীপ্তি করিতে

---

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯-৩০।

সক্ষম হইবে না। ...

যতই বাংলা ভাষা জাতীয়তাবে স্নাত হইবে, ততই মুসলমানদিগের শিক্ষার পথ সুগম হইবে। মাতৃভাষার স্থল উর্দু পারসী এমনকি আরবীও অধিকার করিতে সমর্থ নহে।[৬]

বাংলা ভাষার প্রতি এমন গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তৎকালীন সমাজে আমরা কল্পনা করতে পারি বা। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শুধু মর্দে মু'মিন ছিলেন না, তিনি মর্দে বাঙালীও ছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর সমগ্র জীবনে ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, যথার্থ ধর্ম মানুষকে কল্যাণের পথে, আলোকের পথে ধাবিত করে। শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণ।

বাঙালী মুসলমানদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে তিনি যে কীর্তি রেখে গেছেন, তাতে তাঁকে নিঃসন্দেহে বাংলার স্যার সৈয়দ আখ্যায় ভূষিত করা যায়। তিনি ১০৮টিরও বেশি গ্রন্থ প্রণয়ন করেছিলেন। এর অধিকাংশই ছিল মুসলিম জাগরণ এবং জাতীয়তাভিত্তিক রচনা। তাঁর শিক্ষামূলক রচনারও মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় জাগরণ।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজনীতিবিদ বা সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনাই ছিল বাঙালী মুসলিম সমাজের উন্নতি এবং অবনতিকে কেন্দ্র করে। সমস্ত দর্শন এবং চেতনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, একের স্বার্থের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ সাধন। তিনি বাঙালী মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পশ্চাদপদ মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বলে ভাবতেন, কিন্তু তিনি কোন সময়ই ব্রিটিশ রাজত্ব এদেশে স্থায়ী হোক– এমন চিন্তা করেননি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তিনি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সূফী সাধক হওয়ার ফলে মানবতার উন্নতি বিধানই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা।

---

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর চাকরি জীবনে কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মোবারক আলী (খান বাহাদুর)-এর জন্য ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে কলেজ স্কয়ারে একটি পুস্তকের দোকানের ব্যবস্থা[৭] করেন। তাঁর পীর মুর্শিদের ইঙ্গিতে বিহার শরীফের বুযুর্গ হযরত মখদুমুল মুলক রহমতুল্লাহি আলাইহি-এর নামানুকরণে এর নাম 'মখদুমী লাইব্রেরী' রাখা হয়। কিছুকাল পর হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার পুত্র মোঃ বদরুদ্দোজা 'এম্পায়ার বুক হাউস' নামে স্বতন্ত্র একটি লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিছুকাল পর এই লাইব্রেরীর নাম পরিবর্তন করে 'আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' রাখা হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দোকানের পরিবর্তিত নামকরণ হয় 'মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস' এবং ৩নং কলেজ স্কয়ার থেকে ১৫নং কলেজ স্কয়ারে (এলবার্ট হলের দক্ষিণ) স্থানান্তরিত হয়। 'তাঁর স্থাপিত মখদুমী লাইব্রেরী প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইসলামী গ্রন্থ প্রচারে যথেষ্ট সহায়তা করে।'[৮] এ সময় মুসলমানগণ বইয়ের ব্যবসায় খুব আগ্রহী ছিলেন না। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার জন্য এটি ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। মখদুমী লাইব্রেরীর ভিত্তি স্থাপন শুধুমাত্র ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখলে ভুল হবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন মনে প্রাণে সাহিত্যানুরাগী। সাহিত্য-চর্চায় তিনি নিজে শুধু অগ্রণী ভূমিকা পালন করেননি, তৎকালীন অন্যান্য মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশের এবং প্রচারের মাধ্যম হিসেবে তিনি এই লাইব্রেরীকে ব্যবহার করেন। ব্যবসায়িক মানসিকতা নয়, একান্ত আন্ত রিকতা ও দরদ দিয়ে এখান থেকে নিয়মিতভাবে মুসলমান লেখকদের রচনা প্রকাশ করা হত। মুসলমান লেখকরা আবার পূর্ণোদ্যমে নতুন নতুন সাহিত্য সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করেন। এর ফলে এই 'মখদুমী লাইব্রেরী'র কৃপায় সে সময়ের কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থগুলোর মধ্যে 'বিষাদ সিন্ধু' ও 'আনোয়ারা'র নাম উল্লেখ করা যায়। 'বিষাদ সিন্ধু' সম্পর্কে খানবাহাদুর মোবারক আলী বলেছেন :

> ... হঠাৎ একদিন নদীয়ার প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার মীর মশাররফ হোসেন ছাহেবের জেষ্ঠ্যপুত্র মীর এবরাহিম হোসেন ছাহেব তাঁহার পিতার প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ 'বিষাদ সিন্ধু' আবাঁধা অবস্থায় গাড়ী ভর্তি করিয়া আমার দোকানে আনিয়া জমা দিলেন। চুক্তি হইল- বাঁধান খরচ বাদে ২৫ টাকা হিসাবেই কমিশন পাইব।[৯]

---

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬।

৮. শ্রী অঞ্জলি বসু সম্পাদিত *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৭৬, পৃ. ১০-১১০।

৯. *খানবাহাদুর মোবারক আলী, আমাদের পরিচয়*, প্রাগুক্ত, ১৯৬৬, পৃ. ১৫।

মখদুমী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত 'আনোয়ারা' উপন্যাসটি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ সম্পর্কে প্রকাশকের বক্তব্য :

> সে সময় পাড়াগাঁয়ে সন্ধ্যার পরে গ্রামবাসীগণ হয়ত কোন বৃদ্ধলোকের নিকট গিয়া গল্প শুনিত অথবা তাস পাশা খেলিয়া সময় কাটাইত। কিন্তু যে গ্রামে একখানা 'আনোয়ারা' পুস্তক গিয়াছে, সেখানে সকলে অবাক হইয়া আনোয়ারার কেচ্ছা শুনিত। তাহাতে পুস্তকটি প্রচুর বিক্রয় হইতে থাকে। এই আনোয়ারা পুস্তকে দেশের অশিক্ষিত মুসলমানদিগকে লেখাপড়া শিক্ষার আগ্রহ আনায়...।[১০]

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এক সরকারী নির্দেশবলে মুসলমান লেখকদের প্রণীত পুস্তকই মক্তব-মাদরাসায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। মখদুমী লাইব্রেরী এ সময়েও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। মুসলমান লেখকদের লেখা পাঠ্যপুস্তক বিপুল পরিমাণে মুদ্রণ ও প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি একমাত্র মখদুমী লাইব্রেরীই গ্রহণ করেছিল। মুসলিম সাহিত্যে অনুরাগী ও উৎসাহী পাঠক-পাঠিকা মখদুমী লাইব্রেরীর এ অবদানের কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবেন। মখদুমী লাইব্রেরী প্রকাশিত সেদিনের সচিত্র বর্ণ পাঠ, প্রথম পড়া, মক্তব বর্ণ পাঠ, মক্তব বাল্যশিক্ষা, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা, মক্তব-মাদ্রাসা সাহিত্য, ধারাপাত, আমপারা, উর্দু, কায়দা প্রভৃতি বই বহু মুসলমান শিক্ষার্থীর পাঠ্য বইয়ের অভাব পূরণ করে। লাইব্রেরী সম্পর্কে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেছেন :

> ধুম গতিতে লাইব্রেরীর কাজ চলিতে থাকিল। বহু সাহিত্যিক, লেখক, কবি ও কর্মীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহযোগীতা পাইলাম। প্রাইমারী ও মাধ্যমিক পাঠ্যের বই এবং অন্যান্য বহু পুস্তক আমরা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। দিকে দিকে আহ্ছানউল্লা বুক হাউসের সুনাম সুখ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। আমাকেও পুস্তক লেখার আবার কখনো লাইব্রেরীর কাজে সারা দিনরাত খাটিতে হইত।[১১]

এ সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করলে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তৎকালীন মুসলমান লেখক-লেখিকাদের সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল সুযোগ প্রদানের জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার পথ সুগম করার জন্য মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস প্রতিষ্ঠা করেন।

চাকরি জীবনে এবং অবসর জীবনে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা নিরলসভাবে সাহিত্য সাধনা করেছেন।

---

১০. প্রাগুক্ত।

১১. মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, পৃ. ১৯৪।

তৎকালীন মৃতপ্রায় মুসলমানদের নবজাগরণের জন্যে মুসলিম ঐতিহ্য এবং ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও বিধি-বিধান শীর্ষক বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে তিনি নতুন নতুন তথ্য ও তত্ত্বের সন্ধান দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে। এদিক থেকে তাঁর গ্রন্থের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলা একাডেমী তাঁকে 'ফেলো' সম্মানে ভূষিত করে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৪ মে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদ ৩২তম সভায় তাঁদের পুরস্কার উপসংঘের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

> In view of the literary services rendered to the Bengali literature in general and Bengali literature of East Pakistan in particular, it is recommended that the following literary persons be offered the honour of being the Fellow of Academy :
>
> 1. Khan Bahadur Ahsanullah, 2. Shaikh Reazuddin Ahmed, 3. Shaikh Habibur Rahman, Sahitya Ratna, 4. Nurunnesa Khatun, Vidya vinodini.

বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক এ সম্পর্কে একাডেমী পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন[১২] পেশ করেন এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লাকে পত্র লেখেন :

> পত্রের সংখ্যা ৮০২২-বা, এ, ১৪ই জুলাই, ১৯৬০
>
> প্রেরক : পরিচালক, বাংলা একাডেমী,
> বর্ধমান হাউস, ঢাকা।
>
> জনাব, বিগত ৪ঠা ও ৫ই মে তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলা একাডেমীর কর্মপরিষদের ৩২-তম সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমি আপনাকে সানন্দে জানাইতেছি যে, বাংলা সাহিত্যে আপনার বিশিষ্ট ও বহুমুখী দানের স্বীকৃতিরূপে একাডেমী আপনাকে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানটির 'ফেলো' বা 'সম্মানিত সদস্যের' মর্যাদা দিয়া নিজেকেই গৌরবান্বিত মনে করিতেছে।

---

১২. ... ... এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত যে সাহিত্যিকবৃন্দ আজীবন বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা ও সাহিত্যের সেবা করিয়া গিয়াছেন সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁহাদের এই বিশেষ দানের স্বীকৃতি হিসাবে তাহাদিগকেও একাডেমীর সম্মানিত সদস্য (Fellow)-এর তালিকাভুক্ত করা হইল :

১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, ২. শেখ রিয়াজউদ্দীন আহমদ, ৩. শেখ হাবিবুর রহমান সাহিত্যরত্ন, ৪. নূরুন্নেছা খাতুন, বিদ্যাবিনোদিনী।

একাডেমীর কথা, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, , ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭।

অতঃপর, আপনি যথানিয়মে একাডেমীর যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন। আপনার বিশেষ অবগতির জন্য এতৎসঙ্গে আবশ্যক কাগজ-পত্র পাঠাইলাম।

আশা করি, একাডেমী আপনার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতা হইতে কখনও বঞ্চিত হইবে না। ইতি–

আপনার একান্ত অনুগত
স্বাঃ মুহাম্মদ এনামুল হক

পরম শ্রদ্ধেয়
জনাব খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবকে লিখিত,
৯, আরমেনিয়ান স্ট্রীট, ঢাকা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমগ্র জীবনকে নিম্নোক্তভাবে চিহ্নিত করা যায় :

শিক্ষা জীবন	১৮৭৩-১৮৯৫
চাকরি জীবন	১৮৯৫-১৯২৯
অবসর জীবন	১৯২৯-১৯৬৫
লেখক জীবন	১৯০৫-১৯৬৫

তাহলে তাঁর লেখক জীবন হিসেবে আমরা পাই সুদীর্ঘ ৬০ বৎসর। এই দীর্ঘ সময়কে তিনি পুরোপুরি সদ্ব্যবহার করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী যুগে অনেক মুসলিম সাহিত্যিকদের মধ্যে সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টা আরো ব্যাপক ও আন্তরিক হয়ে ওঠে।[১৩] এ যুগের খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের মধ্যে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা অন্যতম। এ সময়ের অন্যান্য খ্যাতনামা সাহিত্যিকরা হলেন– মাওলানা মুহাম্মদ আকরম খাঁ (১৮৮৩-১৯৬৮), ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯), মুহম্মদ বরকতুল্লাহ (১৮৯৬-১৯৭৪), ইব্রাহিম খাঁ (১৮৯৪-১৯৭৮), আবুল মনসুর আহমদ (জন্ম ১৮৯৮) প্রমুখ।

হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (র.)-এর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। তাঁর লেখক জীবনের বিস্তৃতি সুদীর্ঘ ৬০ (১৯০৫-১৯৬৫) বছর। তবে চাকরি জীবনে তাঁর মাত্র কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাঁর রচিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধের সংখ্যা ১০৮টি।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর রচিত সব গ্রন্থই আদর্শকেন্দ্রিক। এ প্রসঙ্গে আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ লিখেছেন :

---

১৩. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, পৃ. ৩।

> সাহিত্যের প্রতি তাঁর [খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা] আকর্ষণ মানব-জীবনের আদর্শবাদ প্রচারের জন্য। তিনি জীবনকে দেখেছিলেন মানব আত্মার প্রকাশের কর্মসূচী হিসেবে। সেজন্য সাহিত্যের মধ্য দিয়ে তিনি মানব-জীবন গঠনের আদর্শ প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করেন।[১৪]

তাই বাঙালী মুসলমানদের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, এই অভাগা পিছিয়ে পড়া জাতিকে অনুপ্রেরণা জোগাতে, উৎসাহ দিতে কলম চালালেন বিভিন্নমুখী। তাঁর গ্রন্থগুলোর বিষয় সম্পর্কিত একটি তালিকা ও বিষয়ভিত্তিক নাম এখানে সন্নিবেশিত হল।

১. জীবনী বিষয়ক	..... ২০টি
২. ইতিহাস বিষয়ক	..... ১৪টি
৩. কুর'আন ও হাদীস বিষয়ক	..... ৯টি
৪. ইসলামী বিধান বিষয়ক	..... ১৭টি
৫. স্কুল ও মাদরাসার পাঠ্য বিষয়ক	..... ১১টি
৬. শিশু সাহিত্য বিষয়ক	..... ১০টি
৭. দর্শন বিষয়ক	..... ৩টি
৮. ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক	..... ২টি
৯. শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষানীতি বিষয়ক	..... ৩টি
১০. আহ্ছানিয়া মিশন বিষয়ক	..... ২টি
১১. তাছাওয়াফ বিষয়ক	..... ৩টি
১২. পত্র সংকলন	..... ২টি
১৩. বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা বিষয়ক	..... ২টি
১৪. স্বাস্থ্য বিষয়ক	..... ১টি
১৫. ভ্রমণ কাহিনী বিষয়ক	..... ১টি
১৬. কবিতা	..... ১টি
১৭. অগ্রন্থিত প্রবন্ধ	..... ৭টি
	মোট = ১০৮টি[১৫]

---

১৪. ড. আবুল কালাম মঞ্জুর মোরশেদ, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন, সাহিত্য, আদর্শ ও মানব প্রেম', *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, জুলাই-ডিসেম্বর, ১৯৯২।

১৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার গ্রন্থসমূহের নাম তৃতীয় অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে।

এছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন কমিশন রিপোর্টেও তাঁর কিছু বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। আহ্ছানিয়া মিশনের বার্ষিক রিপোর্টে তাঁর নানামুখী লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এসব লেখায় জীবন সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাঁর আদর্শভিত্তিক জীবন সংগ্রামের সাফল্য অর্জনের কৌশলের সুস্পষ্ট পরিচয় মেলে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দর্শনের ছাত্র হলেও ভাষা সাহিত্য, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, তাসাউফ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বিস্মিত হয়।

জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের পথ প্রশস্ত করাই ছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর সাহিত্যের মূল বৈশিষ্ট্য। ঐতিহ্য ও মুক্ত ধর্মীয় চেতনা ছিল তাঁর পুনর্জাগরণের প্রধান উদ্দীপক। তাঁর লেখনী ছিল ইসলামী সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যে ভরপুর। একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলমানের জন্য প্রয়োজনীয় সব বিষয় তাঁর লেখনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। ইসলামের সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর লেখনীতে প্রজ্ঞা, পরিমিতি, স্বতঃস্ফূর্ততা, যুক্তিনির্ভরতা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা, মননশীল ও গোঁড়ামীমুক্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তিনি কখনো কখনো উদারভাবে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনায় ব্যাপৃত হয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর বাণীর পাশাপাশি শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, কনফুসিয়াস, চৈতন্যদেব-এর মত মহাপুরুষদের বাণী অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

জীর্ণ সমাজের অবক্ষয় রোধই ছিল তাঁর সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অবক্ষয় রোধ, আত্ম উপলব্ধি ও চারিত্রিক কাঠামো তৈরীর মাধ্যমে সমাজ গঠনের উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট লেখক গোলাম মঈনউদ্দিন লিখেছেন :

> খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেব একটি বিশেষ সময়ে হৃত-সর্বস্ব মুসলমান জাতির পুনর্জাগরণের জন্য লেখণী ধারণ করেন। কিন্তু রচনার প্রসাদগুণে এবং বিষয়বস্তুর স্বকীয় উৎকর্ষতায় তার রচনা যুগের গণ্ডি কাটিয়ে চিরন্তন সাহিত্যের সম্মান লাভ করেছে।[১৬]

জাতীয় জীবনের পুনর্জাগরণের পথ উন্মোচিত করাই ছিল তাঁর সাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য। তাই সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল দৃঢ় ও স্পষ্ট। তিনি *বঙ্গভাষা ও মোছলমান সাহিত্য* গ্রন্থে সাহিত্য সংক্রান্ত

---

১৬. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রবন্ধ : খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : একটি শতাব্দীর ইতিহাস, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, ১৯৭৮।

দিক নির্দেশনা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

সর্বোপরি তিনি সাহিত্যের উন্নতির মাধ্যমে সমগ্র সমাজের উন্নতির আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেন :

> আমরা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও আত্মসম্মানবর্জিত, তাই সকলের ঘৃণ্য, দোষ অপরের নহে, দোষ আমাদের। যে আপনাকে সাহায্য করিতে পারে সে অপরের সাহায্য পাইবার উপযোগী। তাই বলি যদি সমাজকে উন্নত করিতে হয়, যদি শাসন নীতির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়, অন্য জাতির সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে সমকক্ষতা লাভ করিতে হয়, তবে ভিক্ষা ছাড়, অলসতা ত্যাগ কর, চরিত্র গঠন কর, মানব নামের বাচ্য হও।[১৭]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার এই আহবান মুসলিম ভাইদের মনেও তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কবি কাজী নজরুল, ফররুখ আহমদ, গোলাম মোস্তফা প্রমুখ কবিগণ পরবর্তীকালে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার এ বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে মুসলিম জাগরণের কবিতা লিখেছিলেন। আজও দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার এই বাণী মুসলিম সমাজ জীবনে গভীরভাবে প্রযোজ্য।

---

১৭. *বঙ্গভাষা ও মোছলমান সাহিত্য,* খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৫-৩৬।

আধ্যাত্মিকতা

খানবাহাদুর আহছানউল্লা আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। একজন কামেল পীর হিসেবে তিনি সকলের কাছে পরিচিত। গতানুগতিক পীর এবং এ জাতীয় উপলব্ধি থেকে তিনি কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি তাঁর মুরিদের কাছে সব সময় বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন– পীরের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত থেকে ভক্তদের আহবান করেননি। ইন্তিকালের পূর্বে তিনি কাউকে গদিনশীন করে যাননি। সম্ভবতঃ তাঁর ধ্যান-ধারণা এবং উপলব্ধি ও বিশ্বাস যে সত্যের মুখোমুখি করে তাহলো আধ্যাত্মিক শিক্ষা গুরু বা পীর– কেবল নামে কিংবা বিশেষ কারো পরিচয়ে অধিষ্ঠিত হতে পারেন না, এ জন্য সাধনাসিদ্ধ খাঁটি মানুষ প্রয়োজন। মৃত্যুর পরও মানুষ যে তাঁর কাছ থেকে সমানভাবে ফায়েজ পাচ্ছেন তাঁর মাজার শরীফে গেলে তা উপলব্ধি করা যায়। অপূর্ব স্থাপত্য সৌন্দর্য এবং নৈসর্গিক শোভামণ্ডিত তাঁর এই মাজার শরীফে একটি শান্ত সৌম্য এবং পবিত্রতার ভাব সর্বদা বিরাজ করে। প্রতি বছর হাজার হাজার ভক্তপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান ওরস শরীফ উপলক্ষে তাঁর রওজা শরীফে উপস্থিত হন।

খানবাহাদুর আহছানউল্লা একটি ধর্মভাবাপন্ন ও ধর্মীয় কৃষ্টি সভ্যতার অনুরাগী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য শিশুকাল থেকেই তিনি ধর্মের অনুসারী ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁর পিতামহ মুনশী মোহাম্মদ দানেশ বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। বাল্যকাল থেকে তিনি জনৈক দরবেশের 'নেক দৃষ্টি' লাভ করেন। এই দরবেশ হযরত কাশেম শাহ্ নামে পরিচিত। বাল্যকালে এক সময় যখন তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হন তখন এই দরবেশ চকিতে উপস্থিত হলে মুমূর্ষু বালককে কাঁধে তুলে রাস্তায় চলে আসেন এবং তাঁর পশ্চাতে দৌড়াবার নির্দেশ দেন। বালক মুনশী মোহাম্মদ দানেশ এ নির্দেশ পালন করেন এবং রোগ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি লাভ করেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লার জীবনচরিত থেকে জানা যায়, পরিবারের মধ্যে কোন আপদ-বিপদ দেখা দিলে উপর্যুক্ত দরবেশ উপস্থিত হতেন এবং সবাইকে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। তিনি চকিতে উপস্থিত হতেন এবং চকিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে যেতেন। তাঁর অনেক কেরামতির কথা হযরত খানবাহাদুর আহছানউল্লা তাঁর পিতামহের কাছ থেকে জেনেছেন। এই পরিবারের উপর দরবেশের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, পিতামহের মৃত্যুকালে আরেকজন কামেল ব্যক্তি উপস্থিত হবেন। দরবেশের এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। পিতামহের মৃত্যুর পর অপ্রত্যাশিতভাবে ইরান থেকে মাওলানা সূফী মোহাম্মদ আলী শাহ্ একটি 'গ্রীন বোট' যোগে তাঁদের বাড়ীর নিকটস্থ ঘাটে এসে উপস্থিত হন। তিনি

যশোরের নওয়াপাড়ার 'ইরানী পীর' নামে পরিচিত ছিলেন। খানবাহাদুর আহছানউল্লার পিতা মুনশী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন এই পীর সাহেবের কাছে বায়আত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেন। মুন্‌শী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন ধনাঢ্য পিতার সন্তান ছিলেন। পিতৃলব্ধ বিশাল ধন-সম্পত্তি তিনি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কাজে তেমন ব্যয় করেননি। অধিকাংশ ধন-সম্পত্তি তিনি জনসেবার কাজে ব্যয় করেন। এর ফলে মৃত্যুকালে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য কোন ধন-সম্পত্তিই রেখে যেতে পারেননি। খানবাহাদুর আহছানউল্লা পরিণত বয়সে যে একজন কামেল পীর হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন সে খবর তাঁর পিতা বহুপূর্বে একাধিকবার স্বপ্নযোগে অবগত হন এবং 'অল্পবয়স্ক বালক' আহছানউল্লাকে মোবারকবাদ জানান। এ পৃথিবীতে যাঁরা মহামানব রূপে পরিচিত হয়েছেন, পীর দরবেশের সম্মানীয় স্থান অধিকার করেছেন তাঁদের অনেক খবরই শিশুকালে এভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

চাকরীসূত্রে চট্টগ্রামে অবস্থানকালে খানবাহাদুর আহছানউল্লার মনের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ সময়ে তাঁর চঞ্চলতা, ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও নির্জনপ্রিয়তা দেখে অভিভাবকগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁরা ভাবতেন, খানবাহাদুর আহছানউল্লা হয়তো পরিবার-পরিজন ছেড়ে দূরে কোথাও চলে যাবেন। তাঁরা তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেন এবং কাছে দূরে কোন পীর দরবেশের কথা শুনলেই সেখানে তাঁকে নিয়ে যেতেন। কিন্তু তাঁর মনের ব্যাকুলতা কিছুতেই যায় না। দরবেশ কাসেম শাহ্‌র অনুগৃহিত পিতামহ মুনশী মোহাম্মদ দানেশ এবং নোয়াপাড়ার ইরানী পীরের মুরীদ পিতা মুনশী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন তাঁদের অজান্তেই বালক আহ্‌ছানউল্লার হৃদয়ে অধ্যাত্ম চিন্তার বীজ বপন করেছিলেন।[১৮] জগৎপুর আশ্রমেও তিনি দু'একটি রাত অতিবাহিত করেন। কিন্তু মনের অবসাদ তাতে ঘোচে না। এভাবে সময় অতিবাহিত হয়। তবে সরকারী কাজে তিনি কোন অবহেলা প্রদর্শন করেননি। একদিন রাতে স্বপ্নযোগে তিনি এক দরবেশের সন্ধান পান। এর ফলে তার মনের অস্থিরতা আরো বেড়ে যায়। চাক্ষুষ দর্শনের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ স্বপ্নে দেখা এই দরবেশ বিভিন্ন দেশ সফরের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামে আসেন এবং খানবাহাদুর আহছানউল্লাকে তাঁর সাথে সাক্ষাত করার পত্রযোগে খবর পাঠান। এ সময় খানবাহাদুর আহছানউল্লা সরকারী কাজে মফঃস্বলে ছিলেন। মফঃস্বল থেকে ফিরে তিনি জানতে পারেন যে, উপর্যুক্ত সাধুপুরুষ চট্টগ্রাম ছেড়ে কুমিল্লা গেছেন এবং তিনি ইচ্ছা করলে কুমিল্লায় তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে পারেন। এ খবর পেয়ে তিনি কুমিল্লা চলে আসেন এবং সেখানেই এই দরবেশের দেখা পান। এই দরবেশের

---

১৮. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

নাম হযরত সৈয়দ হাবিব আহমদ। 'আধ্যাত্মিক নবজীবন' লাভ করার পর তিনি 'গফুর শাহ' নামে পরিচিত হন। হযরত গফুর শাহ ছিলেন 'পাটনার খ্যাতনামা ব্যরিস্টার ও জনপ্রিয় স্যার সৈয়দ আলী এমামের জনৈক অতি নিকটাত্মীয়। তিনি মাত্র ১৪ বছর বয়সে ফকিরী জীবন বেছে নেন এবং নিজের পরিধেয় ও পুস্তকাদিতে অগ্নি সংযোগ করে গৃহ ত্যাগ করেন। নগ্নপদে তিনি শত শত মাইল পথ অতিক্রম করতেন, দিনে রোযা রাখতেন এবং সন্ধ্যাকালে দু'একটি গোল আলু খেয়ে তৃপ্ত থাকতেন। তাঁর সম্পর্কে খানবাহাদুর আহছানউল্লা বলেছেন :

> কখনো বোম্বাই, কখনো আজমীর, কখনো দিল্লী, কখনো পানিপথ, কখনো বুড়কী ছফর করিতেন। সম্বল ছিল মাত্র একটি এহরাম বস্ত্র ও একজোড়া খড়ম। কাহারো আতিথ্য গ্রহণ করিতে ভালবাসিতেন না। আজমীর শরীফের বিজন বনে একাধিক্রমে ১১টি মাস অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না, কিন্তু ক্রমেই তাঁহার ভক্তের সংখ্যা বর্ধিত হইতে থাকিল।
>
> তাঁহার অদম্য পরিভ্রমণেচ্ছা দূর চট্টগ্রামে পৌছাইয়া দিয়াছিল। ইহাতেও প্রেমময়ের প্রেম-ইচ্ছা নিশ্চয়ই নিহিত ছিল। খোদার দরগাহে এই না-লায়েকের কোটী কোটী হেজদা। তাঁহার দান, তাঁহার কৃপা অসীম, অপরিমেয়। তিনি এই অকিঞ্চনকে কিরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিলেন আবার কিরূপে বা কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিক জগতের আস্বাদ লাভের ছামান প্রস্তুত করিলেন, কিরূপে করুণাপরবশ হইয়া নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন, আবার কিরূপেই নব নিয়োজিত অছিলা দ্বারা পদপ্রান্তে আশ্রয় দিলেন, লেখনী তাহা লিখিতে অক্ষম। খোদায় ভেদ খোদাই জানেন। অজ্ঞ আমরা কি বুঝিব?[১৯]

খানবাহাদুর আহছানউল্লা সস্ত্রীক হযরত গফুর শাহের কাছে বায়আত গ্রহণ করেন। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে পূর্ববঙ্গ ও আসাম পার্টিশন রদ হওয়ার ফলে চট্টগ্রাম থেকে কয়েক বৎসরের জন্য তিনি প্রেসিডেন্সি বিভাগে বদলী হয়ে কলকাতায় আসেন এবং এ সময়ের মধ্যে তাঁর পীরের সঙ্গে পবিত্র হজ্জ উদযাপন করেন। হজ্জ সমাপনান্তে তিনি ২৬ বৎসর বয়সে উপনীত হন। এত অল্প বয়সে দূর, বিপদসঙ্কুল পথ অতিক্রম করে হজ্জ উদযাপন করার সদিচ্ছার মধ্যে তাঁর ধর্মবোধ এবং ধর্মানুরাগের পরিচয় মেলে। চট্টগ্রাম অবস্থানও তাঁর আধ্যাত্মিক পথকে সুগম করেছিলো। চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশে ভ্রমণ করেও তিনি ঐশী প্রেমে বিভোর হন।[২০] এখানকার নির্জন বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত তাঁকে একাগ্র চিন্তা ও আধ্যাত্মিক সাধনার পথ সুগম করে। এখানকার পীর-ফকিরের মাজার শরীফ

---

১৯. খান বাহাদুর আহছানউল্লা, *আমার জীবনধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৩৯।

২০. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত।

তাঁকে সতত আকর্ষণ করে, পীর-দরবেশের সাহচর্য তাঁকে বিমল এক আনন্দ দেয়। নিজের পীরের সঙ্গে তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন স্থান ঘুরে বেড়িয়েছেন। প্রকৃতির অমলিন শোভা তাঁকে সৃষ্টিকর্তার অকৃপণ দানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চট্টগ্রামে থাকাকালে তিনি বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও অলী-আউলিয়ার মাজার অথবা চিল্লায় নিয়মতি যাতায়াত করে অধ্যাত্ম চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন।[২১] বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর বিচরণক্ষেত্র দুর্গম জঙ্গলে তিনি বহু সময় খোদার ধ্যানে অতিবাহিত করেছেন। চট্টগ্রামের স্মৃতি বর্ণনায় তিনি বলেছেন :

> চট্টলে কত মহাপুরুষের স্মৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখানকার আধ্যাত্মিক পারিপার্শ্বিকতা কত পবিত্র। তাই বুঝি সর্ব্বশক্তিমান তাঁহাদেরই পদপ্রান্তে আমাকে লালিত-পালিত করিবার জন্য এই দূরদেশে অন্তরীণস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন। চট্টগ্রামের বন-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে, নদীতে-সমুদ্রে কত পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত, কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? এইরূপ একাধিক পুণ্যাত্মার সমাবেশ ভারত মধ্যে কুত্রাপি আছে কিনা জানি না। এখানকার জড় অণু-পরমাণু মুখর বলিয়া অনুমিত হয়। বালুকণার মধ্যেও আত্মার সাড়া পাওয়া যায়, পক্ষীর গুঞ্জন মধ্যে প্রেমময়ের আভাস পাওয়া যায়, বায়ুর হিল্লোল মধ্যে পূণ্য পরশ উপলব্ধি হয়। আমি অজ্ঞ, অন্ধ, বধির, প্রেমময়ের নিদর্শন কি বুঝিব? আমার সৌভাগ্য– মহাসৌভাগ্য যে, এই পূণ্য দেশের সেবকরূপে সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। সরকারকে ধন্যবাদ, আর শত সহস্র ধন্যবাদ সরকারের সরকারকে।[২২]

চট্টগ্রামে অবস্থানকালে এখানকার অনেক স্মৃতি যা তাঁর জীবনবোধ, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিচায়ক যেমন কুতুবদিয়ার স্মৃতি, হুনুয়ার স্মৃতি, জুলদিয়ার স্মৃতি, ধোপাছড়ির স্মৃতি, জালিয়া পালঙের স্মৃতি, বান্দরবনের স্মৃতি, হাতীখেদার স্মৃতি, দোহাজারীর স্মৃতি, টেকনাফের স্মৃতি, ছাগলনাইয়ার স্মৃতি, ধুমের স্মৃতি, বাড়বকুণ্ডের স্মৃতি প্রভৃতি তাঁর জীবনস্মৃতিতে অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ সকল স্মৃতিকথা থেকে তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অনেক কথাই জানা যায়। বাড়বকুণ্ডের স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন :

> বাড়বকুণ্ড চট্টগ্রাম হইতে ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে আমার জীবনসঙ্গী মৌলবী মোহাম্মদ ছাদাফাত উল্লা ছাহেবের বাস। ইনি মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করেন।

---

২১. প্রাগুক্ত।

২২. প্রাগুক্ত, ১৯৮২, পৃ. ৩০।

হুজুর কেবলা[২৩] সর্ব্বপ্রথমে যখন চট্টল অঞ্চলে তশরীফ আনেন তখন তাঁহারই আকর্ষণে ইনি দরিদ্র কুটীরে উপস্থিত হন। ক্রমে ইঁহার মধুর ব্যবহার, কার্য্যক্ষমতা, প্রেমিকতা উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই। তাঁহারই কল্যাণে আমার চট্টগ্রামের দীর্ঘ অবস্থিতি সুধাময় হইয়াছিল। তাঁহারই সাহায্যে কত বন-উপবন, পর্ব্বত-পাহাড়, খাল-বিল, নদী-সমুদ্র বিচরণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। সরকারী কার্য্যে বিন্দুমাত্র অবহেলা না করিয়া অদম্য প্রেরণা লইয়া প্রেমময়ের অনুসন্ধানে কত গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছি, তারকা খচিত নীল আকাশের গায়ে কতই না তাঁহার সন্ধানে ঘুরিয়াছি, হস্তী-ব্যাঘ্রসঙ্কুল গভীর বনে কতই না প্রেমোন্মাদনা লইয়া ফিরিয়াছি, তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রবক্ষে কাতর স্বরে কতই না বিপদে পড়িয়া বিশ্বপতির দরবারে মাথা কুটিয়াছি।...[২৪]

স্মৃতিচারণের আরেক জায়গায় তিনি বলেছেন :

চাকুরীর ক্ষেত্রে আমার চট্টলের বিপিন বনে, জনশূন্য পর্ব্বতশৃঙ্গে সুবিস্তৃত সমুদ্রবক্ষে ভ্রমণ করিবার দীর্ঘ সুযোগ হইয়াছিল। যেখানে নিশাকালের আঁধারে, বন্য জন্তুর আশ্রয়ে, সমুদ্রোত্থিত তুমুল ঝটিকার মধ্যে খোদা ব্যতীত অন্য কোন রক্ষক দৃষ্টিগোচর হয় নাই, যেখানে বন্য হস্তী, হিংস্র ব্যাঘ্র ও তরঙ্গায়িত ভীতিপ্রদ উত্তাল প্রবাহ ব্যতীত অন্যতর সঙ্গী ছিল না, সেখানের বিদ্যমানতা, তাঁহার মাহাত্ম্য, তাঁহার অনুকম্পা স্বতঃই হৃদকন্দরে দৃশ্যমান হইত।[২৫]

এভাবে চাকরি জীবনের পুরোটাই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাজ করে। এখানে তিনি যতদূর সম্ভব নিজেকে গোপন রাখতে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু সুগন্ধ আপনা থেকেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। যা কিছু সত্য ও সুন্দর তা দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখা যায় না। খানবাহাদুর আহছানউল্লার আধ্যাত্ম সাধনার কথাও তেমনি নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতায় বসবাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু এ পরিকল্পনা কার্যকরী হয়নি। মানবের রূহানী চিকিৎসার জন্য[২৬] তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন। এ পর্যায়ে তিনি একজন কামেল পীর হিসেবে দ্রুত পরিচিতি লাভ করেন। ভক্তপ্রাণ মানুষ পতঙ্গবৎ তাঁর কাছে ছুটে আসতে শুরু করে। কিন্তু তিনি নিজেকে কখনো পীর হিসেবে প্রচার কিংবা কোন অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে

---

২৩. খানবাহাদুর আহছানউল্লার পীর হযরত গফুর শাহ।

২৪. মোহাম্মদ আব্দুল কাইয়ুম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৮৩।

২৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩।

মানুষকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন না। তবে তাঁর প্রাত্যহিক জীবনযাপন, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী যে কোন মানুষকে সহজেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও অনুগত করে তুলতো। সত্য, শুভ, মহৎ ও পবিত্র জীবনাদর্শের দীক্ষালাভ বাল্যকালেই তাঁর জীবনে ঘটেছিল।[২৭] তিনি বাল্যকাল থেকে নামায পড়তেন এবং কখনো নামায কাযা করতেন না। তাঁর মতে, নামায মানুষকে 'অমূল্য এনায়েত দান করিতে পারে'।[২৮] তিনি শেষ জীবনে সর্বদা অযুসহকারে থাকতেন। জীবনে কখনো তিনি দাড়িতে ক্ষৌর সংযোগ করেননি; এ কারণে যে, যিনি তাঁর প্রভু, যিনি তাঁর জীবনের আদর্শ সেই মহামানব হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতি অসম্মান করা হবে।[২৯] তিনি জীবনে কখনো মাথার চুলে সিঁথি কাটেননি। এ সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ছিল, 'যাহার ভিতরে সৌন্দর্য নাই, সিঁথি তাহাকে কি সৌন্দর্য দিবে?[৩০] তিনি কখনো অলীক আমোদ-প্রমোদে যোগদান করেননি। এ জাতীয় কোন আকর্ষণ অনুভব করলে তিনি তা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সর্বদা আল্লাহর সাহায্য চেয়েছেন। মানসিক শক্তি অর্জনের জন্য, সঠিক পথে চলবার অনুপ্রেরণা পাওয়ার জন্য। তিনি সর্বদা নিজেকে ক্ষুদ্রতম মনে করতে গৌরববোধ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত ছিল, 'আমি রাসূলুল্লাহ (স.)-এর দৃষ্টান্ত মনে করিয়া মেহনতের কাজ করিতেও সঙ্কোচবোধ করি না। বরং সুন্নত পালন-হিসেবে মনে এক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করি।[৩১] রাসূল (স.)-এর ফরমান অনুসরণে কাপড়ে যতক্ষণ তালি সহে, ততক্ষণ তা ব্যবহার করতেন এবং এতে আনন্দ বোধ করতেন। আহারকালে সর্বাগ্রে তিনি তিক্ত বস্তু ও সর্বশেষে মিষ্টি খেতে পছন্দ করতেন এ কারণে যে, তাঁর মতে, 'এতে সুন্নত আদায় হয় এবং অন্তরে প্রসাদ জন্মে।' রাতে আহারান্তে তিনি 'চেহেল কদমী' অনুসরণ করতেন। আহারে বসবারকালে তিনি এক জানু বা উভয় জানু উঁচু রাখতেন, এ কারণে যে, তাঁর মতে, এর ফলে অতি ভোজনের কুফল হতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুন্নত আদায়ের লক্ষ্যে তিনি আহারকালে শরীর ও মস্তক আবৃত রাখতেন এবং প্রত্যেক লোকমা গ্রহণকালে খোদার নেয়ামত মনে করতেন এবং আহারান্তে শুকরিয়া আদায় করতেন। সম্ভবত মহামানব আহ্ছানউল্লা ছিলেন সেই মরদ-ই-মুমিন যিনি

---

২৭. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, প্রাগুক্ত।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৪।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

তাঁর জীবনে সেই প্রতিনিধিত্ব লাভের জন্য সাধনা করেছেন এবং সফলও হয়েছেন।[৩২] তিনি প্রতিদিন গভীর রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন এবং ফযরের নামাযের পূর্ব পর্যন্ত খোদার ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। ফযরের নামায শেষে তিনি প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করতেন। চা, পান, তামাক কখনোই তাঁর প্রিয় ছিল না। এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত, 'কোন বস্তুর প্রতি অভ্যস্ত হইলে সেই বস্তু পূজ্য হইয়া উঠে, সর্ব্বদা তাহারই কথা মনে জাগে। সুতরাং ইহাও এবাদতের অন্তরায়।'[৩৩] পার্থিব অন্যান্য বিষয় যেমন স্ত্রী-পুত্র, অর্থ, খাদ্য, স্বাস্থ্য ইত্যাদিকে তিনি ভালবাসতেন কিন্তু দান থেকে দাতাকেই তিনি অধিক ভালবাসতেন।[৩৪] ভক্ত দেখলেও তিনি তার পদধূলি চুমিতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। তিনি সুগন্ধি ও ফুল ভালবাসতেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে পছন্দ করতেন। তিনি চরিত্র গঠনকে ইবাদতের প্রধান অঙ্গ মনে করতেন এবং 'যার চরিত্র সুগঠিত নয় তার এবাদত বেকার' বলে মনে করতেন। তিনি সকল বস্তুর মধ্যে খোদার অবদান অনুসন্ধান করতেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> যখন ক্ষুদ্র ঘাস-ফুলের মধ্যে অচিন্ত্য শিল্পের পরিচয় পাই, যখন গোলাপের সুগন্ধ মনকে ভরপুর করে, যখন পাতাবাহার দৃষ্টিশক্তিকে হরণ করে, যখন পাখির কুজন কর্ণকুহরকে তৃপ্ত করে, যখন প্রাতঃকালীন বা সান্ধ্য হিল্লোল শরীরকে শীতল করে, তখন চকিতে দয়াময়ের অফুরন্ত দয়ার কথা মনে পড়ে। তাঁর সৃষ্টিকৌশল আত্মাকে মুগ্ধ করে, বুক ধড়ফড় করিতে থাকে, আর প্রেমময়ের সান্নিধ্য কলবকে তোলপাড় করে।[৩৫]

খানবাহাদুর আহছানউল্লার উপর্যুক্ত চারিত্রিক গুণাবলী যে কোন মানুষকে তাঁর প্রতি সহজেই প্রলুব্ধ করতো। শুধু মানুষ কেন, পশু-পক্ষী জীব-জন্তুও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবনত ও নিবেদিত ছিলো। বৃক্ষরাজির সঙ্গে তাঁর ছিল এক অব্যক্ত যোগাযোগ ও জানাজানি। একবার তিনি চট্টগ্রামের টেকনাফে কিছুদিন অবস্থান করেন। টেকনাফের আশেপাশে তখন ঘন জঙ্গল ছিল এবং সমস্ত জঙ্গলে হিংস্র জন্তুর অভাব ছিলো না। তিনি যে ক'দিন টেকনাফে ছিলেন প্রায় প্রতিদিনই সেই জঙ্গলে চলে যেতেন এবং একটি

---

৩২. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রবন্ধ : মহামানব আহছানউল্লা, *আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা*, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯১ সংখ্যা, পৃ. ৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৭।

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮।

প্রকাণ্ড গাছের নীচে বসে আল্লাহর ধ্যান করতেন। কোন জন্তু তাঁকে কোন দিন ক্ষতি করেনি। এরপর তিনি টেকনাফ ছেড়ে গেলে কিছু দিনের মধ্যে সেই গাছটি শুকিয়ে মারা যায়। এই বৃক্ষ তার বিরহ বেদনা সহ্য করতে পারেনি। খানবাহাদুর আহছানউল্লা যখন স্কুল ইন্সপেক্টর ছিলেন তখন একবার তিনি ছাগলনাইয়া হাইস্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে সেখানকার ডাকবাংলোয় কয়েকদিন অবস্থান করেন। এই ডাকবাংলোয় তিনি মাঝে মাঝে গজল শুনতেন এবং আল্লাহর প্রেমে অস্থির হয়ে পড়তেন। কখনো শীতে সমস্ত শরীর কাঁপতো, কখনো গরমে ঘাম ঝরতো। এ অবস্থায় ডাক্তার কবিরাজ অস্থির হয়ে তাঁর চিকিৎসার জন্য ছুটে আসতো। কিন্তু এ রোগ তো ডাক্তার ভাল করতে পারেন না। কিছুক্ষণ পর তিনি নিজেই সুস্থ হয়ে উঠতেন। এ ঘটনা যখন ঘটে তখন ডাকবাংলোর কাছে একটি গাছের নীচের ডালে বসে দুটি পাখী এ দৃশ্য উপভোগ করে। স্কুল পরিদর্শনান্তে তিনি কয়েকদিন পর সে স্থান ত্যাগ করেন। পরে খবর পেয়েছিলেন, দীর্ঘদিন যাবত সেই পাখি দু'টি সেই স্থান ত্যাগ করেনি। নির্দিষ্ট সময়ে তারা ঐ একই ডালে বসে একদৃষ্টে বাংলোর দিকে তাকিয়ে থাকতো। খানবাহাদুর আহছানউল্লা একবার হাওয়া পরিবর্তন ও স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য চট্টগ্রামের কুতুবদিয়া দ্বীপে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। ঐ সময় একটি কুকুর সর্বদা তাঁর ঘরের কাছে আসতো এবং যখন তিনি সকাল-সন্ধ্যায় বেড়াতে বের হতেন তখন কুকুরটিও তাঁর সঙ্গে যেত। এর পর যে দিন তিনি কুতুবদিয়া ত্যাগ করে জাহাজে চট্টগ্রাম রওয়ানা করলেন সেদিন কুকুরটি ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চারদিকে ছুটোছুটি করতে থাকে এবং মাঝে মাঝে সমুদ্রে নেমে সাঁতার দিয়ে জাহাজের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে। কুকুরের এই কার্যকলাপ এবং ক্রন্দন ও চিৎকার শুনে অনেকে তাকে সঙ্গে নেয়ার জন্য খানবাহাদুর আহছানউল্লাকে অনুরোধ করেন। তিনিও তাকে নিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু কুকুরের মালিক কুকুরটিকে ছাড়তে রাজী হননি। কারণ তিনি মনে করতেন, কুকুর গেলে ঘরের লক্ষী চলে যায়। কুকুরটি তাই মালিকের কাছেই থেকে যায়। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে কুকুরটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এ ছাড়া বহু মানুষ তাঁর আশীর্বাদধন্য হয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বিপদ আপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে এবং মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছে।[৩৬]

খানবাহাদুর আহছানউল্লা তাঁর ভক্ত অনুসারী ও গুণগ্রাহীকে দিয়েছিলেন বন্ধুর স্থান। তাঁর স্বভাবসুলভ বিনয় ও আধ্যাত্মিক ঔজ্জ্বল্য স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অগণিত মানুষকে দিয়েছে পথের দিশা, সুন্দর জীবনের সন্ধান। পীর-মুরীদ এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে খানবাহাদুর আহছানউল্লার এ

---

৩৬. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮।

অভিমতটি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং উদার ও নিরহংকার মনোভাবের পরিচয় বহন করে। এখানে তিনি পীরের সত্যিকার পরিচয়কে শুধু বিধৃত করেননি, মানুষের জীবনে পীর বা ধর্মগুরুর প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনী গ্রন্থে বলেছেন :

> পীরের কর্তব্য মুরীদের অন্তরে ঐশীশক্তি উন্মেষ করা। কোন পীর ঐশী শক্তি পয়দা করিতে পারেন না। তিনি কেবল খোদাপ্রদত্ত শক্তিকে উন্মেষ করেন। সকল লোহাতে অগ্নি নিহিত আছে, উহা সাধারণের দৃষ্টি বহির্ভূত। উক্ত লোহাতে ঘর্ষণ করিলে অগ্নির উদ্গম হয়, সেইরূপ খোদা সকল বান্দার হৃদয়ে তাঁর শক্তি গুপ্ত রাখিয়াছেন। উক্ত শক্তিকে মহব্বত ও এবাদত দ্বারা উন্মেষ করিতে হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন সৎ শিক্ষকের।[৩৭]

তাঁর কর্মজীবন সক্রিয় ছিল, ফলপ্রসূ ছিল নেপথ্যের গভীরে। 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থের ভূমিকায় আহ্ছানউল্লা বলেছেন, 'আমি নিজেকে নাচীজ বলে মনে করি এবং সেই জন্য আত্মচরিত লিখিবার খায়েশ আমার কখনো জন্মে নাই। নগ্ন এসেছি, নগ্ন চলিয়া যাইব, কেহ জানিবে শুনিবে না।' এই সরলোক্তি নিরর্থক বিনয় ভাষণ মাত্র নয়, তাঁর জীবন-দর্শন অনুধাবনে এ উক্তি তাৎপর্যবাহী।[৩৮] বস্তুতঃ আহ্ছানউল্লার সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যাবে, সহজ সারল্যেমণ্ডিত তাঁর জীবন চর্চা এবং তাঁর আপন বিশ্বাসের দর্শন এই মূলেই নিহিত। সে কথাটাও আন্তরিক সরলতায় এই ভাবে ব্যক্ত– 'নিঃস্বার্থে জনসেবা করাই আমার জীবনের ব্রত।' আহ্ছানউল্লা আধ্যাত্মবাদী ছিলেন। তাঁর জীবনাদর্শ অগণিত ভক্তের সৃষ্টি করেছে।[৩৯] ঐ সহজ বিশ্বাস, ঐ জনসেবায় ব্রত, আপনাকে প্রকৃত জনের সখা বিবেচনা–এ সমুদয় গুণাবলীই তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। পুনরায় তাঁর উক্তি উদ্ধৃত করি– 'মহব্বতই শিক্ষার মূলমন্ত্র। আমি জাহেরা পীর-মুরীদের রছম এখতেয়ার করি, যাহাকেই আপন মনে করি তাহারই হইয়া যাই। কাহাকেও হেয় চোখে দেখি না, কিংবা কাহারও খেদমত লইতে ইচ্ছুক নহি, সকলকেই সমচক্ষে দেখি। মানুষে মানুষে পার্থক্য করি না। আমি কাহারও প্রতি শিষ্য, মুরীদ বা ভৃত্যের মত ব্যবহার করি না, সকলকেই পুত্রবৎ স্নেহ করি।'[৪০] মধ্যযুগের বাংলাদেশে মানব-প্রেমের এমনি বাণী প্রচার করেছিলেন শ্রীচৈতন্য। চন্ডালকে তিনি

---

৩৭. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. প্রাগুক্ত।

কোলে টেনেছিলেন, জগাই মাধাইকে প্রেম বিলিয়েছিলেন। আহছানউল্লার একটি বিশেষ রচনা 'ইসলামের বাণী ও পরমহংসের উক্তি'। পরমহংসেরও ব্রত নিঃস্বার্থ জনসেবা, মানুষকে ভালোবাসা এবং সেই ভালোবাসার কথা সহজ করে বলায় এ তিন জনের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করার মত।[৪১] যাঁর যাঁর আপন ধর্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য অবশ্যই রয়েছে– তথাপি এই যে ঐক্য তা কি প্রবহমান বাংলার দেশজ আবহের গুণে?

তিনি ছিলেন কর্মযোগী। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্বশীল কাজে লিপ্ত থেকেই কর্মের মধ্যে মানব সেবার পথ খুঁজে পান। খানবাহাদুর দিবাভাগে সরকারী কাজের মধ্যে একনিষ্ঠভাবে ডুবে থাকতেন এবং রাতের নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশে আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে সমর্পণ করতেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> চট্টগ্রামের প্রাথমিক অবস্থিতিকালে মাতা-পিতা আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা আমার ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও নির্জনপ্রিয়তা দেখিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন ও যেখানে কোন দরবেশ বা মজ্জুবের কথা শুনিতেন, পিতা সেখানেই আমাকে লইয়া হাজির হইতেন। তাঁহাদের ভয় হইয়াছিল যে, আমি সংসার বন্ধন ছিন্ন করিয়া হয়তো পাছে কোন অজ্ঞাত স্থানে প্রস্থান করি। তাঁহারা আমাকে দমাইবার জন্য নানা পন্থা অবলম্বন করিলেন।... মাইজভাণ্ডারের পীর সাহেবের কথা শুনিয়া পিতা আমাকে সেখানে লইয়া গেলেন।[৪২]

কিন্তু খানবাহাদুর তাঁর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর কর্মযোগ আধ্যাত্মিক মোক্ষলাভের শ্রেষ্ঠ উপায়স্বরূপ, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্ব কথাকেই তিনি বহু ক্ষেত্রে উদঘাটন করেছেন। তাঁর আত্মজীবনী 'আমার জীবন ধারা' গ্রন্থে তিনি বলেন :

> খোদার দরগাহে এই নালায়েকের কোটি কোটি ছিজদা। তাঁহার কৃপা অসীম, অপরিমেয়, তিনি এই অকিঞ্চনকে কিরূপে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার দিলেন আবার কিরূপেই কর্মক্ষেত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিক জগতের আস্বাদ লাভের ছামান প্রস্তুত করিলেন, কিরূপে করুণা পরবশ হইবার নিমিত্ত নিয়োজিত করিলেন, আবার কিরূপেই নব নিয়োজিত অছিলা দ্বারা পদপ্রান্তে আশ্রয় দিলেন, লেখনী তাহা লিখিতে অক্ষম।[৪৩]

---

৪১. প্রাগুক্ত।

৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৫৫।

বস্তুত তাঁর মত ছিল এই যে, কর্মজীবনের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করার অর্থই পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী করা। এবং সেই আদেশ ও ইচ্ছা পূর্তি সাধন প্রকৃতপক্ষে মানব কল্যাণের মূলমন্ত্র। এভাবেই খানবাহাদুর আহছানউল্লা জীবন কাটিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন একটি সাফল্যমণ্ডিত সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন-আদর্শ জীবন, জীবনের আদি-অন্তে রয়েছে ঐশী শক্তি।

অবসর গ্রহণের পর খানবাহাদুর আহছানউল্লা টেকনাফে গিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। সেখানে বনবিভাগের ডাক বাংলোতে ছিলেন। ডাক বাংলোর কাছেই একটি পত্রপুষ্পহীন শুষ্ক গাছ দাঁড়িয়েছিল।

আহছানউল্লার গাছটির প্রতি মমতা হল। তিনি গাছের তলায় গিয়ে বসতে লাগলেন। সকালে, দুপুরে এমনকি বিকেলেও কখনো কখনো বসতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ্য করলেন, গাছটি আবার সজীব হয়ে উঠেছে। গাছের ডালগুলো ক্রমান্বয়ে সবুজ পাতায় ভরে গেল। আহছানউল্লা মনে হল গাছটি তার তৃপ্তির স্বাক্ষর রাখল এই সজীবতায়।

আজ থেকে ষাট বছর আগে তিনি যখন হজ্বে গিয়েছিলেন তখন হজ্বযাত্রা অত্যন্ত দুর্গম ছিল। এক বর্ণনায় তিনি লিখেছেন :

> তাঁবুর সামনে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা খাদ্য সামগ্রী সাজিয়ে খেতে বসেছেন, এমন সময় জনাবিশেক আরব তাদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থান নিল। তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা যেসব উচ্ছিষ্ট রেখে উঠে পড়লেন আরবগুলো সেগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো এবং বহুদিনের বুভুক্ষুর মত সেই সব উচ্ছিষ্ট খেতে লাগল। এখন অবশ্য আরবদের সে দুরবস্থা আর নেই। তেল আবিষ্কারের পর তারা আর মিসকিন নেই।[৪৪]

১৯৪৮-৪৯ সালে ঢাকায় এলে খানবাহাদুর আহছানউল্লা মোহাম্মদ কাসেমের আর্মেনিয়ান স্ট্রীট-আরমানীটোলায় উঠতেন। বহু লোক আসতো উপদেশের জন্য, মানসিক শান্তির জন্য। তাঁর উপদেশের ভাষাও ছিল অত্যন্ত মধুর। একজন হিন্দুকে একবার বলেছিলেন :

> আপনি আপনার আরাধ্য দেবতাকে মন দিয়ে ডাকুন, নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে যথার্থ নির্দেশ পাবেন।[৪৫]

---

৪৪. গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, *খান বাহাদুর আহছান উল্লাহ স্মারক গ্রন্থ*, জুলাই ২০০২, পৃ. ৭৮।

৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

কোনও মুসলমান যদি জিজ্ঞেস করত, 'হুযুর, আমরা তো দেবদেবী মানি না। আপনি তাহলে দেবদেবীর পূজার কথা কিভাবে বলেন?' তিনি উত্তর করতেন, 'যে যা বোঝে তাকে তার সীমার মধ্যে রেখেই বোঝাতে হয়। একজন হিন্দুকে আল্লাহর কথা বললে সে বুঝবে কি করে। সে যেসব দেবতাকে পূজা করে সেগুলোকে আল্লাহ ভেবেই পূজা করে। সুতরাং তার ভক্তির পাত্রের কথা বলেই তাকে প্রবোধ দিতে হয়।'[৪৬]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধ্যাত্মিক শিক্ষাগুরু হিসেবেই অনেকের নিকট সমধিক পরিচিত। জীবনের শেষপ্রান্তে কলকাতার নাগরিক জীবন ত্যাগ করে ৬০ বছর পর স্বগ্রাম নিভৃত পল্লী জন্মভূমি নলতায় প্রত্যাবর্তন করেন। বাকী জীবন যিক্‌র ফিক্‌র বা আধ্যাত্মিক অনুশীলনেই নিমগ্ন ছিলেন। মা'রেফাতের পথ প্রদর্শন করে অসংখ্য ভক্তের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি বিধান করেন। তাই বলে তিনি কেবল অবসর জীবনে এই আধ্যাত্মিক পথ পরিক্রম করেন বললে খুবই ভুল হবে। ধর্মীয় চেতনা তিনি পারিবারিক সূত্রে প্রাপ্ত হন এবং তাঁর ধর্মীয় ভাব শৈশব মক্তব মাদরাসায় সনাতনী শিক্ষার পরিবর্তে শহর কলকাতায় আধুনিক পাশ্চাত্য বিদ্যা অর্জন করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, সেদিনের তারুণ্যের তাড়নায় উচ্ছৃংখল শহরে জীবনে ভেসে যাওয়া দূরের কথা এক ওয়াক্ত নামাযও তিনি কাযা করেননি। ক্ষুর কোনদিন তাঁর দাড়ি স্পর্শ করেনি।[৪৭] বরং আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির শুভ উপাদান আকণ্ঠ পান করেন। তাঁর দর্শন শাস্ত্র পাঠ সার্থক হয়েছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সব মঙ্গলজনক উপাদান দিয়ে তাঁর মানস পরিমণ্ডল গড়ে উঠে বলে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা, উগ্রতা, কুপমণ্ডকতা, গোঁড়ামী বা ভড়ং– এরূপ কিছু তাঁকে কখনো স্পর্শ করতে পারেনি। তাঁর ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা সমসাময়িক আর দশজন থেকে অনেকখানি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বা ভিন্নধর্মী হয়ে উঠে।

বাস্তব জীবনের ঘাত প্রতিঘাতে আশৈশব লালিত জীবন জিজ্ঞাসা প্রতিনিয়ত তাঁকে ক্ষত-বিক্ষত করে। চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম তাঁর ব্যাকুলতা, অস্থিরতা ও নির্জনপ্রিয়তা লক্ষণীয় হয়ে উঠলে তাঁর পিতা-মাতা খুবই বিচলিত হয়ে পড়েন। হঠাৎ একদিন তিনি জগতপুর আশ্রমে চলে যান এবং দু'রাত সেখানে সাধুসঙ্গ লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁর মন তাতে শান্ত হয়নি। বিভিন্ন পীর-ফকিরের শরণাপন্ন হলেও কোন লাভ হয়নি। এরূপ মানসিক দীক্ষাগুরু হিসেবে গফুর শাহকে পেয়ে তিনি এ সংকট কাটিয়ে উঠেছিলেন। তাই নব বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে একাধারে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে নিষ্ঠার

---

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. গোলাম মঈন উদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬।

সাথে তাঁর সরকারী দায়িত্ব পালন করেন এবং আধ্যাত্মিক সাধনায় নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। তাঁর এই সাধনায় তাঁর মনে অফুরন্ত অনাবিল প্রেম বা এশকে এলাহী সৃষ্টি হয়। এ সুন্দর ভুবনে প্রকৃতির শোভা ও সৌন্দর্য নানারূপে নতুন ব্যঞ্জনা নিয়ে তাঁর কাছে ধরা দেয়। কুতুবদিয়া সমুদ্রসৈকত হতে ফুলের বাহার ও প্রকৃতির নানা সৌন্দর্যপূর্ণ দার্জিলিঙে যাত্রা, আশেক-মাশুকের মিলন মাধুর্য উপলব্ধি করেন। এ মূল্যবান স্মৃতি তাঁর 'আমার জীবন ধারা'য় তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্তরে প্রেমতরঙ্গ এক অনাথ সুরধ্বনি তুলেছিল, তাই তিনি সুরলোকেও বিচরণ করেন। গজল, গীত ও সামার আসরে কতবার যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন, তাঁর ইয়ত্তা নেই। একদিনের অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করেন– রমযান মাসের এক সন্ধ্যায় ইফতারের পর এক অব্যক্ত অদম্য তাড়না তাঁকে পেয়ে বসে। সেজন্য তিনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটে যান তাঁর এক ভাই সৈয়দ মিনহাজ উদ্দীনের বাড়ীতে। তখন গভীর রাত। ইফতারের পর খাদ্য স্পর্শ করেননি। তাঁর মুরীদ ভাইকে দেখে হাসতে শুরু করেন, সে হাসির যেন শেষ নেই। তাঁর এরূপ আচরণের রহস্য না বুঝেই সবাই তাঁকে নানাভাবে আপ্যায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু এসব দৈহিক খোরাক তিনি কি করবেন? তিনি বলেন– 'যে রূহের প্রসার, সেখানে শরীর বশীভূত ও ভোগশূন্য'। যাহোক, পরদিন সকালে মলয়া গীতি শুরু হলে তাতে তিনি নিমগ্ন হন এবং তৃপ্তি উপভোগ করেন। তিনি আরো বলেন যে– 'শরীর কম্পিত, আত্মা নব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত, চলৎশক্তি রহিত। কেবলই আত্মার স্ফুরণ পরে ঘোর অবসাদ আসিয়া সর্ব শরীরকে অবসন্ন করিয়া তুলিল। এক প্রেমভঙ্গি আসিয়া আমাকে ভাসাইয়া লইয়াছিল।' ধর্ম অনুশীলনে খান বাহাদুর ছিলেন অনন্য। তাঁর অসংখ্য ভক্ত মিলাদ-মাহফিল, গজল-সামা বা ভক্তিমূলক সঙ্গীতের আসরে, হালকায়ে যিক্‌র-এ তাঁকে বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য ভাব সমাধিপ্রাপ্ত বা হাল ও মজ্জুব অবস্থায় দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। এ ভাষার ব্যাকরণ না জানলে কেবল তাঁর 'আমার জীবন ধারা' দ্বারা এর মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

তাঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জীবনে ভারতীয় সূফীবাদ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব প্রেমবাদের সবিশেষ অথচ সুষম বিকাশ ঘটেছিলো। তিনি বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করেননি। প্রেমধর্ম ও সেবাধর্মে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। সেবাধর্ম হতে তাঁকে বিচ্যুত দেখা যায় নি।

খিলাফতের যে গুরু দায়িত্ব নিয়ে মানুষ পৃথিবীতে এসেছে তা যথাযথভাবে পালনের নিরলস সাধনাই সূফীদর্শন। অন্যান্য দর্শনে তাত্ত্বিকতাই প্রাধান্য পেয়ে থাকে, অপরপক্ষে সূফী দর্শনে তাত্ত্বিকতাকে

কর্মে পর্যবসিত করে মানুষকে উপলব্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে দেয়। তাই শুধুমাত্র একাডেমিক আলোচনার মাধ্যমে এর মর্মার্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। ইসলামী চিন্তাজগতের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক ও সূফী সাধক ইমাম আল-গাযালী ধর্মতত্ত্ববিদ ও সূফীদেরকে যথাক্রমে আসহাবে আক্ওয়াল (বচনপটু ব্যক্তিবর্গ) এবং আরবাবে আহ্ওয়াল (উপলব্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ) হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাই দেখা যাচ্ছে সূফী দর্শন হলো উপলব্ধির দর্শন। প্রাথমিক যুগের প্রখ্যাত সূফী হযরত মারূফ আল্-কারখী (র.) সূফীদর্শন বা তাসাউফকে 'ঐশী সত্ত্বার উপলব্ধি' বলে অভিহিত করেছেন। আর উপলব্ধির স্তরে পৌছতে হলে জ্ঞানের অহমিকা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করতে হয়। সে জন্যই আরেক প্রখ্যাত সূফী হযরত জোনায়েদ বাগদাদী (র.) তাসাউফকে 'নিজের অজ্ঞতার উপলব্ধি' বলে অভিহিত করেছেন। জ্ঞানের অহংকার ও অন্যান্য অহংকার বিলীন করতে সক্ষম না হলে মানুষ তার আত্ম পরিচয় লাভে সক্ষম হবে না। তাইতো ইমামুল আওলিয়া, জ্ঞান নগরীর ফটক, আমিরুল মুমিনীন সাইয়্যেদেনা আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু বলেন– 'আল-ইলমু হিজাবুল-আক্বার' অর্থাৎ জ্ঞানই হলো সবচেয়ে বড় পর্দা (প্রতিবন্ধক)। এই উক্তিতে জ্ঞান বলতে অহংকারযুক্ত জ্ঞানকেই বুঝানো হয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা-এর বক্তব্য অনেকটা একই রকম। তিনি বলেন :

> যাহার আমিত্ব-জ্ঞান যত প্রবল, তিনি অপরকে তত তুচ্ছ মনে করেন। যিনি আমিত্বকে বিদায় দিয়াছেন, তাঁহার নিকট সবাই তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর। তাই বলি, আমিত্বকে বিদায় না দিলে খোদার মহত্ত্ব বোঝা যায় না।[৪৮]

এদেশে প্রখ্যাত মরমী কবি হাছন রাজাও একই কথা বলেন, 'হাছন রাজায় কয়, আমি কিছু নয় রে, আমি কিছু নয়'। আমিত্বের পর্দাকে সরিয়েই কেবল মহান স্রষ্টার অনুপম সৌন্দর্য অবলোকন করে খাঁটি অর্জন সম্ভব হয়। আর তাঁর মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলাই হলো সূফী দর্শনের মূলকথা।

সকল সূফীয়ায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, সূফী সাধনার সূচনা কোন কামিল শায়খের নিকট বায়আতের মাধ্যমেই কেবল সম্ভব হয়। এছাড়া এ পথে অগ্রসর হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মরমী কবি মাওলানা জালালউদ্দীন রূমীর নিম্নোক্ত উক্তিতে তা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে :

---

৪৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪।

মৌলাভী হারগেয না শুদ মাওলায়ে-রুম

তাগুলামে শাম্সে তাবরিযী-না শুদ

অর্থাৎ 'মাওলানা রূমী কখনো মৌলভী (দিব্যজ্ঞানী) হতে পারত না যদি না সে শামসে তাবরিযীর গোলামী না করত'।

মাওলানা রূমী তাঁর পীর হযরত শামসে তাবরিযীর কাছে বায়আত হওয়ার আগে একজন শীর্ষস্থানীয় আলেম ছিলেন। কিন্তু যাহেরী এই জ্ঞানকে তিনি যথার্থ জ্ঞান হিসেবে মনে করেননি। হযরত ইমাম আল্-গাযালী (র.)-এর জীবনীতেও দেখা যাচ্ছে তিনি হযরত আবূ আলী ফারমাদী (র.)-এর কাছে বায়আত হয়েছিলেন এবং সূফী পথে একনিষ্ঠ সাধনার জন্য সারা মুসলিম বিশ্বের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় একাডেমিক পদটি (বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শীর্ষ অধ্যাপকের পদ) ছেড়ে দিয়ে ফকিরীর পথে পা বাড়ান। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ আল-মুনকিয মিন্ আদ্-দালালে আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশের পূববর্তী ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপনার জীবনটিকে ভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ জীবন বলে অভিহিত করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য পীরের তরীকতের কাছে বায়আত হওয়াকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন। তিনি চিশতিয়া ওয়ারেসিয়া তরীকার বুযুর্গ সৈয়দ হাবিব আহমাদ ওরফে হযরত গফুর শাহ (র.)-এর কাছে মুরীদ হন এবং একনিষ্ঠভাবে পীরের খেদমতে নিজেকে সমর্পণ করেন। সমস্ত আওলিয়ায়ে কিরাম নিজ পীরের হুকুম শিরোধার্য গণ্য করেন। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হতে এছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। পারস্যের মরমী কবি হাফিয কতো চমৎকারভাবেই না তা তুলে ধরেছেন :

বা মায় সাজ্জাদা রাঙ্গীন কোন

গারাৎ পীরে মোগা গোইয়াদ

কে সালেক বে'খবর না বুয়াদ

যে রাহ ও রাসমে মানযিল্ হা।

অর্থাৎ 'তোমার পীর যদি বলেন, তোমার জায়নামায শরাবে ভিজিয়ে নিতেও কুণ্ঠিত হয়ো না, কেননা পথের সন্ধান ও মনযিলের রেওয়ায সম্বন্ধে তিনি অনবহিত নন'।

পবিত্র কুর'আনে উল্লেখ আছে[৪৯] : ইলমে লাদুন্নী হাসিলের জন্য হযরত খিযির (আ.) হযরত মূসা (আ.)কে বিনা প্রতিবাদে তাঁকে অনুসরণ করার আহ্বান জানালেন। যখন কোন মুরীদ পীরের প্রতি আনুগত্যের সমগ্র স্তর অতিক্রম করে তখন দ্বৈততার অনুভূতি দূরীভূত হয়, আল্লাহর অনুপম সৌন্দর্য সে অবলোকন করতে সক্ষম হয়। পীরের মধ্যে ফানা (বিলীন) হওয়া এমনি একজন মুরীদ ছিলেন হযরত মুজাফ্ফর বাল্খী (র.)। যিনি উপমহাদেশের প্রখ্যাত সূফী। ফিরদওসিয়া সিলসিলার ইমাম সুলতানুল মুহাক্কেকীন হযরত শরফুদ্দীন ইয়াহ্ইয়া মানেরী (র.)-এর প্রধান খলীফা ও পরবর্তীতে তাঁর খানকার সাজ্জাদানশীন হয়েছিলেন। হযরত মানেরী তাঁর এই প্রিয় মুরীদ হযরত মুজাফ্ফর বালখী (যিনি ১৭ বার সমস্ত সম্পদ নিজ মুর্শিদের দরবারে নযরানা হিসেবে পেশ করে দিয়েছিলেন) সম্পর্কে বলেন :

তান শারফুদ্দীন জান মুজাফ্ফর
জান শারফুদ্দীন তান মুজাফ্ফর
শারফুদ্দীন মুজাফ্ফর
মুজাফ্ফর শারফুদ্দীন

অর্থাৎ 'দেহ শরফুদ্দীন হলে প্রাণ মুজাফ্ফর, প্রাণ শরফুদ্দীন হলে দেহ মুজাফ্ফর, শরফুদ্দীনই মুজাফ্ফর, মুজাফ্ফরই শরফুদ্দীন'।

সূফীয়ায়ে কিরাম ফানার তিনটি ধাপের কথা বলেছেন, প্রথম ধাপ হলো ফানা ফিশ্–শায়খ অর্থাৎ আপন মুর্শিদের মধ্যে বিলীন হওয়া, দ্বিতীয় ধাপ হলো ফানা ফির রাসূল– রাসূলর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে বিলীন হওয়া এবং সর্বশেষ ধাপ হলো ফানা ফিল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহর মধ্যে বিলীন হওয়া। যার সর্বশেষ পরিণতি হলো বাক্বা বিল্লাহ অর্থাৎ নিজের মধ্যে খোদায়ী চেতনার স্থায়িত্ব লাভ। সূফী সাধনার সমাপ্তি এখানেই, কিন্তু এর সূচনা হয় মুর্শিদের মধ্যে ফানায়িয়াতের মাধ্যমে। তাইতো বলা হয়েছে, 'ইস্ ফানা-মে বাক্বা হ্যায় খোদা কি কসম' খোদার কসম এই ফানার মধ্যেই বাক্বা রয়েছে।

কিঞ্চিত ভিন্ন ভাষায় প্রায় একই ধরনের বক্তব্য আমরা দেখতে পাই খানবাহাদুরের লেখনীতে। তিনি বলেন :

---

৪৯. আল কুর'আন, সূরা কাহাফ : ৬৫-৮২।

যদি পীর কামিল হন, আর মুরীদের যদি তাঁহার প্রতি অটল ভক্তি থাকে, তবে মুরীদ পাতায় পাতায় তাঁহার মাহ্বুবের অস্তিত্ব দেখিতে পায় কেবল অন্তদৃষ্টি দ্বারা নয়, বাহ্যদৃষ্টি দ্বারাও। একই সময়ে তাঁহার রূহ সহস্র স্থানে উপস্থিত হইয়া সহস্র মুরীদ-আত্মাকে অজানিতভাবে মোস্তাফিজ (ফয়েয দান) করিতে পারে।[৫০]

সূফী দর্শনকে ঐশী প্রেমের দর্শন হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। সমস্ত 'ইবাদত, বিয়াযাত, সংযম, সাধনার যিকর-আযকারের উদ্দেশ্য মহান আল্লাহর প্রেমের পথে অগ্রসর হওয়া।

আহ্ছানউল্লার চিন্তাধারায়ও প্রেমের গুরুত্ব অপরিসীম। তিনি বলেন :

প্রেম অমূল্য বস্তু, ইহার উপমা নাই। ইহা স্বর্গীয়, ইহা কিমিয়া (স্পর্শমণি) স্বরূপ। প্রেম যাহার হৃদয় স্পর্শ করে, তাহার অন্তরস্থ কৃত্রিম পদার্থ বিশুদ্ধ সুবর্ণে পরিণত হয়। দুষ্প্রবৃত্তি তাহা হইতে বিদায় গ্রহণ করে।[৫১]

অতএব, তাঁর এ বক্তব্য থেকে এটা সুস্পষ্ট হচ্ছে যে, ঐশী প্রেমের সাথে নৈতিকতার গভীর সম্পর্ক রয়েছে। মাওলানা রূমী এ প্রসঙ্গে বলেন :

হারকে রা জামা যে ইশ্কে চাক শোদ
উ যে হের্ছ্ ও আয়েব কুল্লী পাক শোদ

অর্থাৎ 'যাহার জামা (অস্তিত্ব) প্রেম দ্বারা পবিত্র হয়, তিনি লালসা ও সব ধরনের কলুষ থেকে নির্মুক্ত হন'।

সূফী আহ্ছানউল্লা অন্যত্র বলেন, 'স্রষ্টার প্রতি অটুট প্রেম হইলে প্রত্যেক সৃষ্ট জীবের প্রতি ভালোবাসা জন্মে'। তাঁর এই মহান মন্ত্রটি শুধুমাত্র উচ্চারণেই থেমে থাকেনি। এই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা আহ্ছানিয়া মিশনের মাধ্যমে মানব সেবার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেবাধর্ম সম্পর্কে শেখ সাদী (র.)-এর অমরবাণী সর্বজনবিদিত–

তারীকাত বাজুয খিদমাতে খালক নিস্ত
বা তাসবীহ ও সাজ্জাদা ও দালক্ নিস্ত

---

৫০. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৩।

৫১. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছুফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

অর্থাৎ 'সৃষ্টির সেবা ছাড়া তরীকত অন্য কিছু নয়, তাসবীহ্, জায়নামায ও পশমের পোশাক পরিধানই তরীকত নয়'।

সূফী আহ্ছানউল্লার উপলব্ধিতে প্রেম হলো আল্লাহর উদ্দেশ্যে সমস্ত বস্তু উৎসর্গ করার মানসিকতা অর্জন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন :

> খোদাতা'লা দাউদ নবীকে বলিয়াছিলেন-ঐ ব্যক্তি আমার প্রিয়তর যে আমাকেই চায়-শাস্তির ভয়ে কিংবা পুরস্কারের আশায় নহে। অন্যত্র কথিত হইয়াছে-তাহা অপেক্ষা অপরাধী কে, যে দোজখের ভয়ে কিংবা বেহেশতের আশায় আমাকে অর্চ্চনা করে। যদি আমি দোজখ বা বেহেশ্‌ত সৃষ্টি না করিতাম, তবে কি কেহ আমার অর্চ্চনা করিত না?[৫২]

হযরত রাবেয়া বসরীর এ বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি সূফী দর্শনের ইতিহাসের সমস্ত পাঠকদের জানা আছে। তাঁর অনবরত প্রার্থনা এই ছিল :

> হে আল্লাহ্, আমি যদি বেহেশতের আশায় তোমার ইবাদত করি তবে বেহেশত আমার জন্য হারাম করে দিও এবং দোজখের ভয়ে যদি তোমার ইবাদত করি তবে দোজখেই যেন আমার স্থান নির্ধারিত হয়।

হযরত রাবেয়ার একমাত্র আকাঙ্খা ছিল শুধুমাত্র আল্লাহর জামাল দর্শন। তিনি যেহেতু প্রেমের উচ্চ পর্যায়ে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর প্রেমাস্পদ ভিন্ন সবকিছুই তাঁর কাছে তুচ্ছ বলে বিবেচিত হতে থাকে। প্রেমের স্তর সর্বোচ্চ স্তর তা ইমাম আল-গাযালী তাঁর জগৎ প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'এহইয়াউ উলূমুদ্দীন'-এ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, 'হে প্রিয় পাঠক, জেনে রাখো, আল্লাহর প্রেমের স্তর হলো শেষ স্তর ও সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ স্থান (মাকাম)'। আল্লাহর প্রেমের স্তরে উপনীত হওয়ার পর আর কোন উচ্চস্তর অবশিষ্ট থাকে না। এই স্তরের আগের স্তরগুলো হলো- তাওবার, ধৈর্য্যের এবং বর্জন (পরহেযের)-এর স্তর। সূফী আহ্ছানউল্লাও একই কথা বলেন :

> ইছলামের চারিটি স্তর-শরীয়ত, তরীকত, হকীকত ও মারেফত। বিশুদ্ধ অনুষ্ঠানের নাম শরীয়ত। ছালেক তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা তরীকত, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা হকীকত ও প্রেম দ্বারা মারেফতে উপনীত হওয়া যায়। শেষ স্তরেই প্রেমময়ের নৈকট্য লাভ হয়, ইহারই নাম তাওহীদ।[৫৩]

---

৫২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮।

৫৩. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *তরীকত শিক্ষা*, ৮ম সং, ২০০৪, পৃ. ৩।

এই স্তরে উপনীত হওয়াই সূফী সাধনার পরম লক্ষ্য। এটিই সূফী নীতিশাস্ত্রের পরম শুভ (summum bonum)।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেন, 'প্রেম শরীর, মন ও হৃদয়কে এক অনির্বচনীয় আনন্দে মুগ্ধ করে'।[৫৪] প্রেমিকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রেমাস্পদের মধ্যে নিজেকে বিলীন করা। পারস্যের সাধক কবি হযরত ফরিদউদ্দীন আত্তার (র.)-এর ভাষায় :

ইশ্‌ক চে বুদ? কাৎরা দারীয়া সাখতান,
আয দো আলম বা খোদা পোর দাখতান।
কাৎরা দার দারীয়া ফিতাদ ও শুদ ফানা
আঁই দারীয়া গাশতানাশ বা'শাদ বা'ক্বা

অর্থাৎ 'প্রেম কিঃ প্রেমের কাজ বিন্দুকে সিন্ধুতে পরিণত করা এবং উভয় জগতের ভিতর একমাত্র খোদাতে চিত্তকে সমাহিত করা। বারিবিন্দু সিন্ধুতে পড়িয়া লীন হইয়া যায়। এই রূপে সাগরে পরিণত হওয়াই তাহার পক্ষে শাশ্বত জীবন লাভ'। (অনুবাদ : মোহাম্মদ বরকতুল্লা)

রাসূল (স.)-এর মিরাজ গমনকে মাওলানা রূমী (র.) প্রেমেরই একটি অবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেন–

জিসমে খাক আয ইশ্‌ক বার আফলাদ শোদ

অর্থাৎ, 'প্রেমের বলেই মাটির দেহ আকাশে উন্নীত হয়েছিল'।

মাওলানা রূমী সারা জগতে শুধু প্রেমই দেখতে পান। তাই বলেন :

ইশ্‌ক আওয়াল, ইশ্‌ক আখের, ইশ্‌ক কুল
ইশ্‌ক লাখ, ইশ্‌ক নাখল-ইশ্‌ক গুল।

অর্থাৎ 'প্রেম আদি, প্রেম অন্ত, প্রেমই হয় মূল, প্রেম শাখা, প্রেম পাতা, প্রেমই হয় ফুল'।

মাওলানা রূমী (র.)-এর উল্লেখিত প্রেম সম্পর্কিত বক্তব্যটি জগতের একটি তত্ত্বগত ব্যাখ্যা। একই ধরনের তত্ত্বগত ব্যাখ্যা আমরা খানবাহাদুর-এর আলোচনায়ও দেখতে পাই :

প্রেমই সৃষ্টির মূলীভূত রহস্য। প্রেম স্রষ্টা ও সৃষ্টের একমাত্র বন্ধন। আত্মা প্রেমবলে পরমাত্মার নৈকট্য

---

৫৪. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ছূফী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

লাভ করে এবং অবশেষে তাহাতেই নিমজ্জিত হয়। আত্মার মধ্যে যে আকর্ষণ তাহা আধ্যাত্মিক জগতে প্রেম নামে অভিহিত।[৫৫]

প্রেম যখন এ পর্যায়ে পৌঁছে তখনই কুর'আন মাজীদের বাণী– ফা আইনামা তুওয়াল্লু ফাসাম্মা ওয়াজহুল্লাহ্ অর্থাৎ, 'যেদিকে তাকাও আল্লাহরই চেহারা'-এর মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম সম্ভব হয়ে।[৫৬]

মাওলানা রূমী (র.)-এর ভাবশিষ্য আল্লামা ইকবালও প্রেমের জয়গান করেছেন। তিনি নিজে একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি এবং দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী লোক হয়েও জ্ঞানের উর্ধ্বে প্রেমকে স্থান দিয়েছেন। তিনি বলেন :

ইলম হ্যায় ইবনুল কিতাব
ইশ্‌ক হ্যায় উম্মুল কিতাব

অর্থাৎ, 'জ্ঞান হলো কিতাবের পুত্র, প্রেম হলো কিতাবের জননী'।

সৃষ্টির রহস্য জ্ঞানের মাধ্যমে বোঝা যাবে না। প্রেমে সিক্ত ব্যক্তিদের হৃদয়েই কেবল মহান স্রষ্টার জটিল সৃষ্টি রহস্য উন্মোচিত হয়। যা সূফী পরিভাষায় কাশ্‌ফ নামে পরিচিত। সূফী সাধনার পথ ধরে নিজের মুর্শিদের কাছে আত্মসমর্পণের মাধ্যমে রাসূল প্রেমে সিক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের পর্যায়ে পৌঁছা যায়। পবিত্র কুর'আন মাজীদে বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, ইয়া আইয়্যুহাল্ লাযীনা আমানু উদ্‌খুলু ফিস্‌সিলমি কা-আ-ফ্‌ফাহ্– অর্থাৎ, 'হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ কর'।[৫৭]

পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মাধ্যমেই কেবল যথার্থ প্রেমিক হওয়া যায়।

সূফী কিরাম চাল-চলনে, চিন্তা-চেতনায়, উপলব্ধি ও অনুভূতি এবং প্রেমে সম্পূর্ণভাবে রাসূলময় হয়ে আল্লাহর প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করতে ব্রতী। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দুনিয়া থেকে যাহেরী অবস্থায় বিদায় নেবার সময় তাঁর পবিত্র যবান থেকে উচ্চারিত হয়েছিল, 'আল্লাহুম্মা রাব্বিগ্ ফিরলী ওয়াল হিকনী বিররাফীকিল আল্লা– অর্থাৎ, 'হে আল্লাহ, হে আমার প্রতিপালক,

---

৫৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *তরীকত শিক্ষা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

৫৬. আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ১১৫।

৫৭. আল কুর'আন, সূরা বাকারা : ২৮০।

আমাকে ক্ষমা কর এবং পরম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'।

রাসূল (স.)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু, পরম প্রেমাস্পদ হলেন আল্লাহ। তাঁর কাছে ফিরে যাওয়ার মধ্যে পরম আনন্দ। প্রেমের পরিণতি প্রেমাস্পদের কাছে ফিরে যাওয়া। তাইতো তাঁর প্রকৃত আদর্শের অনুসারী সূফী কিরাম মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন পরম আনন্দের সঙ্গে এবং তাঁদের মৃত্যু অভিহিত হয় বিসাল বা মিলন হিসেবে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাসূল (স.) ও সূফী কিরামের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিভিন্ন গ্রন্থে এবং মৌখিক তালিমের মাধ্যমে মানুষকে খোদাপ্রেমে নিমজ্জিত একজন সম্পূর্ণ মানুষ হওয়ার আহবান জানিয়েছেন।

মানবিকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত ইসলাম, মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে একজন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক। তাঁর এই পাণ্ডিত্য আমাদের সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ এবং তাতে সংযোজন করেছে বৈচিত্র্য। তবে স্বধর্মনিষ্ঠ ও মুসলমানদের অকৃত্রিম হিতৈষী হলেও তাঁর সেবাধর্ম ও পরোপকারবৃত্তি সীমাবদ্ধ ছিল না মুসলিম স্বার্থের গণ্ডিতে। মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণে উদ্যোগী হলেও তিনি এতটুকু বিদ্বেষী ছিলেন না অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি।

কেবল মুসলমানদের উন্নতি নয়; বরং সব সম্প্রদায়ের মানুষ যেন সমানভাবে উন্নত হয়ে জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সংহত করতে পারে, এটাই ছিল খানবাহাদুরের ঐকান্তিক লক্ষ্য। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের সুষম বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নতিও সম্ভব নয়। তাঁর ভাষায় :

> শরীরের অঙ্গবিশেষের মাংসপেশীগুলির পরিচালনা করা এবং অবশিষ্টগুলিকে অকর্মণ্য করিয়া রাখা বুদ্ধিমানের কাজ নহে...। সুতরাং জাতির সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই জ্ঞানবিস্তার করা গভর্নমেন্টের অবশ্য কর্তব্য কার্য।[৫৮]

খানবাহাদুরের মতে, কোনো দেশের ভালোমন্দের সঙ্গে সেদেশের সাহিত্যের যোগ অত্যন্ত নিবিড়; আর তাই যে কোনো দেশ বা জাতির সংস্কারের জন্য চাই উৎকৃষ্ট সাহিত্যচর্চা। সেদিনের পশ্চাৎপদ মুসলমানদের উন্নতির জন্য তাই তিনি জোর দিয়েছিলেন ইংরেজীর মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করার এবং মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে ব্যাপক শিক্ষার পথ সুগম করার ওপর। এ উপলব্ধি থেকেই সেদিনের হিন্দি-উর্দুর প্রাধান্যের আমলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা ও অনুশীলনের কথা। মাতৃভাষার মাধ্যম ব্যতিরেকে যে আধুনিক জ্ঞানের আলোক গণমানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব নয়, এবং তা না হলে যে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রকৃত কল্যাণ সুদূরপরাহত, তাও তিনি ঘোষণা করেছেন বারবার। মুসলমানদের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবান– 'যদি অন্য জাতির সমকক্ষতা অর্জন করিতে হয়, তবে মাতৃভাষাকে জাতীয়ভাবে প্রতিপন্ন করিতে হইবে। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইলে বাংলা ভাষার উন্নতি আবশ্যক।'[৫৯] এ বিষয়ে অপরকে স্রেফ পরামর্শ দিয়েই তিনি

---

৫৮. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *টিচারস ম্যানুয়েল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২১।

৫৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*, ১৯৮৩ পৃ. ২৪।

ক্ষান্ত হননি, ইংরেজির পাশাপাশি তিনি নিজেও সযত্নে চর্চা করেছেন বাংলা ভাষা এবং মাতৃভাষায় রচনাও করেছেন অর্ধশতাধিক পুস্তক-পুস্তিকা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রতি খানবাহাদুরের আস্থা ছিল অকৃত্রিম এবং এক্ষেত্রে তাঁর অবদানও অবিস্মরণীয়।

আবার বাংলা ভাষায় রূপস্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা ছিল উদার ও অসাম্প্রদায়িক। তাঁর মতে, ভাষার পরিচর্যা তথা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে উদার খোলামন নিয়ে এবং ভাষাকে রাখতে হবে দেশ-কাল ও জাতির সংকীর্ণ মতবিরোধ ও স্বার্থসিদ্ধির উর্ধ্বে। এ প্রসঙ্গে তাঁর এই উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :

> কেহ কেহ বলেন যে, হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য স্বতন্ত্র বঙ্গ ভাষা, আবার কেহ কেহ বলেন পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের জন্যও স্বতন্ত্র ভাষা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গের ব্যবচ্ছেদ হইয়াছে বটে; কিন্তু বঙ্গ ভাষার ব্যবচ্ছেদ হয় নাই। জাতি ও বর্ণভেদ অনুসারে ভাষার ভেদ হওয়া অযৌক্তিক।[৬০]

খানবাহাদুর চেয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপদ জীবন। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেন হানাহানি না থাকে, সবাই যেন সহযোগিতা, সমঝোতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশে মহৎ মানবোচিত জীবনের চর্চা ও অনুশীলন করতে পারে, এটাই প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি। তাঁর এই আন্তরিক আশারই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি এই উক্তিতে :

> আবার পৃথিবী জ্ঞানগর্বে গর্বিত হউক।... আবার বিদ্বেষ কলহ, পরশ্রীকতারতা চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক, আবার প্রকৃতি হাসুক, পাপ কালিমা পুণ্যের আলোকে বিদূরিত হউক, অসত্যের স্থলে সত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। ...সকল ধর্ম, সকল জাতি একযোগে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সারা পৃথিবীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হউক।[৬১]

'সবার উপরে মানুষ সত্য' –এই বাণী খানবাহাদুর আহছানউল্লা মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মানবতার সেবা বিষয়ে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

---

৬০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

৬১. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ. ১৪১।

'সৃষ্টের সেবা এবং স্রষ্টার এবাদত' –এই মন্ত্রে খানবাহাদুর আহসানউল্লা বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই দেখতে পাই 'আহছানিয়া মিশন'-এর মাধ্যমে সমাজ সেবার যে আদর্শ তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তার কার্যক্রম আজও অম্লান।'[৬২]

খানবাহাদুর আহছানউল্লা মানব কল্যাণ ব্রতী মহাপুরুষ বিধায় তাঁর ইন্তিকালের পর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল জাতি তাঁকে একজন সুফীসাধক হিসেবে তাঁর মাজার যিয়ারত করেন ও শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেন। মানুষের সাথে মানুষের কোন পার্থক্য নেই, তার বংশ মর্যাদা, বর্ণ, গোত্র যাই হোক না কেন। এক মানুষ অপর মানুষের আত্মার আত্মীয়। খানবাহাদুর হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর এ আদর্শ আজীবন অনুসরণ করতেন। এ সম্পর্কে খানবাহাদুরের বক্তব্য :

> আমি মানুষে মানুষে পার্থক্য জানি না। শ্বেতকায়ে কৃষ্ণকায়ে প্রভেদ দেখি না, ছোট বড় বুঝি না, সবাই শক্তিমান দয়াময় স্রষ্টার সৃষ্টি। সবারই মধ্যে তাহার দান, তাহার নূর তাহার এহছান বর্তমান। আমি কাহাকে ক্ষুদ্র বলিব, কাহাকে কাফের ডাকিব, কাহাকে ঘৃণা করিব। হে খোদা, তুমি আমাকে ক্ষুদ্রতম করিয়া রাখো যেন তোমার সৃষ্ট বস্তুতে তোমারই বিভা, তোমার জ্যোতি, তোমারই প্রকাশ দেখিতে পাই। কাহাকেও যেন ঘৃণা বা অস্পৃশ্য মনে না করি।[৬৩]

উপরোক্ত বক্তব্যের মধ্যে একাধারে আল্লাহর প্রতি খানবাহাদুরের প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেম অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও অনুরাগ স্ফূর্ত হয়েছে। অর্থাৎ The heart of the mankind is the temple of God. এই মহাবাণীর অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করেছিলেন খানবাহাদুর আহসানউল্লা।

ফলতঃ শিক্ষা-দীক্ষায়, শিক্ষা-আন্দোলনে, জীবনাচরণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, সামাজিক কর্মপ্রয়াসে এবং সর্বোপরি ধর্মানুরাগে সর্বত্র এ সত্যই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, খানবাহাদুর আহছানউল্লা ছিলেন মানবতাবাদী, একালের এক অসাধারণ পুরুষ। মানুষের বুকেই তিনি চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবেন।

---

৬২. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৬৩. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *আমার জীবন ধারা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০।

বাংলা ১৩৩০ সালের কার্তিক মাসে প্রকাশিত *সাম্যবাদী* পত্রিকার ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যায় তাঁর একটি লেখার সন্ধান পাওয়া গেছে। 'সান্দারদের প্রতি সমাজের অবিচার' শীর্ষক এই প্রবন্ধে সামাজিক আচার-আচরণ, সমাজ ব্যবস্থা ও ধর্মীয় কূপমন্ডুকতার শিকার সান্দারদের দুঃখ-দুর্দশার করুণ চিত্র এবং তার সমাধানের যে ইঙ্গিত তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এ প্রবন্ধটির সাহিত্যিক মূল্য অপরিসীম এবং ফোকলোর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একখানি মূল্যবান দলীল। এই প্রবন্ধের কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> খুচরা মনোহারী জিনিসপাতির ব্যবসায় দ্বারা সান্দাররা জীবিকা অর্জন করে। ইহা নিতান্ত হালাল রুজী। সান্দাররা পর্দ্দা প্রথা মানে না; তাহা ছাড়া অন্যান্য সব বিষয়ে ইহারা অন্যান্য সাধারণ মুসলমানের মত ইসলাম ধর্মের পায়রবী করে। ইহাদের মধ্যে মুনশী, মৌলভী ও হাজি বিরল নহেন। অথচ সাধারণ মুসলমান সমাজ ইহাদিগকে মুসলমান ভাই বলিয়া গ্রহণ করিতে ও তাহাদের সঙ্গে সমাজ-জামাত করিতে নারাজ। ইহা নিতান্ত এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধ আচার ও দুঃখের বিষয়।
>
> আমরা স্থানীয় মুসলমান ভাইগণকে বিশেষ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কোন যোগ্য আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন, সান্দারদিগের নিকট উপযুক্ত দামেও জমি বিক্রয় করিতে অস্বীকার করিয়া তাঁহারা দীন এসলামের অপমান করতঃ পাপের কাজ করিতেছেন কি না। আরও ভাবিবার বিষয়, পশ্চিম অঞ্চলে হিন্দু সন্ন্যাসীরা বহু মুসলমানকে হিন্দু করিয়া লইতেছে। মুসলমানদের অনুদারতার জন্য এই সান্দারগণ যদি খোদা না করুন, হিন্দু হইয়া যায়, তবে মুসলমানগণই সেজন্য দায়ী হইবেন। কেহ খাঁটি মুসলমান হইবার জন্য আপনার সাহায্য চাহিলে, আপনি সাধ্য থাকা সত্ত্বেও যদি সে সাহায্য না করেন, তবে আপনি গুনাহগার হইবেন। অতএব, হে চন্দবাড়ী-ঝোপনার মুসলমান ভাইগণ, আপনারা আল্লাহ রছুলের দিকে চাহিয়া এই সান্দারগণকে সাহায্য ও সহানুভূতি করুন।[৬৪]

খানবাহাদুর আহছানউল্লার রচনারীতি সহজেই পাঠককে আপ্লুত করে। তাঁর ভাষা সংযত এবং শান্ত। তাঁর লেখায় কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেলেও সে উচ্ছ্বাসের বন্যায় কখনো বক্তব্য ফিকে হয়ে যায়নি। তাঁর লেখায় শব্দনির্বাচনে, উপমা ও রূপকের ব্যবহারের মধ্যে বাস্তবতার ছাপ সুস্পষ্ট। এ বাস্তবতার মধ্যে লেখকের অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তি প্রকাশ পেয়েছে এবং নিগূঢ় রহস্যের স্পষ্টতা ত্বরান্বিত করেছে। আবার কোথাও এই বাস্তবতার সাথে অনুপম কবি প্রতিভা সংমিশ্রিত হয়ে এক অভিনব ভাব পরিগ্রহ করেছে।

---

৬৪. খান বাহাদুর আহছানউল্লা, *সাম্যবাদী পত্রিকা*, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩০-কার্তিক।

খানবাহাদুর মুসলমানদের সার্বিক অগ্রগতি চেয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি চেয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপদ জীবন।

তাঁর এ আশা আজো পূরণ হয়নি, শীঘ্রই যে পূরণ হবে তেমন কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। কারণ সারা বিশ্বে আজ বিরাজমান এক ভয়াবহ অস্বস্তিকর অবস্থা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কল্যাণে বিশেষতঃ উন্নত দেশসমূহের মানুষ যান্ত্রিক শক্তি ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির অধিকারী হয়েছে বটে, কিন্তু নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে তারাও প্রত্যক্ষ করেছে এক বড় রকমের শূন্যতা। সব মিলিয়ে পৃথিবী আজ এক মহামানবিক সংকটে নিপতিত। জাতি হিসেবে আমরা নিজেরাও এ সংকট থেকে মুক্ত নই। আমরা বরং আছি অর্থনৈতিক ও নৈতিক, এ দ্বৈত সংকটে। ক্ষুধা, দারিদ্র, বঞ্চনা আমাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। আজ আমরা বিত্তবান দেশসমূহের মুখাপেক্ষী ও করুণার পাত্র। অন্যদিকে মনস্তাত্ত্বিক মন্দাভাব, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, রাহাজানি প্রভৃতি সামাজিক ব্যাধি স্তব্ধ ও পঙ্গু করে দিয়েছে আমাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিকে, সমগ্র মানবতাকে ঠেলে দিচ্ছে এক মহা সংকটের দিকে। তাই ধন-জ্ঞান-জনের অধিকারী হয়েও সবাই অস্থির, শান্তি নেই পৃথিবীর কোথাও। না আমাদের দুর্ভাগা দেশে, না বিত্ত-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসর পাশ্চাত্যে।

প্রশ্ন ওঠে, সৃষ্টির সেরা মানুষের এ দুরবস্থার কারণ কী? কারণ অবশ্যই একটি নয়, একাধিক। তবে এর একটি মূখ্য কারণ বোধ করি এই যে, জীবনের স্বরূপ, প্রকৃত অর্থ ও লক্ষ্যটা যে কি, তা আজও স্থির করতে পারছে না সমকালীন মানুষ। এ কারণেই সব কিছু থাকলেও নেই শান্তি। অন্ন-বস্ত্র-ভিটামিন যেমন মানুষের জৈবিক সত্তার পুষ্টির জন্য, তেমনি তার আধ্যাত্মিক সত্তার বিকাশের জন্য প্রয়োজন ন্যায়, সত্য, দয়া-মায়া, প্রেম প্রভৃতি নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের। এ ধরনের মূল্যবোধপুষ্ট মহৎ জীবন-দর্শনের লক্ষ্যেই খানবাহাদুর আহছানউল্লা নিবেদন করেছিলেন তাঁর ধ্যান-ধারণা, সাহিত্যকর্ম তথা সমগ্র জীবন সাধনা। তাঁর এই মহৎ মানবতাবাদী জীবন দর্শনের শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন পৃথিবীর বুক থেকে সব রকম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাবে এবং সমকালীন দিশেহারা মানুষ নিরাপদে ও সুখ-শান্তিতে বসবাস করার সুযোগ পাবে।

মুসলিম সমাজ সংস্কার

পরিবর্তনশীল সমাজের যে সব অসহনীয়-অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় কিংবা সুখ-সমৃদ্ধি-প্রগতি লাভের পথে অন্তরায় হিসেবে যে সব উপাদান-উৎসের উপস্থিতি ঘটে সমাজবাসীর স্বার্থে তা দূর করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান মূল্যবোধের যেমন মৌলিক পরিবর্তন ঘটাতে হয় তেমনি অবহেলিত-বঞ্চিত মানুষের অধিকার-মর্যাদা রক্ষায় জনমত গঠন ও আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার হয়। কিন্তু সমাজ জীবনে এরূপ পরিবর্তন সূচিতকরণের কাজটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হয় না; এর জন্য অপরিহার্যভাবে প্রয়োজন হয় সমাজহিতৈষী ও মানবপ্রেমিকদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত উদ্যোগ। বাংলাদেশেও এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এগিয়ে এসেছেন বিভিন্ন পর্যায়ের সমাজদরদী ও মানব প্রেমিকরা। ব্রিটিশ শাসনামলে সমাজ জীবন নানা দিক দিয়ে শোষণ-বঞ্চনা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, অনিশ্চয়তা-অস্থিরতা, দিকভ্রান্তি ও প্রগতিবিমুখতায় সংকটাপন্ন ছিলো। সমাজ জীবনে এ দুর্বিসহতা-সংকটাপন্নতা কাটাতে নিঃসন্দেহে সমকালীন সমাজহিতৈষী ও মানবপ্রেমিকেরা প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শাহ ওয়ালীউল্লাহ, হাজী শরীয়তউল্লাহ, দুদু মিয়া, নওয়াব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আহমদ খান, সৈয়দ আমীর আলী, বেগম রোকেয়া, স্বামী বিবেকানন্দ, নওয়াব সলিমুল্লাহ, মাওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, শেরে-বাংলা এ.কে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানী প্রমুখের সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। তাঁরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে সংস্কার-উন্নয়ন কর্মে জড়িত হন। তাই প্রত্যেকের ভূমিকাই পৃথক পৃথকভাবে মূল্যায়নের দাবী রাখে। এ প্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের অন্যতম সমাজ সংস্কারক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমাজ সংস্কারমূলক ভূমিকা ও অবদান-ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা যায়।

এ ধরনের একটি প্রারম্ভিক আলোচনা তথ্যগ্রাহ্য, যৌক্তিক ও বিশ্লেষণাত্মক ধারায় উপস্থাপন করার প্রয়োজনে আমরা সাধারণভাবে বিষয়সূচী হিসেবে গ্রহণ করতে পারি প্রথমত, সমাজ জীবনের কোন বাস্তবতায় তিনি সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন; দ্বিতীয়ত, সমকালীন সংস্কারকদের সমাজ সংস্কার ভূমিকা সমাজ-চাহিদা নিবৃত্তকরণে কতটা সফলকাম হয়েছিলো ও কতটা সুদূরপ্রসারী ছিলো; এবং তৃতীয়ত, সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার অবদান কতটা কার্যকর ও অর্থবহ। সে আলোকে সমকালীন সমাজ জীবনের বাস্তবতা ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি এবং খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সংস্কার আন্দোলনের রূপ- এর বৈচিত্র্য ও ব্যাপ্তি নিয়ে সামগ্রিক আলোচনার অবতারণা।

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শোষণ-বঞ্চনা, রাজনৈতিক বিদ্রোহ ও অস্থিরতা, অজ্ঞতা-রক্ষণশীলতা ও চিন্তা-ভাবনার দীনতা, কুসংস্কার ও পাপাচার, হতাশা-অনিশ্চয়তা, শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনগ্রসরতা, মূল্যবোধ-ধ্যান-ধারণার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও প্রগতিবিমুখতা, বুদ্ধির আড়ষ্টতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতা ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থায় সমাজ জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এমন অবস্থার মধ্যেই সূত্রপাত ঘটে বিভিন্ন সমাজ সংস্কার আন্দোলনের।

সমাজ সংস্কারক শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৭০৩-১৭৬৩) ধম-কর্মকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতি বিধানের মাধ্যমরূপে গ্রহণ করেন[৬৫] এবং আত্ম-অনুসন্ধান ও চিন্তার পুনর্গঠনের মাধ্যমে ভারতে ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলনের সূচনা করে ইসলামী নৈতিক দিক-নির্দেশনায় সামাজিক অকল্যাণকর অবস্থার নিরসনে সচেষ্ট হন।[৬৬] ভারতের 'জাতীয় বীর' আখ্যায়িত রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) বেদান্ত ধর্ম আলোচনা, একেশ্বরবাদ প্রচার, সতীদাহ্ প্রথা নিরোধ, স্ত্রী ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্যোগ-তৎপরতায় আধুনিক জীবন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে চেয়েছেন।[৬৭] তাঁর আত্মীয় সভা বা ব্রাহ্মসমাজের সে আলোকে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয় : প্রথমত, অসাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে যথাযথ ভদ্র ও শান্তভাবে সকল রকম হিংসা-বিদ্বেষের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে এবং প্রতিমূর্তি প্রতীক ব্যবহার না করে এক স্রষ্টা ও প্রতিপালকের উপাসনা করার জন্য সভা-সমিতির আয়োজন করা; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে স্রষ্টা ও পালক পরমেশ্বর সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণার উন্নয়ন, প্রেম-প্রীতি-দয়া, ভক্তি-সাধুতার মতো মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো এবং সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের মাঝে দৃঢ় একক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উপদেশ-প্রার্থনা, সঙ্গীত ও বক্তৃতা-আলোচনার ব্যবস্থা করা।[৬৮] আধুনিক যুক্তিবাদের অনুসারী রামমোহনের কর্মকাণ্ড যদিও দৃষ্টিভঙ্গিগত গভীরতায় সমাজ জীবনের ধ্যান-ধারণাগত পরিবর্তন সূচনার পথনির্দেশনা দেয়, তবুও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব-সংগঠকের অভাব, সাংগঠনিক আয়োজনগত ত্রুটি-সীমাবদ্ধতা এবং কর্মক্ষেত্রে পরিসরগত সংকীর্ণতার কারণে তা সমাজবাসীর মধ্যে দীর্ঘমেয়াদে ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়।

---

৬৫. S.M. Ikram, *'Shah Waliullah' in Mohmad Hossain*, (eds.), *'History of the Freedom Movement'*. Karachi, 1957. উদ্ধৃত, আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত।

৬৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, *সমাজ কল্যাণ সমীক্ষণ*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯০, পৃ. ৩২০।

৬৭. দ্রঃ, Sankar Ghose, *The Renaissance to the Militant Nationalism in India,* Calcutta : Allied Publishers, 1969, P. 16.

৬৮. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬২।

সমাজ সংস্কারক হিসেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কৃতিত্ব হলো হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে শিক্ষার প্রসার ও স্ত্রী শিক্ষার গোড়াপত্তন।[৬৯] তাঁর হিন্দু বিধবা বিবাহে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এর জন্য তিনি ব্রিটিশ সরকারকে ১৮৮৫ সালে আইন প্রবর্তনে বাধ্য করতে সক্ষম হন। কিন্তু বিধবা বিবাহ আইন পাশ হওয়ার পরও এ রীতি সমাজে প্রচলন করা সম্ভব হয়নি। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'যাহারা জনমত উপেক্ষা করিয়াও এরূপ বিবাহ দিতে বা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যা ছিলো আনুপাতিক দিক দিয়ে মুষ্টিমেয়। এমন কি যাহাদের বাল্য বিধবা হয় তাহাদের পিতা-মাতা ও অভিভাবকবৃন্দ নতুন আইনের সাহায্য গ্রহণ করিবার জন্য উপযুক্ত সাহস সঞ্চয় করিতে পারে না।'[৭০] এমনকি অনুসন্ধান করেও দেখা গেছে যে, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহে বাধাদান নিষিদ্ধ হবার পর উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং অধিকাংশই নিজের উদ্যমে ও অর্থ ব্যয়ে অথবা তাঁর একান্ত ভক্তদের প্রচেষ্টায়।[৭১] সমসাময়িক সময়ে ১৮৭৫ সালে স্বামী দয়ানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আর্য-সমাজ' নাম নিয়ে একটি হিন্দু সংগঠন হিন্দু সমাজের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ আনলেও নিজ দর্শন-কর্মে প্রগতিশীলতা-প্রতিক্রিয়াশীলতার দ্বন্দ্বে কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি।[৭২]

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে ব্যাপকভাবে পরিচিত একটা সমাজ সংস্কার আন্দোলন হলো ফরায়েজী আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলেন হাজী শরীয়তউল্লাহ ও তাঁর ছেলে দুদু মিয়া। প্রথম পর্যায়ে ফরায়েজী আন্দোলন শরীয়তবিরোধী কার্যকলাপ থেকে মুসলমানদের রক্ষা ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমানদের ইসলামের শরীয়ত পথে ফিরিয়ে আনার জন্য গড়ে ওঠে এবং পরে তা ব্রিটিশ বিতাড়ন ও মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়।[৭৩] ফরায়েজী আন্দোলনে মুখ্যত যোগ দেয় দরিদ্র মুসলমানেরা তথা মুসলমান কৃষক শ্রেণী। শরীয়তউল্লাহ সাম্যের আদর্শে ভক্তির সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনুসারীরাও এক মহাপরিবার বন্ধনে আবদ্ধ হয়।[৭৪] তাঁর এ

---

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৪-৩১৬।

৭০. শ্রী খগেন্দ্রনাথ সেন, *সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা,* কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৪২।

৭১. বিনয় ঘোষ, *বাংলার নবজাগৃতি,* কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান লিঃ, ১৯৭৯, পৃ. ১৫৭।

৭২. ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ,* ঢাকা : বাংলা একাডেমী, পৃ. ২৮।

৭৩. হুমায়ুন আবদুল হাই, প্রাগুক্ত,, পৃ. ৫৮, এবং A.R. Mullick, *'British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856'*, Dhaka : Asiatic Society of Pakistan,1961, P. 74.

৭৪. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪।

আন্দোলন ঢাকা ও ফরিদপুর জেলাতেই মূলত সীমিত ছিল। শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে দুদু মিয়া এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ফরায়েজীদের সুসংঘবদ্ধ ও সুসংহত করে তাদের সাহস ও আত্মবিশ্বাস জাগরিত করেন[৭৫] এবং দেশীয় জমিদার ও নীলকুঠির ইংরেজদের অত্যাচারসহ ব্রিটিশ শোষণবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। কিন্তু শক্তিধর ব্রিটিশ শাসকের বল প্রয়োগ ও নির্যাতনের মুখে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটলে এ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ফলে ইতিহাসে ফরায়েজী আন্দোলন একটা প্রশংসনীয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী আন্দোলন হলেও রাজনৈতিক রূপদানের কারণে পরবর্তীকালে তা আর সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করতে পারেনি বা ব্যাপকতর সামাজিক পরিবর্তন সূচিত করতে সক্ষম হয়নি। মুসলমানদের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বার্থরক্ষা ও ইংরেজি শিক্ষার প্রসার এবং মুসলমানদের সামাজিক কুসংস্কার-রক্ষণশীলতা দূর করা ও জাতীয় জাগরণ ঘটাতে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮) ও নওয়াব আবদুল লতিফ (১৮৪৯-১৯২৮)-এর উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদ-এর আলীগড় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিলো মুসলমানদের রাজনৈতিক-প্রশাসনিক স্বার্থরক্ষা, মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও সমাজে বিরাজমান অজ্ঞতা-রক্ষণশীলতা দূরীকরণ।[৭৬] মুসলিম স্বার্থরক্ষক একটা অনুবাদ কেন্দ্র, কলেজ ও সভা-অধিবেশন স্থান হিসেবে গোটা ভারতে আলীগড় নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলো। কিন্তু মুসলমান জনগোষ্ঠীর সকল অংশ এর অন্তর্ভুক্ত হবার সুযোগ না থাকায়, দেশজ ও ধর্মীয় ভাবধারার চেয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি অত্যধিক আনুগত্য, শিক্ষা-চর্চা অনুশীলনে মুখ্য কর্মপ্রয়াস সীমিত করে রাখার প্রবণতা ইত্যাদি কারণে এ আন্দোলন সমাজ জীবনে ব্যাপকতর কাঙ্খিত পরিবর্তনের পরিচয়বাহী হয়নি। অনুরূপভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলে তথা গোটা বঙ্গদেশে অবহেলিত-অনগ্রসর মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন ও পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকল্পে নওয়াব আবদুল লতিফ মাঠে নামলেন। তিনি তাঁর কর্ম ঠিক করলেন প্রথমত, মুসলমানদের প্রতি ইংরেজ সরকারের বৈরী মনোভাব দূরীকরণ, দ্বিতীয়ত, স্বসমাজে ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, তৃতীয়ত মুসলমানদের জন্য সুযোগ-সুবিধা আদায় করা, এবং চতুর্থত, মুসলমানদের অধিকার সচেতন ও দাবী আদায়ে সংঘবদ্ধ করার জন্য সভা-সমিতি স্থাপন।[৭৭] ড. দানীর ভাষায় তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো :

---

৭৫. ড. আবদুর রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫।

৭৬. ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

৭৭. ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩।

> To impart useful information to the higher and educated classes of Mohammedan Community by means of Lectures, addresses and discourses on Literature, Science and Society, which are delivered at the monthly meetings in Urdu, Persian, Arabic and English languages.[৭৮]

সুতরাং স্যার সৈয়দ আহমদ-এর সাথে নওয়াব আবদুল লতিফ-এর মৌলগত কোনো পার্থক্য না থাকায় তাঁর কর্মও ব্যাপকতরভাবে এ অঞ্চলের সকল মানুষের সামাজিক অবস্থার কাঙ্খিত পরিবর্তন সূচিত করতে পারেনি বলা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে তিনি নিজে দেশজ ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মধ্যকার দ্বন্দ্বে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। মনোজগতের এ দ্বিধা-দ্বন্দ্বময় অবস্থায় পাশ্চাত্য জীবন যাপনে তিনি আবার ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে অনেকটা রক্ষণশীলই হতে চেয়েছেন।[৭৯] তাই 'The most distinguished Musalman reformer of the day' কিংবা 'One of the most progressive and enlightened of the Mohamedans' হিসেবে ইংরেজদের স্বীকৃতি আসলেও বাস্তবতার আলোকে তা পুরোপুরি সমর্থনীয় হতে পারে না।

একজন বলিষ্ঠ সমাজ হিতৈষী, গভীর ও তীক্ষ্ণধার সমাজ সংস্কার, মুসলিম স্বার্থরক্ষক ও জাতীয় জাগরণের প্রগতিমুখী অগ্রদূত হিসেবে ঐতিহাসিক সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮) অবশ্য ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। আমীর আলী ইসলাম ধর্মকে প্রগতির প্রতীকরূপে গ্রহণ করে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও নৈতিক চিন্তাধারার আলোকে তা পুনর্মূল্যায়ন ও ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান।[৮০] তাঁর ভাষায় :

> Enlightenment must preceed reform; and before there can be a renovation of riligious life, the mind must first eccape from the bondage which centuries of literal interpretation the doctrine of 'conformity' have imposed upon it, the formalism that does not appeal to the heart of the worshiper

---

৭৮. উদ্ধৃত, আখতার-উল-আলম, *জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত নবাব আবদুল লতিফ*, ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর, ১৯৮০, পৃ. ৮-৯।

৭৯. সালাহউদ্দীন আহমদ, *'বাঙালী মুসলমান সমাজ ও রাষ্ট্র চিন্তা (১৮৫৭-১৯০০)'*, সমাজ নিরীক্ষণ, জানুয়ারী ১৯৮০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃ. ৭৬-৭৭।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

must be abandoned, externals must be subordinated to the inner-feelings.[৮১]

আমীর আলী ইতিহাস ও দর্শনের কালজয়ী চর্চা করে ইসলামের মহত্ত্ব ও ব্যাপকতার সার্বজনীনতা খোঁজার চেষ্টা করলেও বাস্তবে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভাবধারায় পুরোপুরি সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হননি; বরং তাতে জীবনাচরণের ক্ষেত্রে তিনি অনেকটা পাশ্চাত্য ঘেঁষাই হয়ে পড়েন। তা ছাড়া মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনা ও জীবনাচরণগত দিকের সংস্কার ও জাগরণ আনার আহ্বান জানিয়েও তিনি সবশেষে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকেই অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে গ্রহণ করে শাসনতান্ত্রিক উপায়ে মুসলমানদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনায় সচেষ্ট হন। সে লক্ষ্যেই তিনি প্রথমে মোহামেডান এসোসিয়েশন এবং পরে নাম পাল্টে গোটা ভারতব্যাপী সেন্ট্রাল মোহামেডান এসোসিয়েশন নামক সংগঠন গড়ে তোলেন। এসব বাস্তবতার আলোকে মুসলিম স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় জাগরণে আমীর আলী ইতিহাসে এক অনবদ্য নায়ক, কিন্তু নিজ সীমাবদ্ধতার জন্য আলোড়ন সৃষ্টিকারী সমাজ সংস্কারক নন। ফলশ্রুতিতে যতটা পণ্ডিত ও লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন ততটা সমাজ সংস্কার হিসেবে পরিচিত হতে পারেননি। বাংলাদেশের ইতিহাস পর্যালোচনায় তাই যথার্থই বলা যায়– 'তাঁর মত একজন মনীষীকে পেয়ে মুসলমান সমাজে বিপ্লব আসেনি। তবে তিনি যে সমাজের বদ্ধমুখ, রুদ্ধগতি অপসারিত করে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।'[৮২]

বস্তুত বাংলাদেশে সামগ্রিক ও সুদূর প্রসারী সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নমূলক আন্দোলন দেশজ বাস্তবতায় দেশীয় শক্তিতেই গড়ে উঠতে হবে। তাতে আপন ইতিহাস-ঐতিহ্য ও লোকজ জীবনধারার সাথে সম্পৃক্ত হওয়াকে যেমন এড়িয়ে যাওয়া যাবে না, তেমনি বিশ্বজনীন মানবতাবাদী আদর্শ ও যুক্তিবাদও উপেক্ষিত হতে পারে না। এ সূত্রে আবার গুরুত্ব দিতে হবে ব্যক্তি ও আত্মশক্তির স্ফুরণ-বিকাশকে। ব্যক্তি মানুষের পূর্ণতর মনুষ্যত্বের বিকাশ ধারায় সমাজকে গড়ে নিতে হবে, সংস্কার করতে হবে এবং পরিচালিত করতে হবে প্রগতির পথে। সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নের এরূপ ধারা সূচনা করতে গেলে সংস্কারক বা সমাজ হিতৈষীকেও হতে হবে বহুমুখী প্রতিভা-ক্ষমতার অধিকারী। বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসে এরূপ বহুমুখী প্রতিভা-ক্ষমতা নিয়েই জন্মেছিলেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। তিনি ব্যক্তি জীবনের বন্ধ্যাত্ব ঘুচিয়ে পূর্ণতর মানবীয় বিকাশ

---

৮১. Syed Ameer Ali, *'The Spirit of Islam'*, উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৮২. ওয়াকিল আহমদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬।

ও অনগ্রসর অবহেলিত মানুষের স্বার্থ রক্ষার বহুমুখী আয়োজনে আপন চিন্তা ও কর্মকে প্রসারিত করেন। পুণ্য-ধন্য ও আদর্শ সূফী সাধকের জীবনরূপ আধুনিক যুগেও কিভাবে সকল জঞ্জাল-প্রাচীর উপড়ে ফেলে মানুষ ও তার সমাজকে প্রগতিমুখী করার সুযোগ এনে দেয়, এর প্রকৃষ্ট নিদর্শন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। তিনি এ দেশীয় জীবন বৈচিত্র্যে ইসলামী ভাবতরঙ্গ ও আধুনিক জীবন দৃষ্টির এক পরিশীলিত সমন্বয়ধারা গড়ে নিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে এমনটি হওয়া সম্ভব হয়েছে।[৮৩]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র সমাজ সংস্কারমুখী ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ডের স্বরূপ-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে এর বহুমুখী ও ব্যাপক রূপ লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে তাঁর সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মুখ্য লক্ষণীয় দিক- প্রথমত, এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যের লালন-পালন-অনুসরণ; দ্বিতীয়ত, ব্রিটিশ শাসনামলে ইউরোপীয় যুক্তিবাদ-নীতি কাঠামোর প্রভাবে মানবীয় স্বার্থরক্ষণ ও অবহেলিত-বঞ্চিতদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ; তৃতীয়ত, সমষ্টিবাদ ও ব্যক্তিবাদের দেশজ ধারায় প্রগতিমুখী সমন্বয় সাধন; চতুর্থত, বিশ্বজনীন ধর্মীয় নীতি-দর্শনে আত্মানুসন্ধান ও মানবমুক্তির পথনির্দেশনা দান।

বাংলাদেশের ইতিহাসে দেখা যায় যে, এখানকার সমাজ জীবনের এক গৌরবময় ও শক্তিধর অধ্যায় হলো মুসলমান ফকির-দরবেশের বাংলাদেশে আগমন। সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে-রাজ্য জয় নয়, কিংবা বিদ্যমান সামাজিক বৈষম্য-শোষণকে টিকিয়ে রাখা শক্তিযোগানের কারণেও নয়– এদেশের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ইসলামের ভাবাদর্শ ও মানবতাবোধের প্রসার ঘটানোই ছিলো তাঁদের লক্ষ্য। নিজ ধর্মের মহত্ত্ব ও নিজ চরিত্রগুণেই সূফী সাধকরা এদেশে কাম্য লক্ষ্যার্জনে সফলকাম হন। তাঁদেরই সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলাদেশের সমাজে এক বিপ্লব ঘটে গেলো। সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব, প্রেম-প্রীতি, সততা-সরলতা, আদর্শবাদিতা ও এক আল্লাহর উপাসনানুবীতার মধ্যে সমাজের সর্বস্ত রের মানুষ মুক্তি পেলো এবং ব্যক্তিগত, দলগত ও সমষ্টিগত পরম সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির পথে যাত্রা শুরু করলো। সমাজ জীবনেও ইসলামী ভাবাদর্শ ও জীবন পদ্ধতির চৌহদ্দিতে গড়ে উঠতে থাকলো। মানবীয় অধিকার-মর্যাদার মূল্যবোধ অনুসরণ করে রাজ্য শাসক- সমাজ শাসকরাও মানবতাতেই হলেন উজ্জীবিত। পীর-ফকির প্রভাবিত সামাজিক পরিবর্তনের এ ধারা মুঘল আমলে এসে আভ্যন্ত রীণ ত্রুটি-বিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা এবং ইংরেজ শাসনাধীনে এসে ইউরোপীয় প্রভাব ও পারস্পরিক

---

৮৩. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৯।

হিংসা-বিদ্বেষসহ দাঙ্গা-হাঙ্গামায় স্তিমিত হয়ে পড়তে থাকে-যার ফলে সূচিত হয় সমাজ জীবনের এক অপরিকল্পিত পরিবর্তন অধ্যায়। সামাজিক ইতিহাস-ঐতিহ্যের এ ক্রান্তিলগ্ন ও পরিবর্তন ধারার মধ্যেই আবির্ভাব ঘটে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার।

তাঁর সময় সমাজ জীবনে সর্বত্র বিরাজ করছিলো রাজনৈতিক-প্রশাসনিক শোষণ-বঞ্চনা, সামাজিক অজ্ঞতা-নিরক্ষরতা ও কুসংস্কার, নৈতিকতার অবনতি ও ঐতিহ্যগত মানবতাবাদের বিপর্যয়, বুদ্ধির আড়ষ্টতা ও মুক্তিপথের দিকভ্রান্তি ইত্যাদি। এমন অবস্থার মধ্যেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ব্যক্তিজীবনে গড়ে তোলেন সূফী-সাধকের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সংস্পর্শে, শিক্ষাজীবন কাটান প্রাচ্য পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে, কর্মজীবন অতিবাহিত করেন ইউরোপীয় যুক্তিবাদী শাসন কাঠামোর ছত্রছায়ায় এবং সবশেষে অবসর জীবন নির্বাহ করেন ধর্মবোধের আত্মানুসন্ধান ও মানব সেবার আদর্শবাদে। ফলে তিনি যেমন হয়ে ওঠেন দেশজ ইতিহাস-ঐতিহ্য অনুরাগী, তেমনি নিজেকে মানব সেবায় ব্রত করতে উৎসাহী হন সমাজ সংস্কার ও মানব মুক্তির ঐকান্তিক কামনায়।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমাজ সংস্কার ও মানব মুক্তির জীবনদর্শন-কর্মকাণ্ড ব্যাপ্ত হয় তাঁর আদর্শ জীবন গঠন, শিক্ষা সংস্কার, জাতীয় জাগরণ, আধ্যাত্ম সাধনা, সমাজ সেবা ও সাহিত্য চর্চার বহুমুখী ধারায়। নানা আঙ্গিকে নানা দিকে তাঁর কর্মকাণ্ড প্রসারিত হলেও সব কর্মকাণ্ডই কিন্তু একই সূত্রে গ্রথিত ছিলো। আর সে সূত্রে দেশজ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও ইসলামী ভাবতরঙ্গের সাথে আধুনিক যুক্তিবাদী নীতি-কাঠামো পরিশীলিত ধারায় সমন্বিত হয়ে সামগ্রিক সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নতির বার্তা বহন করে আত্মানুসন্ধান-আত্মবিকাশের মধ্যে তথা ব্যক্তিজীবনের পূর্ণতায়। তাঁর সূত্রাবদ্ধ কর্মকাণ্ডের বহুমুখী ধারা ব্যাখ্যা করলে এ সত্যই বেরিয়ে আসে।

ক. আদর্শ জীবন গঠন

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ছিলেন এক ধর্মভীরু পরিবারের সন্তান। একজন স্থানীয় হিন্দু সুপণ্ডিতের কাছে প্রারম্ভিক শিক্ষা গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় যোগ দেন। ১৮৯০ সালে বৃত্তিসহ এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হুগলী কলেজ থেকে এফ.এ. এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি.এ. ও এম.এ. পাশ করেন। তারপর শিক্ষকতার মতো আদর্শ পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন।[৮৪] কিছুদিন শিক্ষকতা পেশায় কাটানোর পর ১৮৯৮ সালে তিনি শিক্ষা বিভাগে অতিরিক্ত ডেপুটি

৮৪. গোলাম মঈনউদ্দিন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*, জয় পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ১৪।

ইন্সপেক্টর পদে যোগ দেন। এ শিক্ষা বিভাগেই কাটে তাঁর কর্মজীবনের গোটা সময়। এখানেই তিন নিজ গুণে ক্রমশ পদোন্নতি পেয়ে যথাক্রমে ডেপুটি ইন্সপেক্টর, ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর ও সবশেষে ইন্ডিয়ান এডুকেশন সার্ভিসভুক্ত হয়ে সর্বোচ্চ চাকরি সহকারী ডিরেক্টর (এ পদে তিনিই সর্বপ্রথম একজন ভারতীয় হিসেবে নিযুক্তি পান) হিসেবে পাঁচ বছর কাটিয়ে ১৯২৯ সালে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

শিক্ষাজীবনে একজন শিক্ষার্থী হিসেবে ও কর্মজীবনে শিক্ষক, পরিদর্শক, সহকারী পরিচালক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জীবনে সঞ্চয় করেছেন নানারকম অভিজ্ঞতা এবং জীবনকে গঠন করেছেন ইসলামী ভাবাদর্শ, জনসেবা, শিক্ষা সংস্কার ও মানব প্রেমের আদর্শানুরাগীতায়। জীবনের গতিপথ হিসেবে তিনি অনুসরণ করতে নেমে পড়েন হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনাদর্শকে। সে অনুসারে সকল মানব শ্রেণীকে ধর্ম ও জাতি নির্বিশেষে প্রেমসূত্রে আবদ্ধ করে মহাপ্রভুর উদ্দেশ্য সাধনকে জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেন।[৮৫]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা তাঁর আধ্যাত্ম সাধনায় মন ও আদর্শ জীবন গঠনে নিজ চাহিদা-আকাঙ্খাকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার বেষ্টনীতে আবদ্ধ করতে পেরেছিলেন। এ বেষ্টনীতে অবাধ বিচরণ করতে গিয়ে জীবনের পূর্ণতার স্বাদ পেয়েছেন গভীর ও ব্যাপকতরভাবে। বেষ্টনীর এ পরিমণ্ডলে স্রষ্টার নৈকট্যের জন্য রাসূল (স.)-এর জীবনচরিত ছিলো তাঁর পাথেয়। সে জন্যই তাঁকে আমরা দেখতে পাই একজন সূফী সাধক হিসেবে। আর সে সূফী সাধকের মানবিক গুণাবলী আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় প্রস্ফুটিত হয়ে ব্যক্তি মন ও সমাজ মনকে আলোকিত করে, কল্যাণ পিপাসু করে, পরম সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত হতে আহবান করে।

খ. শিক্ষা সংস্কার

শিক্ষা সংস্কারে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলমান স্বার্থরক্ষা, মুসলিম শিক্ষার প্রসার ও তাদের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনে আপ্রাণ চেষ্টা চালান।[৮৬] শিক্ষা সংস্কার ও প্রসারে তাঁর সাধ্যমত চেষ্টা চালানোর

---

৮৫. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন, ১৯৮৮, পৃ. ১৪৩।

৮৬. সৈয়দ মুর্তজা আলী, শিক্ষা দিশারী, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ১৭শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ ১৩৭৯, পৃ. ১০৬-১২২।

ফলশ্রুতিতে এ অঞ্চলের সর্বস্তরের মুসলমানরা শিক্ষায় অনেকটা অগ্রসর হয়। মুসলিম শিক্ষা সংস্কার ও সম্প্রসারণে তিনি যেসব উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা এ অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায়ে সবিস্তারে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৮৭]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা শিক্ষাকে দেখেছিলেন বস্তুত জীবন-প্রয়োজনের সামগ্রিকতায়। তাঁর দৃষ্টিতে সে শিক্ষাই হলো প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষের শরীর-মনকে পুষ্ট করে। আধ্যাত্মিক শিক্ষা সম্পর্কে তিনি আরো বলেন :

> মানসিক শিক্ষার সহিত আধ্যাত্মিক শিক্ষাও আবশ্যক। শরীর, মন ও আত্মা লইয়া মানুষ গঠিত। শরীরের জন্য ব্যায়াম আবশ্যক, আর আত্মার জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা আবশ্যক। শরীরের আয়ু সীমাবদ্ধ, কিন্তু আত্মার মৃত্যু নাই। শাশ্বত কাল যে আত্মার প্রসার, তার শিক্ষার জন্য আমরা একদম উদাসীন। যে শিক্ষা দ্বারা শরীর মন পুষ্ট হয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। প্রত্যেক অভিভাবকের মনে ইহার আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে হইবে। আমাদের কর্তব্য ব্যক্তিগত উন্নতি দ্বারা সমাপ্ত হয় না– জাগতিক উন্নতি সাধন প্রত্যেক মানবের কর্তব্য। স্রষ্টা মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন যে উদ্দেশ্যে, সেই উদ্দেশ্য অন্ততঃ আংশিক পূরণ করিতে প্রত্যেক সৃষ্ট মানুষ বাধ্য। এই কর্তব্য লইয়া জীবন সায়াহ্নে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিতেছি। আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় একটা হৃদয়ও যদি আধ্যাত্মিক আলোকে প্রজ্জ্বলিত হয়, তবে জীবন সার্থক মনে করিব।[৮৮]

গ. জাতীয় জাগরণ

দুর্দশাগ্রস্ত অধঃপতিত দেশজ ভাবধারা ও জীবনাচরণকে অবলম্বন করে মুসলমানদের ইসলামী ভাবাদর্শ জাগ্রত করতে আহ্ছানউল্লা তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তিনি সমসাময়িককালে মুসলমানদের শোচনীয় অধঃপতনের বর্ণনা দিতে গিয়ে নিজেই বলেছেন :

> বর্তমান যুগে মোছলেমগণ প্রাণশূন্য, কেবল আক্ষরিক অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত। ইহারা ছরওয়ারে কায়েনাত মুকাখখারে মাজুদাত হজরত রছুলুল্লার দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভুলিয়াছে। একতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্ব ভুলিয়া গিয়া ইছলামের নামে কলঙ্ক আনিয়াছে, প্রকৃত শিক্ষা ও দীক্ষার অভাবে সকল জাতির পশ্চাতে পড়িয়াছে... সমাজ

---

৮৭. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫-১১০।

৮৮. প্রাগুক্ত।

বাক্যাড়ম্বরে তৃপ্ত নহে, সমাজ চায় কার্যকরী দৃষ্টান্ত, সমাজ চায় নতুন জীবন, নতুন প্রেরণা, নতুন জাগরণ।[৮৯]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা এক মহাক্রান্তিকালেই মুসলিম জাগরণের দায়িত্ব পালন করেছেন বলা যায়। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পর্যুদস্ত ও সম্পদহারা, সামাজিক দিকে নানা রকম শোষণ-বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে আদর্শ-বিচ্যুতি ও অনগ্রসরতার মধ্যে এদেশের মুসলমানরা যখন কালযাপন করছিল তখনই তিনি জাতীয় নবজাগৃতির লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও লেখনীর মাধ্যমে তাদেরকে উজ্জীবিত করতে এগিয়ে আসেন। তিনি বাস্তব প্রয়োজনে ইসলামের মহত্ত্ব ও মুসলমানের অতীত গৌরব বর্ণনা করে পাঠ্যপুস্তক রচনা করার জন্য আহবান জানান এবং সেগুলো পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার দাবী রাখেন। ড. ওয়াকিল আহমদ-এর মতে, 'তিনি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, আধুনিক শিক্ষা ও স্বীয় সংস্কৃতির বিকাশ ও বিস্তার ছাড়া জাতির উন্নতি সম্ভব নয়।'[৯০] তিনি বস্তুত সমাজবাসীকে সচেতন করার জন্য সমাজ শিক্ষা ও স্বজাতিকে ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে উজ্জীবিত করার জন্য সংগ্রামী পথনির্দেশকের ভূমিকা পালন করেন। ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় সমাজ শিক্ষা ও জাতীয় জাগরণে তাঁর ভূমিকা নির্দেশ করতে গিয়ে যথার্থই বলেছেন :

> তাঁর সমসাময়িক মুসলমান সমাজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা ও তজ্জনিত মানসিক জড়তায় ক্লিষ্ট হয়ে যেভাবে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল, তাতে স্বভাবতঃই সমাজ দরদী আহ্ছানউল্লা'র প্রাণ কেঁদে উঠেছিল। তিনি বুঝেছিলেন, মুসলমান সমাজকে মর্যাদাসম্পন্ন একটি জাতির মত বাঁচতে হলে অপরের অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়ার চেষ্টা না করে শিক্ষা ও পেশাগত যোগ্যতা অর্জন করে জীবন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মুসলমান সমাজে প্রায় সকলের মনে কেমন যেন একটা হীনমন্যতাবোধ কাজ করে চলেছে। এ হীনমন্যতাবোধের শিকার হয়ে, সুস্থ জীবনের স্বপ্ন থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমান সমাজ দুর্গতির পথকেই দিন দিন প্রশস্ত করে তুলেছিল। সমাজ শিক্ষক আহ্ছানউল্লা এই মানসিক অধোগতি থেকে মুসলমান সমাজকে উদ্ধার করার প্রয়োজনেই লেখনীর মাধ্যমে তাদের ইতিকর্তব্য নির্দেশের প্রয়াস পেয়েছিলেন।'[৯১]

---

৮৯. গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পাদিত, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১।

৯০. ড. ওয়াকিল আহমদ, 'আহ্ছানউল্লা (১৮৭৩-১৯৬৫)', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।

৯১. ড. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সমাজ শিক্ষক আহ্ছানউল্লা', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

তিনি আরো বলেন :

> আহ্ছানউল্লার জীবন ছিল ইসলামী ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত। তিনি বিশ্বাস করতেন, মুসলিম জীবনে এই অবলুপ্তপ্রায় মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপরই নির্ভর করছে আধুনিক বাঙ্গালী মুসলমানের নবজাগরণ। ইসলামের অতীত ইতিহাস তাঁর এই বিশ্বাসকে পুষ্ট করেছিল। সে জন্যই তিনি মুসলমানকে আহবান জানিয়েছিলেন তার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করতে, অতীত কীর্তির আলোকে নতুন কালের জন্য যাত্রাপথের সন্ধান করতে। শুধু তাই নয়, তিনি এও বুঝেছিলেন যে, অতীত স্মৃতিচারণই যথেষ্ট নয়। ধর্মীয় মূল্যবোধগুলো এককালে মুসলমানের মেরুমজ্জায় শক্তি সঞ্চার করেছিল, তাকে বৃহতের সাধনায়, মহতের উপলব্ধিতে প্রেরণা দিয়েছিল, সেই মূল্যবোধগুলোকে বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই কেবল মুসলমানের সত্যিকার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব। এই মূল্যবোধগুলো সমকালীন মুসলিম জীবনে প্রায় অনুপস্থিতই ছিল। তাই আহ্ছানউল্লা একজন ক্রুসেডারের ন্যায় সেই মূল্যবোধগুলোকে মুসলিম জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন।[৯২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দেশ ও জাতির প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের অঙ্গ বলে মনে করতেন। তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলিম জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ও অনুরাগী ছিলেন।[৯৩] জাতীয় জাগরণে মুসলমানদের ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি 'ইসলামের অবদান : ধর্ম, সাহিত্য ও সভ্যতা' শীর্ষক লেখায় বলেন[৯৪] :

> মোছলেম বাদশাহগণ ৭০০ (সাতশ) বৎসর রাজত্ব করিয়া ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের হিতসাধন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, রাজ্যাধিকার নহে। মোছলেম অভ্যুদয়ের পূর্বে ভারতে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব প্রবলতর ছিল। ব্রাহ্মণযুগে কেবল সংস্কৃত ভাষার প্রচলন ছিল, অন্য ভাষাকে যাবনিক ভাষা বলিয়া ঘৃণা করা হইত। ফলে শিক্ষা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মোছলেম বাদশাহগণ নানা স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং সংস্কৃত হইতে ফার্সী, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় পূর্বকালীন গ্রন্থাদি অনুবাদ করিতে সাহায্য করেন। জাতি-নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীকে শিক্ষাগারে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। সুধীমণ্ডলী বাদশাহদিগের দরবারে সম্মানিত হইতেন এবং সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীগণ যথোচিত পুরস্কৃত হইতেন। মুছলমানদিগের শাসনকালে শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের সৌকর্য সাধিত হয় এবং তৎসহ ভারতে সভ্যতা বিস্তৃত হইতে থাকে।

---

৯২. প্রাগুক্ত।

৯৩. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

৯৪. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪৪-৫৪৯।

ধর্মে, সাহিত্যে, কাব্যে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে সঙ্গীত-এ প্রায় সহস্র বৎসর ধরিয়া ইছলাম বিশ্ববাসীর পথপ্রদর্শক হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীসের লুপ্তপ্রায় বিজ্ঞান এবং দর্শনকে মোছলেমগণই সঞ্জীবিত করেন। বিশ্ববাসীকে তাঁহারাই বিজ্ঞান শিক্ষা দিতেন। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সূত্রপাত তাঁহারাই করেন। বাগদাদ, কায়রো, করডোভা, গ্রানাডা, সেভিল প্রভৃতি স্থানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি মধ্যযুগের অন্ধকার দূরীভূত করিয়াছিল।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা মুসলমানদের ইসলাম ধর্মের মহত্ত্ব ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্য এক লেখায় বলেন[৯৫] :

মহাপ্রভুতে নিজেকে সমর্পণ করার নাম ইছলাম, আত্মত্যাগের নাম ইছলাম, প্রত্যেক মানুষকে ভ্রাতৃবৎ জ্ঞান করার নাম ইছলাম, নফ্ছকে বশীভূত করার নাম ইছলাম, পরোপকারার্থে আত্মোৎসর্গ করার নাম ইছলাম, খোদার প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মহব্বত সৃষ্টি করার নাম ইছলাম, এক কথায় স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টের যোগাযোগ সাধনের নাম ইছলাম।... ইছলাম সমগ্র মানবজাতির জন্য মনোনীত। ইহা চিরসত্য, সমগ্র মানবজাতির অনুকূল, বিশ্বশান্তির প্রস্রবক।

দেশজ সংস্কৃতি ও জীবনধারার রক্ষা-বিকাশকে আহ্ছানউল্লা আত্মজাগরণ, পারস্পরিক ঐক্যবদ্ধতায় আত্মশক্তি গঠন ও জাতীয় মুক্তি অর্জনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

বাংলা ভাষার সমৃদ্ধি ও মর্যাদা রক্ষায় এতটুকুতেই তিনি তাঁর কর্মকে সীমিত রাখেননি। হিন্দী ও উর্দু ভাষার প্রাধান্য বিস্তার করে বাংলা ভাষাকে কোণঠাসা করার অপচেষ্টাও তাঁর সময়ে তিনি প্রতিহত করেছেন।

সুতরাং সামগ্রিক বিবেচনায় খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা জাতীয় জাগরণে বিভিন্নভাবে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ঘ. অধ্যাত্ম সাধনা

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পারিবারিক সূত্রে আধ্যাত্মিক পরশ পান এবং কর্মজীবনে চট্টগ্রামে এসে বিভিন্ন পীর-দরবেশ ও ওলী-আওলিয়াদের মাজার-চিল্লায় যাতায়াত করে অধ্যাত্ম সাধনায় উদ্বুদ্ধ হন। তারপর তিনি সৈয়দ গফুর শাহ্-এর নিকট বায়আত গ্রহণ করেন ও অবসর জীবনে পূর্ণতরভাবে

---

৯৫. প্রাগুক্ত, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

অধ্যাত্ম সাধনায় রত হন।[৯৬]

সতের বছর চট্টগ্রামে কর্মজীবন কাটাতে গিয়ে এখানের প্রকৃতি ও পীর-ফকির প্রভাবিত আধ্যাত্মিক পরিবেশ তাঁকে প্রলুব্ধ করে অধ্যাত্ম সাধনায়।

তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার বৈশিষ্ট্য হলো কর্মযোগে অধ্যাত্মসাধন ও মানবকল্যাণ, ব্যক্তি মানুষের পূর্ণতর বিকাশ ও চরিত্র গঠন, সামাজিক ভোগান্তি লাঘবকরণ, কায়মনে মহব্বত জাগিয়ে মানবতার জয়গান, বিশ্বজনীন ধর্মের অনুশীলন ও কল্যাণ পথের পথিক হয়ে আদর্শ জীবন গঠন, মানসিক প্রশান্তি লাভ, সাম্য-মৈত্রী ও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসার মনুষ্যত্ববোধ জাগরিতকরণ, মানবিক মূল্যবোধ উজ্জীবিতকরণ এবং আত্মশক্তির বিকাশ সাধন ইত্যাদি। আসলে ধর্মসাধনা ও মানবসেবা ছিল খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র অন্তর-জীবনের বৈশিষ্ট্য। সে কারণে কর্মজীবনের প্রথম লগ্ন থেকেই একজন শুদ্ধাচারী মুসলমান হিসেবে তিনি মুক্তবুদ্ধির চর্চা, ধর্মের মাহাত্ম্য অনুসন্ধান ও মানবতার জয়গানে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। চট্টগ্রামে কর্মজীবন নির্বাহ করার সময় দিনে সরকারী কাজ আর রাতে সূফী দরবেশের জীবনাদর্শে নিজেকে সমর্পণ করে কর্মযোগেই অধ্যাত্ম সাধনায় প্রবেশ করেন খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। এ প্রসঙ্গে ড. গোলাম সাকলায়েন বলেন :

> খানবাহাদুর সাহেব তাঁর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্যের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন অর্থাৎ তাঁর কর্মযোগ আধ্যাত্মিক মোক্ষ লাভের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপ, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এই তত্ত্ব কথাকেই তিনি বহু ক্ষেত্রে উদ্‌ঘাটন করেছেন।[৯৭]

ড. গোলাম সাকলায়েন তাঁর কর্মযোগ আধ্যাত্মিকতার ব্যাখ্যায় আরো বলেন :

> বস্তুতঃ তাঁর মত ছিল এই যে, কর্মজীবনের মধ্যে নিজেকে সমর্পণের অর্থই হলো পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলার বন্দেগী করা। এবং সেই আদেশ ইচ্ছা পূরণ করা প্রকৃতপক্ষে মানব কল্যাণের মূলমন্ত্র। এভাবেই খানবাহাদুর সাহেব জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর জীবন একটি সাফল্যমণ্ডিত সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবন– আদর্শ জীবন। জীবনের আদি অন্তরে রয়েছে ঐশী শক্তি।[৯৮]

---

৯৬. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫।

৯৭. ড. গোলাম সাকলায়েন, 'মানব কল্যাণব্রতী খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

৯৮. ড. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩।

ব্যক্তি মানুষের পূর্ণতর বিকাশ ও চরিত্র গঠনের উপর আহ্ছানউল্লা সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন এবং এর জন্য শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক সাধনাকে সব সময় অপরিহার্যরূপে তুলে ধরতেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কোন রকম ভণ্ডামি-প্রতারণা বরদাশ্‌ত করতেন না এবং আদর্শ শিক্ষার জন্য আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন তীব্রভাবে। তাঁর ভাষায় :

> দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের ধর্ম-শিক্ষা শুধু বাহ্যিক, উহা অন্তরকে স্পর্শ করে না। শিক্ষক যদি চরিত্রবান ও খোদাভক্ত হন তবে তাঁহার শিক্ষা বিদ্যুতের মত কাজ করে। দয়াময় আল্লাহ্ সকলেরই হৃদয়ে ঐশী শক্তি এনায়েত করিয়াছেন, শিক্ষার অভাবে ঐ শক্তি অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত থাকে। সুশিক্ষকের হাতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে ঐ গুপ্ত শক্তি ব্যক্ত হয় আর খোদার মাহাত্ম্য দৃষ্টিগোচর হয়। শিক্ষার অভাবে আর কুশিক্ষকের হাতে আমাদের খোদাপ্রদত্ত শক্তির অপচয় হইতেছে, এজন্য দায়ী কে?[৯৯]

তিনি ভোগান্তি বা দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ক্ষেত্রেও সর্বশেষ ও সর্বোত্তম পন্থারূপে আল্লাহ্ তা'আলার করুণা প্রাপ্তির জন্য আত্মিক আনন্দ ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাকে গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে এক লেখা স্পষ্টতঃই বলেছেন যে :

> দারিদ্র্য ব্যাধি, আত্মীয়বিয়োগ, জ্বরা, মৃত্যু, ভাগ্য বিপর্যয় ইত্যাদি নিবারণ তাহার অসাধ্য, অথচ এইগুলিই আবহমান কাল হইতে সমাজে এবং রাষ্ট্রে প্রবল অসন্তোষের তরঙ্গ উত্থিত করিয়া জগৎটাকে কারাগার অপেক্ষাও ভয়াবহ করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল অপরিহার্য বিপৎপাতকে সহনীয় এবং ভোগ্য করিবার জন্য কোন ধারাবাহিক চেষ্টা এ যাবৎ দৃষ্ট হইতেছে না। পরন্তু ইহা নিবারণের জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে আদৌ সম্ভব নয়। তাই মানুষকে জড়ের অতীত অজড়ে, স্থূলের অতীত সূক্ষ্মে, কার্যের অতীত কারণে, অহমিকা জ্ঞানের অতীত পরম জ্ঞানে, তর্কের অতীত বিশ্বাস ও ভক্তিমার্গে লইয়া উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। তজ্জন্য সব কাজে করুণাময়ের করুণহস্ত, সম্পদে বিপদে তাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছা, সকল ধ্বনিতে তাহারই প্রেমগীতি, সকল রূপ অপরূপে তাহারই সৌন্দর্য দেখিতে হইবে, শুনিতে হইবে, বুঝিতে হইবে ও বিশ্বাস করিতে হইবে।[১০০]

অধ্যাত্ম সাধনার বদৌলতে আদর্শ জীবনের প্রতীক খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা। ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবনের দুর্বিসহতা প্রশমনেরও কর্মী হয়েছিলেন। শুধু লেখনী বা ধর্মসাধনার পথনির্দেশ করেই নয়,

---

৯৯. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, পৃ. ১২২-১২৩।

১০০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০।

দুঃখী মানুষের সাথী হিসেবেও। তাঁর এ দিকটার প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে সূফী জুলফিকার হায়দার বলেন :

> আল্লাহ এবং সত্যধর্ম সম্পর্কে অনুশীলন ও অনুসন্ধিৎসার কল্যাণ পথের পথিক এবং বিদগ্ধ প্রাণের অধিকারী ছিলেন সূফী-সাধক খানবাহাদুর সাহেব। এ সাধকের মনটি ছিল কল্যাণ-জিজ্ঞাসু। কল্যাণ-জিজ্ঞাসু মনের অতৃপ্ত আকাঙ্খা থেকে জন্মলাভ করে অনুসন্ধিৎসার মঙ্গল প্রেরণা। সে প্রেরণা আল্লাহ প্রদত্ত। আল্লাহর পথে আকর্ষিত এবং ঈমানের আলোকে আলোকিত প্রাণ নিয়ে সুদীর্ঘ বিরানব্বই বছরের পুণ্যশ্লোক জীবন অতিবাহিত করে তিনি তাঁর সাধনোচিত ধামে বাঞ্ছিত শান্তির আলয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। এবং আজকের ক্লেদ-কালিমালিপ্ত এ পঙ্কিল ধারায় তিনি রেখে গেছেন এক সুমহান আদর্শ জীবনের পুণ্যদীপ্ত স্বাক্ষর।[১০১]

সাম্য-মৈত্রী ও প্রেম-প্রীতি ভালোবাসায় মনুষ্যত্বের জাগরণ ও মানবতাবাদের জয়গানের যে সার্বজনীন আবেদন আহ্ছানউল্লা'র কর্মকাণ্ডে মূর্ত হয়ে ওঠে তাতেও ইসলামের মহত্ত্ব, রাসূলুল্লাহ (স.)-এর আদর্শ জীবন অনুসরণ, অধ্যাত্মসাধনা তথা ধর্মবোধ মুখ্য বিষয়। এক্ষেত্রে আরো বিচিত্র ব্যাপার হলো, তিনি তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার প্রেম-প্রীতিকে বা ধর্মবোধকে আবার দেশজ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও পাশ্চাত্যের ভাবধারার মানব প্রেমে সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন। ফলে তাঁ মানবতাবাদে কোনরূপ মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত না এসে ঐক্য সূত্রের সম্মিলন হয়েছে, মানব প্রেম মুখ্য হয়েছে এবং তিনিও নিজ জীবনে পূর্ণতরভাবে তা প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছেন। ড. কাজী দীন মুহাম্মদ-এর মতে :

> তাঁর শিক্ষা ইংরেজী কায়দায়, কিন্তু তাঁর সংস্কৃতি প্রবণতা আরবী-ফারসী প্রভাবিত বাঙালী মুসলিম পরিবেশকে কেন্দ্র করেই পরিশীলিত হয়েছে। তাঁর চরিত্রে নিছক শিক্ষার উগ্র আধুনিকতা এবং পারিবারিক আরবী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গোঁড়ামী- এই দুই চরম পন্থার সুসামঞ্জস্য সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।[১০২]

আসলে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ধর্মবোধের মানবপ্রেমে এক শক্ত ও গভীর সম্পর্ক বন্ধন রচনা করে সমাজ গড়তে চেয়েছিলেন এবং সে অর্থেই নিজেকে উৎসর্গ করার অভিলাস ব্যক্ত করেছিলেন। তাই তাঁকে বলতে দেখা যায় :

> আপনাদের নিকট আমি সম্মানের প্রার্থী নহি। আমি প্রার্থী আপনাদের মঙ্গলের, আপনাদের শান্তির,

---

১০১. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩।

১০২. ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, 'খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : তাঁর আদর্শ ও ধর্মীয় চেতনা', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

আপনাদের আনন্দের। আমি চাই আপনাদের খেদমত করিতে, আমি চাই আপনাদের কল্যাণের জন্য স্বীয় স্বার্থ, স্বীয় সুখ, স্বীয় গৌরব বিলাইয়া দিতে।

ড. গোলাম সাকলায়েন উপর্যুক্ত বক্তব্যের মাহাত্ম্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন :

> এ বক্তব্য একজন সাধারণ মানুষের নয়। বক্তা স্বয়ং আর দশজন মানুষের মত নন। তিনি বসনভূষণে সাধারণ হলেও আত্মিক ক্ষেত্রে অসাধারণ ছিলেন। তিনি নিজের অহংবোধকে বিসর্জন দিয়েছেন আজীবন।[১০৩]

খানবাহাদুরের মানবপ্রেমে মানুষই ছিলো বড় সত্য, ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেষে মানুষ। কেননা তাঁর কাছে মানুষ হলো আত্মার আত্মীয়। সে জন্যই মানবতাবোধ ও মানবপ্রেমের মধ্যে মানুষের সাম্য, ঐক্য সংহতি খুঁজে পান। ইসলামের প্রকৃত সত্য খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

তাঁর মানবপ্রেম আর্ত মানবতার মুক্তি ও মানবসেবায় প্রসারিত। সে কারণে কোন কোন লেখক তাঁর মানব প্রেমের মধ্যে ভারতীয় সূফীবাদ ও বৈষ্ণব প্রেমবাদের সুষম বিকাশ লক্ষ্য করেন। মোহাম্মদ মূসা আনসারীর মতে :

> তাঁর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলে মনে হয় বিংশ শতাব্দীতে তাঁর জীবনে ভারতীয় সূফীবাদ ও বঙ্গীয় বৈষ্ণব প্রেমবাদের সবিশেষ অথচ সুষম বিকাশ ঘটেছিলো। তিনি বৈরাগ্যের মধ্য দিয়ে মুক্তির সন্ধান করেননি। প্রেমধর্ম ও সেবাধর্মে তিনি দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। সেবাধর্ম থেকে তাঁকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম না থাকলে নির্মল সেবা করা সম্ভব নয়।[১০৪]

আধ্যাত্ম সাধনায় আহ্ছানউল্লা হলেন একজন সূফী সাধক। সূফী মতবাদে বিশ্বাসী হয়ে তিনি মুহাম্মদ (স.)কে সর্বশ্রেষ্ঠ সূফীরূপে গণ্য করেন এবং তাঁর শিক্ষাকে সকল সময় সকল কাজে অনুসরণীয় বলে উল্লেখ করেন।[১০৫] সূফী মতবাদের আলোকেই তিনি চেয়েছেন দেশ, সমাজ ও মানুষের সেবা করতে এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে জাগরণ আনতে।

তাঁর আধ্যাত্ম সাধনায় বিশ্ব মানব প্রেমিক মন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আর তা ইসলাম ধর্ম ও আধুনিক

---

১০৩. উদ্ধৃত, ড. গোলাম সাকলায়েন, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬।

১০৪. মোহাম্মদ মূসা আনসারী, 'আলহাজ্জ খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা প্রসঙ্গে', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮।

১০৫. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০।

জীবন দৃষ্টির সমন্বয় ধারায় প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্য ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ তাঁর চিন্তা-ভাবনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটা সম্মিলন লক্ষ্য করেন এবং ড. কাজী দীন মুহাম্মদ আধুনিকতা ও পারিবারিক শিক্ষা-সংস্কৃতির গোঁড়ামীর মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয়ধারা দেখতে পান। এদিক থেকে আহ্ছানউল্লা ব্যক্তিগত আধ্যাত্ম সাধনায় মানবতার জয়গানে মুখর হয়েছেন বলা যায়। ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ-এর কথায় :

> একজন আধ্যাত্ম সাধক ব্যক্তিগত মুক্তিসাধনায় তখনই সার্থক, সম্পূর্ণ সার্থক, যখন সেই ব্যক্তিগত সাধনা মানবতার উন্নয়নে সম্মিলিত হয়; মানুষের জীবনের উন্নয়নে সামগ্রিকভাবে তার আধ্যাত্ম সাধনাকে মিলিয়ে দিতে পারেন। এবং আমি যথাযথ ক্ষুদ্র জ্ঞানেও পর্যালোচনা করে পেয়েছি, খানবাহাদুর সাহেবের জীবনে আমি দেখেছি যে, তাঁর জীবনের এই আধ্যাত্ম সাধনার সঙ্গে মিশেছে মানব প্রেম, মানব উন্নয়ন সাধনা। এই দুই সাধনার সম্মিলন প্রাচ্য-প্রতীচ্য দর্শনেরই সম্মিলন।[১০৬]

যে ভাবেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহেবের ধর্মীয় আধ্যাত্ম সাধনাকে দেখা হোক না কেন তাতে চরিত্র গঠন, মানবতার জয়গান, সাম্য-মৈত্রী ও প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসায় মনুষ্যত্বের জাগরণ, আত্মশক্তির বিকাশ তথা মানবপ্রেম ও মানবমুক্তি জোরালোভাবে পরিস্ফুট হয়।

ঙ. সমাজসেবা

কর্মজীবনের প্রথমভাগে শিক্ষা প্রসার ও শিক্ষা সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আহ্ছানউল্লা সমাজ সেবায় নিয়োজিত হন। এক্ষেত্রে তিনি যেমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ছাত্রাবাস ও শিক্ষা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করেছেন তেমনি জাতীয় প্রয়োজনে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষামূলক বই-পুস্তক প্রকাশেরও ব্যবস্থা করেছেন। এতে এদেশের মুসলমানরা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, শিক্ষা গ্রহণ-দানে উৎসাহিত হয়েছে এবং স্বদেশী ভাবধারায় আত্মজাগরণমূলক বা আত্মশক্তি অর্জনমূলক সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত হবার বাস্তব সমর্থন লাভ করেছে।[১০৭]

আহ্ছানউল্লা কর্মজীবনে সমাজসেবার নানা দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেও আনুষ্ঠানিক বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সুশৃঙ্খল সমাজসেবা শুরু করেন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর হতে। অবসর জীবনের শুরুতেই তাঁর সমাজ সেবার একটি সুশৃঙ্খল প্রয়াস হলো ১৯৩৫ সালের ১৫ মার্চ নলতা গ্রামে 'আহ্ছানিয়া মিশন' প্রতিষ্ঠা।

---

১০৬. ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ, 'সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব', *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

১০৭. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

চ. আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা

চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বদেশবাসীর 'রূহানী খেদমত' এবং সমাজ সেবার জন্য 'আহ্ছানিয়া মিশন' নামে একটি ধর্মীয় ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাঁর জীবন ছিল একটি পরিপূর্ণ ও সুন্দর মানুষের জীবন। সেবাই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহ্ছানিয়া মিশন সেবব্রতের মহান কর্মে এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে আজ সকলের নিকট পরিচিত।

আহ্ছানিয়া মিশন ও তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত অন্য যে কোন মিশনের মধ্যে মৌল যে পার্থক্য বিদ্যমান ছিল তা হলো– আহ্ছানিয়া মিশন মানুষের সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্যে একটি চমৎকার সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। মিশনের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে-'স্রষ্টার এবাদত ও সৃষ্টের সেবা' শিরোনামে। মিশন প্রতিষ্ঠার মৌল উদ্দেশ্য ও এর কর্মধারার ব্যাপ্তি এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। মিশন প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে খান বাহাদুর আহ্ছানউল্লা বলেছেন :

> ১৯৩৫ সনের ১৫ই মার্চ নলতা গ্রামে একটি মিশন স্থাপিত হয় এবং উহা উক্ত মৌলভী ছাহেবের পরামর্শ মতে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও আহ্ছানিয়া মিশন নামে অভিহিত হয়। বলিতে কি এ যাবৎ অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে আমার নাম প্রদত্ত হয় নাই। নলতার খোদাপরায়ণ ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি নির্দিষ্ট হয় এবং মেম্বরগণের সাহায্যের দ্বারা মিশনের পরিচালনা কার্য সম্পন্ন হইতে থাকে। এই গরীবকে উক্ত মিশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয় এবং এম. জওহর আলী সাহেব সেক্রেটারী পদে মনোনীত হন। জনাব মোঃ কুচলউদ্দিন খান ও মোঃ সুলতান আলী সহকারী সেক্রেটারী পদ গ্রহণ করেন। নলতা মিশনের শাখা নানা স্থানে স্থাপিত হয় এবং স্থানীয় মেম্বরগণ দ্বারা উহাদের কার্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।[১০৮]

এই মিশনের প্রতিষ্ঠা ও অগ্রগতির ইতিহাস আজকের দিনে অনুপ্রেরণার উৎস হতে পারে। 'সৃষ্টের সেবা' শীর্ষক কাজ শুরু হয় পল্লীর বিভিন্নমুখী উন্নয়নের মধ্য দিয়ে। পল্লীর নবীনদেরকে তিনি মিশনের কাজে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম হন। আস্তে আস্তে প্রবীণরাও মিশনের প্রতি আকৃষ্ট হন। নবীন প্রবীণদের সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে মিশন দ্রুত জনমনে আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়, নিভৃত ও দুর্ভিক্ষকাতর অন্ধকারাচ্ছন্ন পল্লীপ্রাণে আশার আলো সঞ্চারিত হয়। মিশনের সদস্যগণ

---

১০৮. ড. কাজী মোনায়েম, *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবনস্মৃতি*, খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারকগ্রন্থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪।

পল্লীর ঘরে ঘরে গিয়ে মুষ্টিভিক্ষার চাউল সংগ্রহ করেন এবং এর বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে মিশন তহবিল গঠিত হয়। এভাবে সংগৃহীত মিশনের মূলধন পুনরায় পল্লীর জনগণের সেবায় ব্যয়িত হয়েছে। সদস্যগণ নিঃস্বার্থভাবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মৃতদেহের সৎকার করেছেন, নতুন নতুন রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন, পুরাতন রাস্তাঘাট সংস্কার করেছেন, কলেরা-বসন্ত রোগীর পাশে বসে রোগীর সেবা করেছেন ও ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করেছেন, যে কোন মহামারী মোকাবেলা করেছেন, শিশু-কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতা দূরীকরণে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। এভাবে আহ্ছানিয়া মিশন নিঃস্বার্থভাবে পরোপকারে ব্রতী হয়েছে। হযরত খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার মন-মানসিকতা বিশ্লেষণে আমরা লক্ষ্য করি মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং মানুষের সেবা করার মধ্যেই তিনি বিমল আনন্দ অনুভব করেছেন। জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি শহরে বসবাস করেছেন। কিন্তু সে জীবন তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই চাকরি থেকে থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি পল্লীর কোণে আশ্রয় নেন এবং এখানে বসে মানুষের সেবা করাকে তিনি জীবনের উদ্দেশ্য হিসেবে চিহ্নিত করেন।

আহ্ছানিয়া মিশনের যে অগ্রযাত্রা একটি পল্লীর নিভৃতকোণে শুরু হয়েছিল তা এই পল্লীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ক্রমে ক্রমে এ মিশনের বিস্তার ঘটে গ্রাম থেকে শহরে, দেশে এবং বিদেশে। বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা, উপজেলায় এবং দেশের বাইরে আহ্ছানিয়া মিশনের ৮৪টি শাখা মিশন ধর্মীয় ও বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজে নিয়োজিত আছে। আহ্ছানিয়া মিশনের সদস্যদের 'নির্দিষ্ট কর্তব্য' সম্পর্কে মিশন প্রতিষ্ঠাতা খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার নির্দেশাবলী এখানে উল্লেখ করা হল :

১. মহব্বতকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিতে হইবে।
২. মেম্বরগণ পরস্পর পরস্পরকে জান ও দেলের সহিত সাহায্য করিবে।
৩. বিপন্নকে সাহায করা, প্রতিবেশীর খবর লওয়া, মাতাপিতা ও গুরুজনের সেবা করা, প্রধান কর্তব্য মনে করিবে।
৪. সর্ব্বদা সত্য বলিবে।
৫. মৃত ব্যক্তির অন্তিম কার্য্যে সাহায্য করিবে।
৬. দুর্ব্বল বা স্ত্রীলোক বা এতীমের উপর কেহ জুলুম না করিতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে।
৭. দুস্থ, পীড়িত ও নিপীড়িতকে সাহায্য করিবে।
৮. গ্যারুই শরীফ ও মিলাদ শরীফে যোগদান করিবে।

৯. মেহমান ও মোছাফেরদিগের তত্ত্বাবধান করিবে।

১০. প্রত্যেক সজীব বস্তুর প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে।

১১. অসৎ সঙ্গ ত্যাগ করিবে।

১২. অভিমান সর্ব্বদা পরিহার করিবে।

১৩. ঈর্ষা, দ্বেষ, কুচিন্তা, কুবাক্য, উপহাস ও কছম হইতে সতত বিরত থাকিবে।

১৪. নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র মনে করিবে।

১৫. অতিভোজন, অতি পান, অতি নিদ্রা ও অতি বাক্যব্যয় হইতে সাবধানে থাকিবে।

১৬. লোকের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবে, উহাতে জাতি বিচার করিবে না।

১৭. হুবর এখ্‌তেয়ার করিবে, রেজা ও তছ্‌লীম নীতি অনুসরণ করিবে, শোকর-গোজার থাকিবে।

১৮. অপরকে কথা ও কার্য্যে সন্তুষ্ট করিবে।

১৯. মঙ্গল ও অমঙ্গলকে সমচক্ষে দেখিবে।

২০. শরীর ও মনকে সর্ব্বদা পাক রাখিবে।

২১. প্রতিদিন তেলাওয়াত করিবে ও যথা সময়ে নামাজ আদায় করিবে।

২২. দরুদ শরীফ আবৃত্তিকে প্রধান দৈনন্দিন ব্রত করিবে।

২৩. স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ করিবে ও মাহবুবের প্রতি গাঢ় ভক্তি পোষণ করিবে।

২৪. গ্রাম্য বিবাদ বা দলাদলির মধ্যে যোগদান করিবে না।

২৫. কাহারও হকুক নষ্ট করিবে না।

২৬. কথা ও কার্য্যের দ্বারা কাহারও অন্তঃকরণে ব্যথা দিবে না।

২৭. কখনো শরীয়ত বিরুদ্ধ কাজ করিবে না।

২৮. কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহের বশবর্ত্তী হইবে না।

২৯. আমানতকে খেয়ানত করিবে না।

৩০. প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না।

৩১. বৃথা তর্ক করিবে না, কাহাকেও নিন্দা বা ঘৃণা করিবে না, পীড়ন বা অযথা তোষামোদ করিবে না।

৩২. কাহারও অপরাধের প্রতিশোধ লইবার চিন্তা পোষণ করিবে না।

৩৩. কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিবে না।

৩৪. অহঙ্কার করিবে না।

৩৫. লোকের বাহবা লইবার উদ্দেশ্যে, কিংবা নিজের বাহাদুরী দেখাইবার জন্য কোন কাজ করিবে না।

৩৬. পার্থিব সুখ-সম্ভোগের জন্য আখেরাতকে নষ্ট করিবে না।[১০৯]

আহ্ছানিয়া মিশনের শাখা মিশনগুলোর মধ্যে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আহ্ছানিয়া (ওয়েলফেয়ার) মিশন ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মহিলা মিশন– মিশন প্রতিষ্ঠাতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ত্বরান্বিত করতে বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নিরক্ষরতা দূরীকরণ ও বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম অবৈতনিক বিভিন্ন ভোকেশনাল ট্রেনিং জনমনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছে। কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের জন্য অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনাও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। আহ্ছানিয়া (ওয়েলফেয়ার) মিশন দুঃস্থ রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করে থাকে। সমাজের দুঃস্থ, অবহেলিত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের জন্য আহ্ছানিয়া মিশনের সেবামূলক কর্মপ্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনসহ সকল শাখা মিশন যথাযথ মর্যাদা ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করে থাকে। এভাবে মিশন তার সদস্য ও অনুসারীদের আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান কার্যালয় মিশন প্রতিষ্ঠাতার জন্মস্থান নলতায় অবস্থিত। কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল শাখা মিশনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অংশ গ্রহণ করেন এবং মিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনান্তে ভবিষ্যত কর্মসূচী প্রণয়ন করেন। আহ্ছানিয়া মিশন এভাবে দেশ, জাতি, সমাজ ও মানুষের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে আন্তরিক কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

ছ. সাহিত্য

মানবপ্রেম ও মানবসেবার মহতী আদর্শকে সামনে রেখে খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা সাহিত্য চর্চায় নিয়োজিত হন দীর্ঘসময়– ষাট বছর ব্যাপী; মোট রচিত গ্রন্থ সংখ্যা ৭৮। বিষয়গত দিক বিভাজনে গ্রন্থগুলো হলো– জীবনী বিষয়ক, কুর'আন হাদীস বিষয়ক, শিশু সাহিত্য বিষয়ক, ইসলামের মাহাত্ম্য বিষয়ক, ইতিহাস বিষয়ক, বিভিন্ন ধর্মের উপর আলোচনা, ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক, ভ্রমণ কাহিনী

---

১০৯. খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা, *ভক্তের পত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪, ২০৮ সংখ্যক পত্র।

বিষয়ক ও বিবিধ ধরনের।[১১০]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা'র মতে :

> সমাজসেবাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। দুঃখের বিষয় অনেক স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। পাঠকের রুচিকর করিতে গিয়া অনেকে নাটক নভেলের অবতারণা করিয়া ধনোপার্জনের উপায় স্থির করেন। রুচি মার্জিত করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য, কলুষিত করা উদ্দেশ্য নহে। আমাদিগকে সাহিত্যের দ্বারা ভাবী সমাজের উন্নতির পথ পরিষ্কার করিতে হইবে, বালকদিগের মনে প্রথম হইতেই ধর্মভাবের বীজ উপ্ত করিবার প্রয়াসী হইতে হইবে। ঈশ্বর ভক্তি ও চরিত্র গঠন শিশুসাহিত্যের প্রধান লক্ষ্য হওয়া আবশ্যক। জাতীয় ইতিহাস, ধর্ম ও শাসননীতি মুসলমান সাহিত্যের অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।[১১১]

অধ্যাপক আবদুল গফুর-এর মতে :

> খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা 'আর্টস ফর সেক' নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি জীবনের জন্য, মানব জীবন উন্নয়নের তাগিদে যখন যা রচনার প্রয়োজন অনুভব করেছেন, লিখেছেন।[১১২]

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে উদাত্ত আহবান জানান।

আসলে আহ্ছানউল্লা তাঁর বিভিন্ন সাহিত্যকর্মে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনকে নৈতিক শুদ্ধতা অর্জন ও ইতিহাস-ঐতিহ্যে আত্মসচেতন হয়ে মানব সেবা, আধ্যাত্ম সাধনায় মানব প্রেম ও আল্লাহতে সমর্পণ এবং সর্বোতভাবে আধুনিক জীবনাচরণের মধ্যেও পরম সুখ-সমৃদ্ধি লাভে উৎসাহিত-উদ্দীপিত করতে চেয়েছেন। কেননা, ড. সুনীল কুমার-এর কথায় :

> তিনি বিশ্বাস করতেন, নিরন্তর সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেকে যোগ্যতর করে তোলার প্রচেষ্টার মধ্যেই রয়েছে আত্মোন্নয়নের চাবিকাঠি।... এ জন্যই শিক্ষাবিদ আহ্ছানউল্লা লেখনী ধারণ করেছিলেন।[১১৩]

---

১১০. গোলাম মঈনউদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭-৩৮।

১১১. সৈয়দ শওকতুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৪।

১১২. *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

১১৩. ড. সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা দেশজ ইতিহাস-ঐতিহ্য, আধুনিক জীবন দৃষ্টি ও আধ্যাত্ম সাধনার স্রোতধারায় এদেশে সমাজ সংস্কার ও সমাজ পরিবর্তনের ধারা সূচনা করতে চেয়েছিলেন। মধ্যযুগের বাংলাদেশে এরূপ ধারাতেই সমাজ সংস্কার, সমাজ উন্নয়ন ও সমাজ বিকাশ ত্বরান্বিত হওয়ায় বর্তমান সমাজ জীবনেও এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা আধুনিক সমাজ জীবনের বাস্তবতার সাথে সঙ্গতি রেখেই সমাজ সংস্কারের আলোচিত ধারা গড়ে তোলার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা চালিয়ে আমাদের কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। আমরা তাঁকে অনুসরণ করে নিঃসন্দেহে বর্তমান সংকটাপন্ন অবস্থায় সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে অগ্রসর হলে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব হবে।

উপসংহার

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ে ছিল গভীর পাণ্ডিত্য। তিনি তদানীন্তন খুলনা জেলার সাতক্ষীরা মহকুমার (বর্তমান জেলা) নলতা গ্রামে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুনশী মোহাম্মদ মুফিজউদ্দীন একজন ধার্মিক, ঐশ্বর্যবান এবং দানশীল ব্যক্তি ছিলেন। আহ্ছানউল্লা নলতার মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ে এবং টাকীর উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তিনি ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে এন্ট্রান্স পরীক্ষা (বর্তমানে এস এস সি), ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে এফ এ পরীক্ষা (বর্তমান আই এ) এবং ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে বি এ পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন শাস্ত্রে এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে সুপারনিউমারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। শিক্ষকতায় তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রাখেন। অতঃপর তিনি ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর, পরে চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ইন্সপেক্টর এবং সবশেষে অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর পদে সমাসীন হন। শিক্ষা বিভাগের নানা প্রকার উন্নতি সাধন এবং চাকরী জীবনের সৎ ও প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে 'খানবাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি সরকারী চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্বদেশবাসীর রূহানী খেদমত ও সমাজ সেবার জন্য ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে *আহ্ছানিয়া মিশন* নামে একটি ধর্মীয় সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ মিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য স্থির করেন 'স্রষ্টার ইবাদাত ও সৃষ্টির সেবা'। চাকরী জীবন থেকে অবসরের পর তিনি নিজেকে অধ্যাত্ম সাধনায় সার্বক্ষণিক নিয়োজিত রাখেন এবং একজন কামিল 'পীর' হিসেবে সকলের কাছে স্বীকৃতি লাভ করেন।

শিক্ষা বিভাগেই খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সমগ্র চাকরী জীবন অতিবাহিত হয়। চাকরীর শেষ পর্যায়ে এ বিভাগের উচ্চতর পদে উন্নীত হয়ে তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে আরো সুন্দর ও সুচারূভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিলেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার সময়ে এবং তাঁর সক্রিয় হস্তক্ষেপের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিপুল সংস্কার সাধিত হয়।

তাঁর একান্ত প্রচেষ্টায় অনার্স, এম এ ও আই এ পরীক্ষার খাতায় পরীক্ষার্থীর নাম লেখার পরিবর্তে রোল নম্বর (Roll Number) লেখার নিয়ম প্রবর্তিত হয়। এর ফলে সাম্প্রদায়িক

পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা বিদূরিত হয়। তিনি উচ্চ মাদরাসা ও মাধ্যমিক মাদরাসার শিক্ষামান উন্নত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং মাদরাসায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় উর্দূ ভাষা 'Classical Language' রূপে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। প্রতিটি স্কুল-কলেজে মৌলভী শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেন এবং মৌলভী ও পণ্ডিতের মধ্যে সকল বেতনের পার্থক্য রহিত করেন। মক্তবের জন্য তিনি স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করেন এবং মুসলমান লেখকদের লিখিত পুস্তক পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লার প্রচেষ্টায় স্কুল-কলেজে মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তির আনুপাতিক সংখ্যা নির্ধারণ, নিউ স্কীম মাদরাসার সৃষ্টি, মুসলিম মহিলাদের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম এবং টেক্সটবুক কমিটিতে মুসলমান সদস্য নিযুক্তির ব্যবস্থা গৃহীত হয়। তাঁরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় কলকাতায় মুসলমানদের জন্য বেকার হোস্টেল, টেলার হোস্টেল, কারমাইকেল হোস্টেল, দি মুসলিম ইনস্টিটিউট এবং কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

এছাড়া মুসলিম শিক্ষা সম্প্রসারণে তাঁর অবদানের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইসলামী ভাবধারায় রচিত তাঁর শতাধিক গ্রন্থ রচনা। তাঁর রচনায় ইসলামের তত্ত্ব ও আদর্শসমূহ ঐতিহাসিক, মনস্তাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষিত হয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের পরিচয় রয়েছে তাঁর রচনার সর্বত্র। এভাবে ইসলামী শিক্ষার উন্নতি ও অগ্রগতিতে এক যুগান্তকারী অবদান রেখে এ মহান সাধক ও জ্ঞান তাপস ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইন্তিকাল করেন। মহৎ প্রাণের মৃত্যু নেই। মৃত্যুর পরও মহৎ মানুষ তাঁর কীর্তি নিয়ে বেঁচে থাকেন।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রাজনীতিবিদ বা সমাজ বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনাই ছিল বাঙালী মুসলিম সমাজের উন্নতি এবং অবনতিকে কেন্দ্র করে। সমস্ত দর্শন এবং চেতনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন, পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি, একের স্বার্থের প্রতি অপরের শ্রদ্ধাবোধ এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের উৎকর্ষ সাধন। তিনি বাঙালী মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা পশ্চাদপদ মুসলমান জাতির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষাকে প্রয়োজনীয় বলে ভাবতেন, কিন্তু তিনি কোন সময়ই ব্রিটিশ রাজত্ব এদেশে স্থায়ী হোক– এমন চিন্তা করেননি। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চাইলেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতির বিকাশের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। ইসলামী চিন্তাবিদ এবং সূফী সাধক হওয়ার ফলে মানবতার উন্নতি বিধানই ছিল তাঁর একমাত্র বাসনা।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা ধর্মতত্ত্বে, বিশেষত ইসলাম, মুসলিম ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে একজন সুপণ্ডিত ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁর এই পাণ্ডিত্য আমাদের সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ এবং তাতে

সংযোজন করেছে বৈচিত্র্য। তবে স্বধর্মনিষ্ঠ ও মুসলমানদের অকৃত্রিম হিতৈষী হলেও তাঁর সেবাধর্ম ও পরোপকারবৃত্তি সীমাবদ্ধ ছিল না মুসলিম স্বার্থের গণ্ডিতে। মুসলমানদের সামগ্রিক কল্যাণে উদ্যোগী হলেও তিনি এতটুকু বিদ্বেষী ছিলেন না অন্য কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায়ের প্রতি। কেবল মুসলমানদের উন্নতি নয়; বরং সব সম্প্রদায়ের মানুষ যেন সমানভাবে উন্নত হয়ে জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ ও সংহত করতে পারে, এটাই ছিল খানবাহাদুরের ঐকান্তিক লক্ষ্য। তিনি যথার্থই উপলব্ধি করেছিলেন, সর্বাঙ্গে রক্তসঞ্চালন না হলে যেমন কেউ সুস্থ থাকতে পারে না, তেমনি দেশের সব সম্প্রদায়ের মানুষের সুষম বিকাশ ছাড়া জাতীয় উন্নতিও সম্ভব নয়।

খানবাহাদুর চেয়েছিলেন সারা দুনিয়ার মানুষের সুখ-শান্তি ও নিরাপদ জীবন। দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ে যেন হানাহানি না থাকে, সবাই যেন সহযোগিতা, সমঝোতা ও বন্ধুত্বের পরিবেশে মহৎ মানবোচিত জীবনের চর্চা ও অনুশীলন করতে পারে, এটাই প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি।

> আবার পৃথিবী জ্ঞানগর্বে গর্বিত হউক।... আবার বিদ্বেষ কলহ, পরশ্রীকতারতা চিরতরে বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত হউক, আবার প্রকৃতি হাসুক, পাপ কালিমা পূণ্যের আলোকে বিদূরিত হউক, অসত্যের স্থলে সত্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হউক। ...সকল ধর্ম, সকল জাতি একযোগে কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া সারা পৃথিবীর উন্নতি সাধনে ব্রতী হউক।

মূল্যবোধপুষ্ট মহৎ জীবন-দর্শনের লক্ষ্যেই খানবাহাদুর আহছানউল্লা নিবেদন করেছিলেন তাঁর ধ্যান-ধারণা, সাহিত্যকর্ম তথা সমগ্র জীবন সাধনা। তাঁর এই মহৎ মানবতাবাদী জীবন দর্শনের শ্রবণ, মনন ও অনুশীলন পৃথিবীর বুক থেকে সব রকম সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটাবে।

গ্রন্থপঞ্জি

মুস্তাফিজুর রহমান : *শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী*
করাচী : ইসলাতুল খাফা, তা বি।

রহীম বখশ : *হায়াতে ওয়ালী*
দিল্লী : আফদালুল মা'তাবী, ১৩১৯ হি.।

কাজী মুহাম্মদ বশীর উদ্দীন : *তাজকিয়্যাহ আজিজিয়্যাহ্*
মীরাট : মাত্‌বা মুজতাবাঈ, ১৮২৬ খ্রী.।

সাইয়্যেদ মুহাম্মদ আলী : *মাখ্‌যান আহমাদী*
আগ্রা : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, ১২৯৯ হি.।

দিওয়ান অমর নাথ : *জা'ফর নামাহ*
লাহোর : পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮ খ্রী.।

আসলেহ হুসাইনী : *শরী'য়াত বিল আওর লীগ*
দিল্লী : জম'ঈয়তে 'উলামায়ে হিন্দ, তা বি।

আবৃদ আল্ রহমান খান : *সীরাতে আশরাফ*
মুলতান : ইদারাহ নশর আল-শরীফ, ১৯৫৬।

আলী ইবন আবূ বক্কর : *হিদায়াহ (আখিরায়ন)*
যশোর : যাকারিয়্যাহ কুতুবখানা, তা বি।

আবদুল্লাহ ইবন আহম্মদ আন নাসাফী : *কান্‌য আল্-দাকাইক*
করাচী : কুতুবে কুরআন মঞ্জীল, তা বি।

শাহ ইসমাঈল শহীদ : *তাক্‌বিইয়াত আল-ঈমান*
দিল্লী : নিউ লিথু প্রেস, তা বি।

শায়খ আলী উদ্দীন আল খতীব আত্ তিবরীজি : *মিশকাত আল মাসাবীহ*
ঢাকা : আশরাফিয়া লাইব্রেরী, তা. বি।

আল যারকাশী : *আল বুরহান ফি 'উলূমিল কুরআন, ২য় খণ্ড*
কায়রো : মাকতাবাতুল খানজী, তা বি।

আল যুরায়দী : *তাজুল আরূস মিন জাওয়াহিরিল কামুস (৩য় খণ্ড)*
মিসর : দারু ইহইয়ায়িত তুরাস আল আরাবী, ১৩০৬ হি.।

সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *আল কাওসার আরবী-বাংলা অভিধান*
ঢাকা : মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৮৯।

সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ পরিশিষ্ট*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৫।

গোলাম আহমদ মোর্তজা : *চেপে রাখা ইতিহাস*
বর্ধমান : বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ৮ম মুদ্রণ, ২০০০।

মুহাম্মদ হাদীসুর রহমান : *ইসলামের ইতিহাস*
ঢাকা : আরাফাত পাবলিকেশন্স, ১৯৮৮।

নুরুন্নাহার বেগম : *বাংলাদেশের ইতিহাস*
মাদারীপুর : মদীনা প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৮৮।

ড. ওয়াকিল আহমদ : *উনিশ শতকে বাঙ্গালী মুসলমানদের চিন্তা চেতনার ধারা*
ঢাকা : বা এ, ১৯৮৩।

: *বাংলার মুসলিম বুদ্ধিজীবী*
ঢাকা : বা এ, ১৯৮৪।

ড. আজিজুর রহমান মল্লিক
দেলওয়ার হোসেন অনূদিত : *বৃটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান*
ঢাকা : বা এ, ১৯৮২।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম ও অন্যান্য : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস (১৭৫৭-১৯৪৭)*
ঢাকা : ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং, ১৯৭৬।

ড. মুহাম্মদ আব্দুর রহিম : *বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস*
ঢাকা : বা এ, ১৯৮২।

: *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*
ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৯।

আব্বাস আলী খান : *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*
ঢাকা : ইসলামিক সেন্টার, ৩য় প্রকাশ, ২০০০।

মোহাম্মদ আজিজুল হক : *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*
ঢাকা : বা এ, বর্ধমান হাউস, ১৯৬৯।

আবদুল গফুর সিদ্দিকী : *শহীদ তিতুমীর*
ঢাকা : বা এ, ১৩৬৮ বাংলা।

অধ্যাপক আব্দুল গফুর সম্পা. : *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭।

সম্পাদনা পরিষদ সম্পা. : *ইসলামী বিশ্বকোষ,* ১ম, ৩য়, ৬ষ্ঠ, ১০ম, ২১শ, *১২শ খ,* ১৯শ,
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭।

অধ্যাপক প্রভাতাংশু মাইতি : *ভারত ইতিহাস পরিক্রমা*
কলকাতা : শ্রীধর প্রকাশনী, তা বি।

মেসবাহুল হক : *পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলিম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭।

সৈয়দ মাহমুদুল হাসান : *ভারত বর্ষের ইতিহাস*
ঢাকা : গ্লোব লাইব্রেরী প্রা. লি., ১৯৭৬।

ড. কীরণ চন্দ্র চৌধুরী : *ভারতের ইতিহাস কথা, ১ম খণ্ড*
কলকাতা : মডার্ন বুক এজেন্সী, ১৯৯২।

আবুল কালাম শামছুদ্দীন : *পলাশী থেকে পাকিস্তান*
ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২য় সং, ২০০০।

হুমায়ুন আব্দুল হাই : *মুসলিম সংস্কারক ও সাধক*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৬।

ইয়াসমিন আহমেদ : *উপমহাদেশের রাজনীতি ও স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব*
ঢাকা : আজিজিয়া বুক ডিপো, ৪র্থ সং, ১৯৯৭।

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *ইতিহাস কথা কয়*
ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮১।

ড. মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক : *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*
ঢাকা : বা এ, ১৯৯৫।

আব্দুল মওদুদ : *ওহাবী আন্দোলন*
ঢাকা : আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ৩য় সং, ১৯৮৫।

মাসুদ মজুমদার সম্পাদিত : *বঙ্গভঙ্গ থেকে বাংলাদেশ*
ঢাকা : বাংলাদেশ ইতিহাস কেন্দ্র, ১৯৯৭।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আব্দুর রব : *ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*
ঢাকা : ইসলামিক এডুকেশন সোসাইটি, ১৯৯১।

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পা. : *ইতিহাস অনুসন্ধান*
কলকাতা : কেপি বাগচী এ্যান্ড কোং, ১৯৮৯।

সিরাজ উদ্দীন আহমদ : *জননায়ক ফজলুর রহমান*
বরিশাল : ভাস্কর প্রকাশনী, ১৯৮৮।

সুবোধ চন্দ্র সেন সম্পা. : *সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান*
কলকাতা : সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৬।

মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম : *পাকিস্তান দেশ ও কৃষ্টি*
ঢাকা : পাইওনিয়ার প্রেস, ১৯৬৯।

ইমরান হোসেন : *বাঙালী মুসলিম বুদ্ধিজীবী : চিন্তা ও কর্ম*
ঢাকা : বা এ, ১৯৯৩।

ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান : *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১*
ঢাকা : সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।

অধ্যাপক খগেন্দ্র সেন : *সমাজ বিজ্ঞানের ভূমিকা*
কলকাতা : বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৮৬।

গোপাল হালদার : *সংস্কৃতির রূপান্তর*
ঢাকা : মুক্তধারা, স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৪।

ড. তারা চাঁদ : *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯১।

হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় : *ভারত বর্ষের ইতিহাস*
কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।

ড. আনিসুজ্জামান : *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯৫৮)*
ঢাকা : লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪।

: *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৯।

মুনীর চৌধুরী : *মীর মানস*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৪।

মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড*
ঢাকা : হাসি প্রকাশনী, ১৯৬৪।

শংকর সেন গুপ্ত : *বাঙালী জীবনে বিবাহ*
কলকাতা : ইন্ডিয়ান পাবলিকেশন্স, ১৯৭৪।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড)*
ঢাকা : এস. আর প্রিন্টার্স, ১৯৯৫।

রাজিয়া মজিদ : *শতাব্দীর সূর্য শিখা*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭।

নবাব আব্দুল লতিফ খান
আবু জাফর শামছুদ্দীন অনূ. : *মুসলিম বাংলা : আমার যুগে*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৮।

শ্রী অতুল চন্দ্র রায় : *ভারতের ইতিহাস*
কলকাতা : মৌলিক লাইব্রেরী, ষষ্ঠ সং, ১৯৯১।

এম. এ. হান্নান : *ডিগ্রী ইসলামিক স্টাডিজ*
ঢাকা : অবিস্মরণীয় প্রকাশনী, ১৯৯৫।

মাওলানা মোঃ আব্দুর রহিম : *জাহান্নামের আগুন হতে আপন ঘর বাঁচান*
ঢাকা : ফাতেমা কোরআন মহল, ২০০১।

মওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম : *সুন্নত ও বিদ'আত*
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৪।

: *বাংলাদেশের মাজলুম ও মাহ্‌রুম*
ঢাকা : খায়রুন প্রকাশনী, ২০০১।

কাজী আব্দুল মান্নান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*
ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

এনামুল হক : *বংগে সূফী প্রভাব*
কলকাতা : মোহসীন এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৩০।

দেওয়ান নূরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী : *হযরত শাহ্‌জালাল (র.)*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৭।

আব্দুল করিম : *বাংলার ইতিহাস-সুলতানী আমল*
ঢাকা : বা এ, ২য় সং, ১৯৮৭।

মুহাম্মদ আবদুর রহীম : *হাদীস সংকলনের ইতিহাস*
ঢাকা : ই ফা বা, ৩য় সং, ১৯৯২।

মোঃ আবুল হোসেন : *সাতক্ষীরা জেলার ইতিহাস*
সাতক্ষীরা : সূচনা প্রিন্টিং প্রেস, ২০০১।

এ. এফ. এম এনামুল হক : *হজরত খানবাহাদুর আহ্‌ছানউল্লা (র:)-এর জীবন ও কর্ম*

ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

সিরাজুল ইসলাম : *বাংলার ইতিহাস ও উপনিবেশিক কাঠামো*
ঢাকা : বা এ, ১৯৮৪।

আব্দুল করিম : *পাক-ভারতে মুসলিম শাসন*
ঢাকা : কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড, ১৯৬৯।

মাওলানা মুহাম্মদ মিঞা : *উপমহাদেশীয় উলামায়ে কিরামের গৌরবময় অতীত*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৮৯।

বিপীন চন্দ্র : *আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা*
কলকাতা : কেপি বাগচী এ্যান্ড কোং, ১৯৮৯।

আব্দুল মওদুদ : *মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, সংস্কৃতির রূপান্তর*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৯।

খন্দকার ফজলে রাব্বী
মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক অনূ. : *বাংলার মুসলমান*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৮।

ড. কাজী দীন মুহাম্মদ : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*
ঢাকা : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৬৯।

কাজী আব্দুল মান্নান : *আধুনিক বাংলা সাহিত্য ও মুসলিম সমাজ*
ঢাকা : নিউ পুবালী মুদ্রায়ন, ১৯৯০।

বদরুদ্দীন উমর : *সংস্কৃতির সংকট*
ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৭০।

ড. মুহাম্মদ এনামুল হক : *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*
ঢাকা : পাকিস্তান পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৬৮।

আব্দুল কাদির সম্পাদিত : *ইয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী*
ঢাকা : বা এ, ১৩৭০ বা.।

মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন : *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*
ঢাকা : রতন পাবলিকেশন্স, ৩য় সং, ১৯৮১।

মুহাম্মদ শামছুল আলম : *রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন : জীবন ও সাহিত্য*
ঢাকা : বা এ, ১৯৬৮।

ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ : *আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী*
ঢাকা : কামিয়াব প্রকাশনী, ২০০০।

বন্দে আলী মিয়া : *কবি গোলাম মোস্তফা*
ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২য় সং, ১৯৭৫।

আনোয়ারুল ইসলাম : *বাংলাদেশ সমাজ সংস্কৃতি সভ্যতা*
ঢাকা : বা এ, ১৯৭৭।

ড. হাসান জামান : *সমাজ সংস্কৃতির রূপান্তর*
ঢাকা : মুক্তধারা প্রকাশনী, ১৯৭৪।

শ্রী সুনিত কুমার চট্টোপাধ্যায় : *সংস্কৃতি শিক্ষা ইতিহাস*
কলকাতা : জিজ্ঞাসা প্রকাশনী, ১৯৭৬।

অধ্যক্ষ মুহাম্মদ ফজলুর রহমান ও নাজির উদ্দীন আহমদ : *আখলাকে ইসলামী*
ঢাকা : পুস্তক ঘর, ৯ম সং, ১৯৯১।

: *ইসলামী বিশ্বকোষ, ২য় খণ্ড।*

রজনী কান্ত গুপ্ত : *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*
কলকাতা : নবরত্ন প্রকাশনী, ১৩৮৮ বা.।

শ্রী রমেশ চন্দ্র মজুমদার : *বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*
কলকাতা : জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স লি. ১৯৮১।

আবদুস সামাদ ছারিম আল আযহারী ও ড. আবদুল ওয়াহিদ অনূ. : *তাফসীর সাহিত্যের ইতিহাস*
ঢাকা : আল আমীন প্রকাশন, ২০০২।

ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন : *মুফাসসির পরিচিতি ও তাফসীর পর্যালোচনা*
রাজশাহী : সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০১।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ আজমী : *হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস*
ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১৯৯২।

জি এম মেহেরুল্লাহ : *আরবী কবি সাহিত্যিক ও সাহিত্য*
ঢাকা : আল-নাহদা প্রকাশনী, ১৯৯৩।

মোঃ মালেকুজ্জামান : *খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী (১৯৮৭-১৯৭৫)*
ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯৬।

গোলাম মঈনউদ্দিন : *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*
ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

.গোলাম মঈনউদ্দিন : *মহৎ জীবন*
ঢাকা : শাহানা পাবলিশার্স, ১৯৯১।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা (রঃ) সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন, ৩য় প্রকাশ, ২০০১।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : জীবন ও সাহিত্য*
ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

গোলাম মঈনউদ্দিন সম্পা. : *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ২য় খণ্ড*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট, ২য় সং, ২০০২।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৭ম খণ্ড*
ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ১৯৯৪।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৮ম খণ্ড*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট, ১৯৯৪।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ১১শ খণ্ড*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন্স ট্রাস্ট, ২০০০।

: *খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা স্মারক গ্রন্থ*
ঢাকা : ই ফা বা, ১৯৯০।

শ্রী অঞ্জলি বসু সম্পা. : *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*
কলকাতা : নিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., ১৯৭৬।

বা এ সম্পা. : *বাংলাদেশের লেখক পরিচিতি*
ঢাকা : বা এ প্রেস, ১৯৮৪।

উইলিয়াম হান্টার : *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*
ঢাকা : বা এ, ৩য় সং, ১৯৭৪।

খানবাহাদুর মোঃ মোবারক আলী : *আমাদের পরিচয়*
কলকাতা : সুরিস প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৬।

মুহাম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান : *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*
ঢাকা : বা এ, ২য় সং, ১৯৮৬।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : *মুছলিম জাহান*
ঢাকা : মজিদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৩।

: *রাজর্ষি আওরঙ্গজেব ও মোছলেম সভ্যতা*
ভারত : ভাঙ্গাড়, চব্বিশ পরগণা, ১৯৪৯।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা

: *বিভিন্ন ধর্মের উপদেশাবলী*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনী, ১৯৬৪।

: *ছেলেদের মহানবী*
খুলনা : আহ্ছানিয়া লাইব্রেরী, ১৯৫১।

: *ছুফী*
ঢাকা : মখদুমী এন্ড আহ্ছানউল্লা লাইব্রেরী, ২য় সং, ১৯৪৭।

: *টিচারস ম্যানুয়েল*
কলকাতা : ম্যাকমিলান কোম্পানী, ১৯১৫।

: *ভক্তের পত্র*
ঢাকা : জয় পাবলিশার্স, ৫ম সং, ১৯৮৪।

: *মোছলেমের নিত্য জ্ঞাতব্য*
কলকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড আহ্ছানউল্লা বুক হাউস, ১৯৪৯।

: *কোরআনের বাণী ও একত্ববাদ*
২য় সংখ্যা, ১৯৫১।

: *ইছলামের দান*
আহ্ছানউল্লা রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, ১৯৯০।

: *তরীকত শিক্ষা, ৩য় সংখ্যা*
১৯৬২।

: *হেজাজ ভ্রমণ*
১৯৮৮।

: *তরীকত শিক্ষা, ৮ম সং*
২০০৪।

: *বঙ্গভাষা ও মুসলমান সাহিত্য*
১৯৮৩।

: *ইসলাম রবি হজরত মোহাম্মদ (সা.)*
ভারত : চব্বিশ পরগণা, ১৯৫২।

: *কোরআনের শিক্ষা*
কলকাতা : মখদুমী লাইব্রেরী এন্ড
আহ্ছানউল্লা বুক হাউস লি. ১৯৪১।

: *শিক্ষাক্ষেত্রে বঙ্গীয় মোছলমান*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন প্রকাশনী, ২য় সং, ১৯৮৮।

খানবাহাদুর আহ্ছানউল্লা : *আমার শিক্ষা ও দীক্ষা*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন, ৩য় সং, ১৯৬৮।

: *আমার জীবন ধারা*
কলকাতা : মাখদুমী লাইব্রেরী, ১ম সং, ১৯৬৪।

: *আমার জীবন ধারা*
ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন পাবলিকেশন ট্রাস্ট, ২০০০।

সৈয়দ শওকতুজ্জামান : *সমাজকল্যাণ সমীক্ষণ, ১ম খণ্ড*
ঢাকা : বা এ, ১৯৯০।

বিনয় ঘোষ : *বাংলার নবজাগৃতি*
কলকাতা : ওরিয়েন্ট লংম্যান লি., ১৯৭৯।

ড. আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য : *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ*
ঢাকা : বা এ।

আখতার-উল-আলম : *জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত নবাব আবদুল লতিফ*
ফরিদপুর : ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০।

Jagadish Narayan Sarkar : *Islam in Bengal*
Calcutta : Patna Parakasan, 1972.

V. A Smith : *The Oxford History of India*
Oxford : Spear Clarendon Press, 1976.

Dr. Muin-ud-din Khan : *Titumir and his followers*
Dacca : Islamic Foundation Bangladesh, 1980

R. C Majumdar : *The Sepoy Mutiny*
Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1957.

Tara Chand : *History of the freedom Movement in India, Vol-1*
Calcutta ; The Publications divisions, 1961.

M. T Titus : *Indian Islam*
London : University Press, 1930.

W. C Smith : *Modern Islam in India*
Lahore : 1943.

Ram Gopal : *Hindu Culture During are after Muslim Rule*
Delhi : M. D. Publications, 1994.

Amalendu De : *Islam in Modern India*
Calcutta : Maya Prokashoni, 1982.

Dr. Muin Uddin Ahmed Khan : *History of the Faradi Movement in Bengal 1818-1908.*
Karachi : Pakistan Historical Society, 1965.

M. Fazlur Rahman : *The Bengali Muslims and English Education*
Dacca : Bangla Academy, 1973.

Enamul Haque : *NawabKhan Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*
Dacca : Samudra Prokashani, 1968.

K. K Aziz : *Ameer Ali : His Life and Work*
Lahore : Publishers United Ltd. 1968

Syed Razi Wasti (e.d) : *Memories and other Writings of Syed Ameer Ali*
London : Peoples Publishing House, 1968

W. W Hunter : *The Indian Musalmans*
Lahore : Primier Book House, 1945.

Khaled bin Sayeed : *Pakistan Formative phase*
Karachi : Modern Book, House, 1960.

A. K. Zainul Abedin : *Memorable Speeches of Sher-e-Bangla*
Barishal : Al-Helal Publishing House, 1976

Latif Ahmed Sheroani : *The Founder of Pakistan*
Islamabad : Global Book House, 1976.

M. P. Srivastava : *Social Life Under The Mughals*
Allahabad : Chuqh Publication India, 1978.

Philip K. Hitti : *Islam and the West*
New Jersey : Van Nosproved, 1962.

Azizur Rahman Mallick : *British Policy and The Muslim in Bengal 1757-1856*
Dacca : Bangla Academy, 1977.

M. R. S Meer Hasan Ali : *Observations of The Musalmans of India*

Delhi : Idara-i-Adabial, 1973.

Tahir Mahmood : *Muslim Personal Law Note of The state in the Subcontinant* New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1977.

Muhammad Abdur Rahim : *Social Cultural history of Bengal, Vol-1* Karachi : Pakistan Historical Society, 1963.

Shila Sen : *Muslim Politics in Bengal* New Delhi : Lessen of Arjun Press, 1977.

Eduard G. Brown : *A Literary history of persia, Vol-1* Cambridge : The University Press, 1956.

Murry T. Titus : *Islam in India and Pakistan* Madras : The Diocesam Press, 1957.

Edward Montel, L. : *Islam* Paris : Poyat and Co. 1921.

Shamsuddin Ahmed : *Inscriptions of Bengal Vol-1V* Rajshahi : Varandra Research Society, 1960.

Montogomery Martin : *The History-Antiquities, Topography* and Statistics of Eastern India, Vol-III Delhi : Cosmo Publications, Reprint, 1976.

Mohammad Mohar Ali : *History of the Muslims of Bengal, Vol-1A, 2 1B* Riyadh : The University Press, 1985.

S. M. Zwemer : *The Influence of Animism in Islam* London : Central Board of Mission, 1920

John Norman Hokiston : *The Shia of India* London : Lozac and Co, 1979.

Dr. Hans Raj : *History of the Modern India* Delhi : Surjeet Publications, 1993.

A. K. M Yaqub Ali : *Oriental and Western Education in Bogra District : From The Second half of 19th Century of mid 20th*

Century A. D.
Unpublished U. G. C Research Project, 1946.

J. A Richter : *A History of Missions in India*
London : Central Board of Mission, 1908.

N. K Sinha : *The Economic History of Bengal Vol*-I
Calcutta ; 1956.

Dr. Azizul Haque : *History and problem of Muslim Education in Bengal*
Calcutta : Jhacker Spink Co, 1971.

T. C Das Gupta : *Aspects of Bengali Society*
Calcutta : University of Calcutta, 1955.

Sufia Ahmed : *Muslim Community in Bengal*
Dacca : Oxford University Press Bangladesh, 1974.

Gholam Moyenuddin : *Khan Bahadur Ahsanullah (R) : A small Introduction*
Dhaka : Ahsania Mission, 2000.

Shahanara Alam edited : *Azizul Haque : Life-Sketch and selected writings 1892-1947*
Dacca : Shanara Alam, 1984.

Sankar Ghose : *The Renaissance to the Militant Nationalism in India*
Calcutta : Allied Publishers, 1967.

A. R Mullick : *British Policy and the Muslims in Bengal 1757-1856*
Dhaka : Asiatic Society of Pakistan, 1961.

পত্র-পত্রিকা/রিপোর্ট

আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ২০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭।
আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ২১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৯।
আহ্ছানিয়া মিশন বার্তা, ২২ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০।

আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ১০ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৭।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২৪ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০২।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৭।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, মার্চ ২০০০।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ ২০০২।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২১ বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৯।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, ২০ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ১৯৯৭।
আহ্‌ছানিয়া মিশন বার্তা, জানুয়ারী-মার্চ ১৯৯১।
স্মরণিকা, ঢাকা : বাংলাদেশ কৃষি ইনস্টিটিউট, ১৯৮৫।
বুলবুল, জৈষ্ঠ্য, ১৯৪৩।
বাংলাবাজার পত্রিকা, ৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮।
মোসলেম দর্পন, ৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা, মার্চ ১৯৭২।
মোসলেম দর্পন, ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, আগস্ট ১৯২৫।
হেদায়াত, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৩ বা.।
হেদায়াত, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, মাঘ ১৩৪২ বা.।
দৈনিক সংগ্রাম, ২৬ বর্ষ ৬০তম সংখ্যা, ২০ মার্চ ২০০০।
ইসলাম দর্শন, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৭ বা.।
অগ্রপথিক, ৩য় বর্ষ ১৮ সংখ্যা, ১৯৮৮।
আল-ইসলাহ্, ৩৭শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১৯৬৮।
Asiatic Journal, Vol-V1, 1931.
Adam's report on vernacular education in Bengal and Behar, Calcutta, 1886.
মাসিক পূর্বাচল, মাঘ ১৩৮৪ বা.।
আল আহ্‌ছান, ১৭তম বর্ষ, ওরস শরীফ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারী ২০০২।
আল আহ্‌ছান, ১৪তম বর্ষ, জানুয়ারী ১৯৯৯।
আল আহ্‌ছান, ৮ম বর্ষ সংকলন, জানুয়ারী-ডিসেম্বর ১৯৯২।
আল আহ্‌ছান, ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭।
আল-আহ্‌ছান, ১৬তম বর্ষ সংকলন, ফেব্রুয়ারী ২০০২।
আল আহ্‌ছান, ১৫তম বর্ষ সংকলন, ফেব্রুয়ারী ২০০০।
মাসিক মোহাম্মদী, ১৯৪৩।
বা এ পত্রিকা, ১৭শ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, শ্রাবণ-পৌষ, ১৩৭৯ বা.।
বা এ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭ বা.।
বা এ পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭।
দৈনিক ইত্তেফাক, ২৫ চৈত্র ১৩৯২ বা.।
বাংলাবাজার পত্রিকা, বর্ষপূর্তি সংখ্যা, ১৯৯৪।
বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৪ পৌষ ১৪০৩ বা.।
বাংলাবাজার পত্রিকা, ১৫ ফাল্গুন ১৪০২ বা.।

নজরুল একাডেমী পত্রিকা, গ্রীষ্ম-বর্ষ সংখ্যা,১৩৮৪ বা.।
প্রতিবেদন : বার্ষিক সাধারণ সভা-২০০০, ঢাকা : আহ্ছানিয়া মিশন।
বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৬১-১৯৬২), সাতক্ষীরা : নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন
বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার, ভলিয়ুম-বি (স্ট্যাটিসটিক্স), ১৯২১-১৯২২, ১৯২৪-১৯২৫।
বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯৬-১৯৯৭), নলতা কেন্দ্রীয় আহ্ছানিয়া মিশন।
সাম্যবাদী পত্রিকা, ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৩০ বা.।
সমাজ নিরীক্ষণ, জানুয়ারী, ১৯৮০।
Proceeding of Govt. of Bengal, Glaciates Dept. July-September 1926, 1927, 1928.
Cansus of East Pakistan, 1951.
Letter of DPI to Education Secretary, 19th February, 1926, Flie-1-M-8- (1)
Syndicate Resolution of Calcutta University, 1929.
Education Proceedings, Vol-1, April 1929.
Calcutta University Commision, 1917-1919, Part-1, Vol-1, Chapter-V1 and 7.
Report on the public instruction of Bengal 1927-1928.